জাতিভেদ।

শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার, জলচল ও স্পর্শদোষ বিচার,
চতুর্ব্বর্ণ-বিভাগ, দেবীপূজায় জীববলি, প্রেমাবতার
শ্রীগৌরাঙ্গ, বিদেশী বর্জ্জন, বিধবার নির্জ্জলা
একাদশী, স্বাধীনতার বাণী, কোরবাণি বা
আত্মবলি, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, স্বরাজে
কারাবাস প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য-বিদ্যাভূষণ

প্রণীত ও প্রকাশিত

সিরাজগঞ্জ

লেপ্টন্যাণ্ট কর্ণেল
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্, ডি, আই, এম্, এস্
মহোদয় লিখিত ভূমিকা সম্বলিত।

(পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ)

কলিকাতা।
২নং বেথুন রো, ভারতমিহির যন্ত্রে,
শ্রীসর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

১৩৩১

সর্ব্বস্বত্ব সুরক্ষিত]

[মূল্য ২৲ ও কাপড়ে বাঁধাই ২।০

উৎসর্গ।

বহুশত বৎসরের সামাজিক পেষণের ফলে

যাহারা সামাজিক ও আধ্যাত্মিক

সর্ব্বপ্রকার অধিকার হইতে

চিরবঞ্চিত,

সমাজের সর্ব্বস্ব হইয়াও যাহারা হেয়, অবজ্ঞাত,

নিম্নশ্রেণী বলিয়া অভিহিত,

ভগবানের দীন-প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ

সেই কোটি কোটি ভ্রাতৃবর্গের

শ্রীকরকমলে

আমার

বহু সাধনার

"জাতিভেদ"

অর্পিত হইল।

গ্রন্থকার

ভূমিকা।

আজ বেশী দিনের কথা নয়, আমাদের দেশের মধ্যে খ্যাতনামা, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ একজন ভদ্রলোকের গৃহে গিয়াছিলাম। তথায় সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। সমাজে গণ্যমান্য, দেশে আদৃত জনকয়েক বাঙ্গালী ভদ্রলোক তথায় উপস্থিত ছিলেন। এক্ষণে যে সকল হিন্দু সম্প্রদায় সমাজ মধ্যে নানা কারণে পশ্চাৎ পতিত অবস্থায় আছে তাহাদেরই সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। কথায় কথায় নবশাখ শ্রেণীর কথা উঠিল। একজন বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "নবশাখ কাহাদের বলে ?" প্রশ্নকারী আমাদের সমাজের একজন অলঙ্কারস্বরূপ। বিদ্যায় অর্থে পদমর্য্যাদায় বাঙ্গালী সমাজের একজন শ্রদ্ধেয় নেতা। তিনি চিরকালই দেশের কাজ করিয়া আসিতেছেন, আর দেশের লোকের নিকট একজন বিশিষ্ট অগ্রণী বলিয়া পরিগণিত। তিনি প্রশ্ন করিলেন, নবশাখ কাহাদিগকে বলে ?

কথাটা হাসিবার উপযুক্ত নয়। প্রশ্ন শুনিয়া দুঃখিত হইবারও কিছুই নাই। এইরূপ প্রশ্ন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে—বিশেষ যাঁহারা কলিকাতায় থাকেন, কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। আজ ত্রিশ বৎসর হইতে দেশ-মধ্যে যাঁহারা শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাঁহারা দেশের কথা ভাবেন, সে বিষয়ে আলোচনা করেন, বিচার করেন, আন্দোলন করেন। যাহাতে দেশের মঙ্গল হয় নিজে চেষ্টা করেন, পরকে উপদেশ দান করেন, সকলকে লইয়া একত্রে কার্য্য করিবার পরামর্শ দেন। কিসে দেশের অবস্থা ভাল হইবে, কিসে দেশের উন্নতি হইবে, কি করিলে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়, এই সব বিষয় লইয়া নিরন্তর চিন্তা করেন। তবে ইহার মধ্যে একটু কথা

আছে, ইহারা দেশ দেশ করেন অথচ দেশের লোক চিনেন না! দেশহিতৈষিতা ইঁহাদের জীবনের মন্ত্র অথচ দেশের লোকের সঙ্গে ইঁহাদের পরিচয় নাই। দেশের লোকদের সম্বন্ধে কথা হইলে ইঁহারা কিছুই বুঝেন না। কাহারা প্রধানতঃ দেশের লোক, তাহারা কি করে, কি ভাবে, তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা, ভবিষ্যতের আশা, তাহাদের সুখ, তাহাদের দুঃখ, তাহাদের উৎসব, তাহাদের বিপদ, তাহাদের গৃহ, তাহাদের সমাজ, তাহাদের ধর্ম্ম, তাহাদের নীতি, তাহাদের সংস্কার, তাহাদের চরিত্র,—এ সকল প্রশ্ন বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট অজ্ঞাত প্রহেলিকা, এ সকল সম্বন্ধে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় কখন চিন্তাও করেন না। তদপেক্ষা আক্ষেপের কথা এ সকল বিষয় যে চিন্তা করিবার উপযুক্ত তাহাও তাঁহাদের মনে হয় না। অথচ দেশ দেশ করিয়া ইঁহারা ব্যাকুল, দেশের জন্য ইঁহাদের বাস্তবিকই প্রাণ কাঁদে, যাহাতে দেশের মঙ্গল হয় তাহাই ইঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

অনেক সময় অধ্যাপক সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সহিত দেশ সম্বন্ধে কথা কহিয়া দেখিয়াছি, সকলেই একবাক্যে একমত প্রকাশ করেন। সকলেই বলেন, আমাদের সমাজের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। যখন কথাটা প্রথমে শুনি তখন মনে আশা হইয়াছিল। সমাজদেহে ব্যাধি আছে এই কথা স্থির হইল। তাহা হইলে রোগের প্রতিকার সম্ভব। হয়ত, পণ্ডিত মহাশয় নিদান ও লক্ষণ স্থির করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিবেন। লক্ষণ সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন, সমাজে যে উচ্ছৃঙ্খলা হইয়াছে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক লক্ষণ। তাঁহাদের মতে রঘুনন্দনের স্মৃতি হইতে যেদিন লোকে অন্য পথে গিয়াছে, সেই দিন হইতে আমাদের সর্ব্বনাশ আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যদি আমরা পুনরায় নব্য স্মৃতিমতে চলিতে পারি তবেই আমাদের বাঁচিবার আশা আছে, নতুবা আমাদিগের 'মরণং ধ্রুবং'। রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজতত্ত্ব, দেশপর্য্যটন, বাণিজ্য,

শিল্প, বিজ্ঞান—এ সম্বন্ধে কোন বিষয়ের প্রসঙ্গ তুলিলে তাঁহারা আশ্চর্য্য হয়েন। প্রসঙ্গকারীও নিজেকে অপ্রস্তুত মনে করেন। এ সকল বিষয় লইয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহিত আলাপ করা, আর কোনও অজ্ঞাত ভাষায় তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করা একই কথা। দেশের কথা পাড়িলে কিন্তু ইঁহারা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মত চুপ করিয়া থাকেন না। বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের বাস। এক শত জন হিন্দু বাঙ্গালীর মধ্যে ৬ জন ব্রাহ্মণ, আর বাকী ৯৪ জন শূদ্র। বৈদ্য ও ক্ষত্রিয় মহাশয়গণ বিরক্ত হইলে কি করিব? শাস্ত্রে যাহা লেখা আছে তাহাই বলিলাম। আমার কথায় প্রত্যয় না হয় একজন অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তাঁহার নিকট হইতে জানিতে পারিবেন যে, আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত আর কোন বর্ণ নাই। যেখানে এক শত লোকের মধ্যে ৯৪ জন শূদ্র বলিয়া অধ্যাপক মহাশয়দের ধারণা, সেখানে দেশের লোক প্রায় সকলকেই শূদ্র বলিয়া ধরিতে হইবে। তাহাদের সম্বন্ধে ভাবিবার বা কথা বলিবার কি আছে? "সেবা কর্ম্ম শূদ্রাণাং"—এ কথা সকলেই জানেন। ইহারা স্বাভাবিক বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে ইহাতেই সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে, সমাজে বিপ্লব ঘটিয়াছে—ইহাই সকল অনর্থের মূল। এই রোগেই আমরা মরিতেছি। এই নিমিত্তই আমরা লোপ পাইব।

কেহ যেন না মনে করেন, আমি শ্লেষ করিয়া এ কথা লিখিতেছি। যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের কথা বলিতেছি, সমাজের অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের মনে বাস্তবিকই দুঃখ হইয়াছে। তাহাতে কৃত্রিমতা কপটতা কিছুই নাই। যাহাতে সমাজের উপকার হয় তাহার জন্য তাঁহারা প্রকৃতই ব্যাকুল। সরল মনে, অকপট চিত্তে যাহা বিশ্বাস করেন তাহাই বলেন। তাঁহাদের সংস্কার শিক্ষা, জ্ঞান এইরূপ। ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত বাঙ্গালা দেশবাসী সকল হিন্দুই শূদ্র ও তাহাদিগের ধর্ম্ম শূদ্রের ধর্ম্ম। এইরূপ নির্দ্ধারণ কিম্বা এইরূপ

আচরণ যে নীতিবিরুদ্ধ, অন্যায় ও অনুচিত, এইরূপ করিলে যে অধর্ম্ম হয়, তাহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন না। আমার বিশ্বাস, মনে এই প্রকার ভাব আসিলে তাঁহারা এইরূপ ব্যবহার করিতেন না। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত দেশের লোকের পরিচয় নাই, ব্রাহ্মণের সহিত পরিচয় আছে, দেব ও দাসে যে পরিচয় সেই পরিচয়।

আজ পঞ্চাশ বৎসর হইল আমেরিকার যুক্ত প্রদেশে (United States) যে গৃহযুদ্ধ (Civil war) হয় তাহার কথা সকলেই অবগত আছেন। যুদ্ধটির প্রধান কারণ অনেকে জানেন। আমেরিকা আবিষ্কারের পর হইতে ইউরোপীয়গণ আফ্রিকাদেশবাসী কাফ্রিদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইত। তাহাদিগকে লইয়া ক্ষেত্রে এবং খনিতে কাজ করাইয়া লইত। গরু বাছুর যেমন কেনাবেচা হয়, তাহাদিগকে সেইরূপ কেনাবেচা করিত। দক্ষিণ যুক্তপ্রদেশে—জর্জ্জিয়া, কেরোলিনা, ভার্জ্জিনিয়া এই সকল স্থানে তামাক ও ধান্যক্ষেত্রে এই ক্রীতদাসেরা প্রধানতঃ কাজ করিত। আমেরিকা-বাসীদিগের মনে ক্রমে জ্ঞান হইল যে এই দাস-প্রথা, মনুষ্যকে গরু ঘোড়ার ন্যায় দাস করিয়া কাজ করান অন্যায় ও অনুচিত।, এইরূপ করিলে অধর্ম্ম হয়। ক্রমে এই ধারণা লোকের মনে এতদূর বদ্ধমূল হইল যে, তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল যুক্তপ্রদেশে আর দাস থাকিবে না। সকলেই—কি কাফ্রি, কি শ্বেতাঙ্গ—সমভাবে স্বাধীনতা উপভোগ করিবে। অপর দিকে যাহাদের এই ব্যবসায়ে লাভ হইত তাহারা ঘোর আপত্তি তুলিল। সমস্ত দেশে এই কথার আন্দোলন করিতে লাগিল, দেশে দুই দল হইল। একদল দাসত্ব উঠাইতে কৃতসঙ্কল্প, অপর দল এই প্রথা রাখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; পরিশেষে দুই দলে যুদ্ধ বাধিল। চারি বৎসর কাল এই যুদ্ধ চলে। তখন যুক্ত-প্রদেশে তিন শত বিশ লক্ষ লোকের বাস। তাহার মধ্যে ৪০ লক্ষ লোক এক বা অপর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে। পরে যে পক্ষ দাসত্ব উঠাইবার

জন্য সঙ্কল্প করিয়াছিল তাহাদেরই জয় হয়। সেই দিন আমেরিকার সকল দাসই মুক্তি পায়। কথাটা একটু ভাবিবার উপযুক্ত। কতকগুলি কাফ্রি ক্রীত-দাসের দাসত্ব বিমোচন করিবার জন্য ৪০ লক্ষ আমেরিকাবাসী শ্বেতাঙ্গ পুরুষ চারি বৎসর ধরিয়া অনবরত পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করে। পৃথিবীতে এমন ভীষণ গৃহবিবাদ পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। উভয় পক্ষে বহু লোক হত ও আহত হয়। প্রায় এমন গৃহ ছিল না, যাহার একজন বা দুইজন লোক এ যুদ্ধে যোগদান করে নাই। যুদ্ধের কারণ কি, না জনকতক ক্রীত-দাস কাফ্রির দুঃখ বিমোচন। তাহার তলে আর এক গূঢ়তর কারণ ছিল। দাসত্ব-প্রথা নীতি-বিগর্হিত, মনুষ্যের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া তাহাকে দাস করা অধর্ম্মের কার্য্য—পাপের কার্য্য। প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার—তথাপি এ অধর্ম্ম, এ অন্যায়, এ পাপ দেশ হইতে দূর করিতেই হইবে। এই কারণে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়।

আমাদিগের নিকট এইরূপ আখ্যান অলীক বলিয়া মনে হয়। যে ভাবে আমরা আরব্য উপন্যাস পড়ি, সে ভাবে এই সব ইতিহাস পাঠ করি। ঘটনাগুলি যে কল্পনা প্রসূত নয় তাহা বুঝি। তবে কেমন করিয়া যে এই সব ঘটনা সম্ভব হয়, গোটা কতক কাফ্রির স্বাধীনতার জন্য যে প্রাণ দিব, তাহা সহজে বুঝিতে পারি না। ইহা বোধ হয়—সাধারণের মত।

এখন আমাদের দেশে জন কয়েকের মনে উদয় হইতেছে যে, আমাদের মধ্যেও এইরূপ অন্যায়, অবিচার, অধর্ম্ম আছে। কেন দেশের লোককে দাস বলি, কি কারণে তাহাদিগকে ঘৃণা করি, কি দোষে তাহাদিগকে লাঞ্ছনা করি, অপমান করি, নির্য্যাতন করি এই সব প্রশ্ন ক্রমে ক্রমে লোকের মনে উদয় হইতেছে। যাঁহারা এই সব বিষয়ের আলোচনা করেন তাঁহাদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস জন্মিতেছে যে, আমাদের দেশে যে প্রচলিত দাসত্ব প্রথা আছে, তাহা অন্যায় ও অনুচিত। মানুষ হইয়া মানুষকে ঘৃণা করা—

পশু অপেক্ষা ঘৃণা করা, অধর্ম্ম ও মহাপাপ। ইহা ধর্ম্ম ও নীতিবিরুদ্ধ। মানুষের প্রতি মানুষের এইরূপ আচরণ হওয়া উচিত নয়।

এই পুস্তকখানির লেখক শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য একজন এই শ্রেণীর লোক। এ দাসপ্রথা কতদিন আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত হইল, কিসে ইহার উৎপত্তি, কেন ইহা স্থায়ী হইয়াছে, কি ইহার ফল— এই সকল বিষয় সম্বন্ধে তিনি গভীর চিন্তা করিয়াছেন। তাঁহার মনে লাগিয়াছে যে, এই প্রথা অন্যায় ও দুর্নীতিমূলক। ইহা কখনও ধর্ম্মানুমোদিত হইতে পারে না। ইহার স্থিতি ধর্ম্মবিরুদ্ধ। ইহার পরিণাম হিন্দুজাতির ধ্বংস। গ্রন্থকার কেবলমাত্র মনের আবেগে পুস্তকখানি রচনা করেন নাই। ধীর ও সংযতভাবে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহা বলিয়াছেন তাহার জন্য প্রমাণ দিয়াছেন। দুই এক স্থানে মনের আবেগ সংবরণ করিতে পারেন নাই, তাহা তাঁহার নিন্দার কথা নয়। পুস্তকখানি লিখিয়া গ্রন্থকার দেশের উপকার করিয়াছেন। এই সময় এইরূপ গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন। ইহাতে পড়িবার, শিখিবার ও ভাবিবার অনেক সামগ্রী আছে। গ্রন্থকারের সহিত সকলে যে একমত হইবেন তাহা বোধ হয় গ্রন্থকারও আশা করেন না ; তাহার প্রয়োজনও নাই। বর্ত্তমান সময়ে সমাজ সংস্কারের অপেক্ষা গুরুতর প্রশ্ন আর নাই। এই প্রশ্নের মীমাংসার দেরি থাকিতে পারে, কিন্তু আজি হউক, কালি হউক, মীমাংসা করিতেই হইবে। যাঁহাদের এ বিষয়ে আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছে তাঁহারা এই পুস্তক হইতে অনেক সাহায্য পাইবেন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

নিবেদন।

কোটি কোটি শূদ্র-ভ্রাতৃগণের প্রাণের ঐকান্তিক আশীর্ব্বাদ লইয়া জাতিভেদ প্রকাশিত হইল। কেহ বা ইহাকে কুসুম মাল্যে সম্বর্দ্ধনা করিবেন, কেহ বা পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিবেন। সাধারণ পাঠক ইহাতে ঋষি নামধেয় কতিপয় পুরুষের প্রতি সুতীব্র আক্রমণ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিবেন—আর যাঁহারা আপনাদিগকে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের রক্ষক বলিয়া মনে করেন—তাঁহারা এই পুস্তকে প্রচলিত সমাজবিধি ও সমাজ-নেতা ব্রাহ্মণের প্রতি ভীষণ আঘাত দর্শনে বিচলিত হইয়া উঠিবেন এবং গ্রন্থকারকে উন্মার্গগামী সমাজ-দানব বিংশ শতাব্দীর কালাপাহাড়রূপে অভিহিত করিয়া তৎপ্রতি অজস্র অভিসম্পাত বর্ষণ করিবেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উন্মাদের ন্যায় সমাজে যথেচ্ছাচারের তাণ্ডব নৃত্য সৃষ্টি করিবার জন্য এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে কি না সূক্ষ্মদর্শী সহৃদয় বিজ্ঞ পাঠক তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। প্রকৃত ঋষি ও ব্রাহ্মণকে গালি দেওয়া হইয়াছে এরূপ অভিযোগ লেখকের স্কন্ধে কেহই চাপাইতে পারিবেন না। এই পুস্তকের এক পংক্তিও ঋষি এবং ব্রাহ্মণ কলঙ্কে কলঙ্কিত হয় নাই। প্রাণসম হিন্দু সমাজের শতকরা চুরানব্বই জন সন্তানকে "শূদ্র" "দাস" আখ্যায় আখ্যাত, মানবের প্রাণপ্রদ চিরন্তন পরম অধিকার ধর্ম্মচর্চ্চা হইতে বঞ্চিত, উপেক্ষিত, উপহসিত ও পশুজীবন যাপন করিতে দেখিয়া প্রাণে যে ক্ষোভ এবং বেদনার দারুণ জ্বালা অনুভব করিয়াছি, বেদনা কম্পিত বক্ষে, অক্ষম অনভ্যস্ত লেখনীতে "হিজি বিজি" ভাষায় উহাই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। বাল্যকাল হইতে সমাজপতি মহাশয়গণের মুখে এবং শ্লোকমালায় শুনিয়া আসিলেও বিশ্বাস

করিতে পারি নাই—ভারতের কোটি কোটি মানব-সন্তান চিরকালের তরে ভগবান্ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত ও পতিত। গুরুজনের বাক্য ও ব্যবহারে সায় দিয়াছি সত্য, কিন্তু অন্তর তাহাতে সাড়া দেয় নাই, প্রাণ তাহা মানিতে চাহে নাই। মানবের পথনির্দ্দেশক মোক্ষদায়ক ধর্ম্মশাস্ত্র অসাম্যের প্রচারক এবং অসূয়ামূলক—তাহা মানবকে সরল ও মুক্তভাবে ধর্ম্মদান না করিয়া বিবিধ উপায়ে পাকে প্রকারে ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত করিতেই তৎপর—বিবেক ইহা কিছুতেই অনুমোদন করে নাই। তাই বিক্ষুব্ধ ও ব্যথিত প্রাণে 'শূদ্র' খ্যাত কোটি কোটি মানব সন্তানের কলঙ্কের যথার্থতা নিরূপণ করিবার জন্য শাস্ত্রালোচনায়—শাস্ত্রের মূলদেশ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। তাহার ফলে আবাল্যের সাধনায় যে সত্যের সন্ধান পাইয়াছি, তাহাই প্রাণপ্রিয় শূদ্র ভ্রাতৃগণের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম। তিরস্কার পুরস্কারের দিকে দৃক্‌পাত করি নাই।

আমার ঐকান্তিক নিবেদন, হিন্দুজাতির এই শোচনীয় অধঃপতনকালে সুধী সমাজ এই পুস্তক ধীরভাবে আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন। সমাজের এই মুমূর্ষু দশায় এরূপ গ্রন্থের প্রচার উচিত কি না সে বিচারের ভারও পাঠকগণের উপর। এই পুস্তক হিন্দুজাতির এই আসন্নকালে বিষক্রিয়া করিবে, কি মৃতসঞ্জীবনীর ন্যায় জীবনপ্রদ কল্যাণজনক হইবে তাহা শ্রীভগবানই জানেন। কেহ বলিতেছেন, এরূপ অসার জঘন্য পুস্তক অগ্নির মুখে অথবা আবর্জ্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য; আবার অনেকের মত এরূপ গ্রন্থ প্রচারে হিন্দুসমাজ মরণ-মুখ হইতে জীবনলাভের দিকে অগ্রসর হইবে। এই আশা ও নিরাশার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে ইহার উৎপত্তি। জানি না ইহার ফল কিরূপ দাঁড়াইবে। তবে সমাজের কল্যাণ কামনা করিয়াই এ পুস্তক লিখিয়াছি; সমাজের মঙ্গলোদ্দেশ্যেই ইহার প্রচার। কর্ম্মে আমাদিগের অধিকার—ফলে নহে। প্রভুর মঙ্গলময় ইচ্ছাই পূর্ণ

হইবে। লোকের প্রশংসা নিন্দা বা গালাগালির মূল্য কতটুকু? কৃতকার্য্য হই বিলক্ষণ, না হই তাহাতেও ক্ষতি নাই।

কপটতায় হিন্দুসমাজ জর্জ্জরিত। এখন আর লজ্জা করিয়া নীরবে বসিয়া থাকিবার সময় নাই। সত্যের মন্দাকিনী-জলে ইহার আপাদমস্তক বিধৌত করার প্রয়োজন। এরূপ পুস্তক প্রচারে যে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা পলে পলে, লেখক তাহা অবগত আছে। খৃষ্টের ক্রুশ, লুথরের প্রাণাহুতি, নিত্যানন্দের নিগ্রহ—তা ছাড়া মহাত্মা রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দের প্রতি কঠোর অত্যাচারের কথা লেখকের মানসক্ষেত্রে সদা জাগরূক। জানি সংস্কারকের পথ কুসুমসমাকীর্ণ নহে—ভয়ঙ্কর কণ্টকপূর্ণ। এ পথে পলে পলে বিঘ্ন বিপদ,—নির্য্যাতন লাঞ্ছনা পদে পদে। তবে এই অবিচার অত্যাচার, অন্যায় ও যথেচ্ছাচারের যুগে কোটি কোটি পতিত উপেক্ষিত অবজ্ঞাত,—শ্রীভগবানের স্নেহের সন্তান—শূদ্র ভ্রাতৃগণের প্রতি যে একবিন্দু সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইলাম—তাহাদের পক্ষ হইতে যে আজ দু'টি কথা বলিতে পারিলাম—ভবিষ্যৎ-নির্য্যাতন-কল্পনার মধ্যে তাহা মনে করিয়া আমার বুক আশা ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইতেছে। আমার মত অকিঞ্চনের এই সামান্য পুস্তক পাঠ করিয়া আমার বহু ভাই ভগিনীর হৃদয়ে নীরবে অজ্ঞাতে আমার নিমিত্ত যে কল্যাণ-মন্ত্র উচ্চারিত হইবে তাহাই আমার সান্ত্বনা, তাহাতেই আমার তৃপ্তি!

হিন্দুসমাজের যাহা কিছু গৌরব—ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি ধন রত্ন মণি মাণিক্য ছিল, সে সমুদয়ই নানাপ্রকারে অপহৃত হইয়াছে। অবশিষ্ট যাহা কিছু আছে তাহাও কপটতা, স্বার্থপরতা, নীচ আর্য্যামী-রূপ তস্কর অপহরণে উদ্যত। লেখক চোর তাড়াইতে বা দণ্ড দিতে অক্ষম, তবে কুক্কুররূপে উচ্চ চীৎকার ধ্বনিতে নিদ্রিত গৃহস্থকে জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছে মাত্র।

ইহা ভিন্ন অন্য কোন নীচ উদ্দেশ্য নাই। তীব্র যাতনার প্রতিকার চেষ্টা আরব্ধ হয়। সামান্য ক্ষতের চিকিৎসার জন্য কেহ চিকিৎসক ডাকে না। পাপে তাপে অত্যাচার অবিচারে বিধাতাপ্রদত্ত ন্যায়দণ্ডে হিন্দুসমাজ-দেহ ক্ষত বিক্ষত; ক্ষত সামান্য বলিয়া কেহ গ্রাহ্য করিতেছেন না। তবে এই ক্ষতে শক্ত আঘাত লাগিলে বা একখণ্ড তপ্ত লৌহশলাকা বিদ্ধ করিলে তখন সকলে ইহার বিষয় একটু চিন্তা করিতে অগ্রসর হইবেন—এই আশা ও ভরসায় বহুস্থলে সুতীব্র বাক্যদণ্ড প্রহার করিয়াছি। সামান্য আঘাতে এই জড়পিণ্ডপ্রায় সমাজ-চক্ষু মেলিবে না মনে করিয়া আঘাতের উপর তীব্র আঘাত দিয়াছি। বিশ্বাস, তীব্র যন্ত্রণায় যদি প্রতিকারের জন্য সকলে সচেষ্ট হন!

আশা করি এই পুস্তক প্রচার হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজপতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়গণের মধ্য হইতে ইহার বহু প্রতিবাদ পুস্তক বাহির হইবে এবং হিন্দুসমাজের দুরবস্থার প্রতিকারকল্পে বহু আলোচনা ও আন্দোলন অনুষ্ঠিত হইবে। বঙ্গে বহু সমাজতত্ত্বজ্ঞ মনীষী পুরুষ আছেন; এবম্প্রকারের পুস্তক রচনার ভার তাঁহাদিগের হস্তে পড়াই সঙ্গত ছিল। * * * অশিক্ষিত শূদ্র ভ্রাতৃগণের হৃদয়ে জাতিভেদ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি স্থূল ধারণা জন্মাইয়া দিবার জন্য যথাশক্তি সরল ভাষায়, কোন কোন স্থলে কথার ভাষায় এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গলার শিক্ষিত ভ্রাতৃগণ এ পুস্তক পাঠ করিবেন বা ধীরভাবে আলোচনা করিবেন, এরূপ আশা করা স্পর্দ্ধার কথা। আমার ন্যায় অযোগ্যের পক্ষে এরূপ বিস্তৃত গ্রন্থরচনায় ও সঙ্কলনে পদে পদে ভুল ভ্রান্তি থাকা অসম্ভব নহে—বরং বিশেষ সম্ভব। বিশেষতঃ সমাজতত্ত্বরূপ দুরূহ বিষয়ে। আমি স্বাধীন চিন্তা ও আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া পথ বাহির করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। যোগ্য ব্যক্তি অগ্রসর হউন। বঙ্গভাষার শোভাবর্দ্ধন উদ্দেশ্যে অথবা বঙ্গীয় সাহিত্য

সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিবার দুরাশা লইয়া এ পুস্তক লিখিত হয় নাই। এই পুস্তক পাঠে একজন পাঠকের মনেও যদি ধ্বংসোন্মুখ সমাজের কল্যাণ-কামনা জাগিয়া উঠে, তাহা হইলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, এই পুস্তক প্রণয়নে "হিন্দু পত্রিকা"য় প্রকাশিত অশেষ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ, মহোদয় লিখিত "জাতিভেদ" প্রবন্ধ হইতে আমি প্রভূত সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। বস্তুতঃ তাঁহার প্রবন্ধই এই পুস্তকের আরম্ভ ও ভিত্তি। এতদ্ভিন্ন স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ, মহোদয় প্রদত্ত "জাতিভেদ" নামক বক্তৃতা, লেপ্টন্যাণ্ট কর্ণেল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "ধ্বংসোন্মুখ জাতি"—"হিন্দু পত্রিকা" প্রভৃতি এবং অন্যান্য বহুতর পত্রিকা, পুস্তক ও প্রবন্ধ হইতেও যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছি। "সংহিতাদির" অনুবাদ অংশ, পণ্ডিত-প্রবর পূজনীয় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত "বঙ্গবাসী কার্য্যালয়" হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী হইতে গ্রহণ করিয়াছি। তজ্জন্য আমি ইঁহাদের সকলের নিকট চির কৃতজ্ঞ এবং বলিতে কি, এই সমস্ত পুস্তকের সাহায্য না পাইলে "জাতিভেদ" প্রকাশিত হইত কি না সন্দেহ। অলমিতি * * * * * * *

পোঃ সিরাজগঞ্জ
কাওয়াকোলা শ্রীশ্রীবংশীবদন
কালাচাঁদের শ্রীঅঙ্গন।
জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন।

মুদ্রণ ব্যয় বহনে অসমর্থতা হেতু প্রায় এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত 'জাতিভেদ' নিঃশেষিত হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও উহা পুনর্মুদ্রিত করিতে পারি নাই। পরম করুণাময় শ্রীহরির অপার করুণায় পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত কলেবরে সম্প্রতি উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই নাটক নভেল ও উপন্যাস প্লাবিত দেশে জাতিভেদের ন্যায় সমাজতত্ত্ব বিষয়ক নীরস গ্রন্থ যে দ্বিতীয়বার মুদ্রণের প্রয়োজন হইবে, ইহা কখনও মনে করিতে পারি নাই। ভগবৎ কৃপায়, জাতিভেদ সাহিত্যে ও সমাজে আশাতীত আদৃত হইয়াছে। ইহার প্রচারে সমগ্র বঙ্গদেশ হইতে,—অবজ্ঞাত শ্রেণীর মর্ম্মস্থল হইতে বিপুল আনন্দধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। এত অধিক আবেগভরা ও হৃদয়োচ্ছাসপূর্ণ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি যাহা একত্র করিলে ছোটখাট একখানা মহাভারত হইতে পারে।

বলা বাহুল্য ঐ সঙ্গে জনকয়েক স্বয়ং নির্ব্বাচিত, জাতিকুল বিদ্যাভিমানী সমাজপতি—'ও (গ্রন্থকার) মূর্খ, উন্মাদ, ব্রাহ্ম,—ছোট লোকদের নিকট প্রচুর টাকা খাইয়া বই লিখিতেছে, প্রভৃতি তিরস্কার বাক্যে পুরস্কৃত ও গাত্রদাহ নিবারণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহাদের এই কটুক্তি, তিরস্কার ও ভর্ৎসনা আমি "গুরুগঞ্জন, চন্দন, অঙ্গভূষা" করিয়া—আশীষকুসুমজ্ঞানে সাদরে শিরে বহন করিয়াই ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছি।

মক্ষিকার ন্যায় যাঁহারা সতত পরদোষানুসন্ধান-তৎপর এবং যাঁহারা আলোচ্য বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল ভাষার দোষ অন্বেষণে, শ্লোকের অনুস্বর বিসর্গের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারে, কূটার্থ নিরূপণে শক্তি ক্ষয় করিয়া মরিতেছেন—তাঁহাদিগকে আমার কিছুই বলিবার নাই,—আমার গ্রন্থাবলী তাঁহাদের ন্যায় হৃদয়হীন, স্বজাতি ও স্বদেশদ্রোহী, সবজান্তা, অহং সর্ব্বস্ব, হামবড়াদের জন্য লিখিত হয় নাই। ইতি বৈশাখ ১৩২৫

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন।

বৎসরাধিক কাল 'জাতিভেদ' দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও অর্থাভাবে তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রিত করিতে পারি নাই। সম্প্রতি ১৬০০ ষোল শত টাকা ঋণ করিয়া জাতিভেদাদি (শূদ্রের বেদাধিকার, জলচল ও চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ প্রভৃতি) গ্রন্থ চতুষ্টয় পরিবর্দ্ধিত আকারে তৃতীয় ও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

পাঠকগণের প্রতি আমার নিবেদন—আমার গ্রন্থাবলী যাঁহাদের প্রাণে লাগিবে এবং পাঠে যাঁহাদিগের হৃদয়ে নব আশা উদ্দীপনা ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষার সুরতরঙ্গিণী প্রবাহিত করিবে, তাঁহারা শুধু মিথ্যা স্তুতি, বাহিক ভক্তি ও মৌখিক সহানুভূতি প্রদর্শন না করিয়া যাহাতে আপন আপন সমাজে, আত্মীয় স্বজনে ও বন্ধু বান্ধবগণের মধ্যে ইহার বহুল প্রচার হইয়া গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও ঋণমুক্তির সহায়তা হয় তৎপক্ষে যত্নবান্ হইবেন।

এই সংস্করণে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণের 'সৃষ্টিতত্ত্বে বিভিন্ন মত' বিষয়ক ষষ্ঠ অধ্যায় অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত এবং দশম ও ত্রয়োদশ অধ্যায় নব সংযোজিত হইল। দশম অধ্যায়টী সুবিখ্যাত কবি শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু বি, এ, কবিভূষণ প্রণীত 'পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য' হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। এজন্য গ্রন্থকারের নিকট হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

অন্যের উদ্ধৃত অংশের—শাস্ত্র ও শ্লোক নির্দ্দেশে, দ্রুত সম্পাদন ও প্রুফ্ পরিদর্শনের ত্রুটী বশতঃ এবারও অনেক ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গেল। সুধীগণ এসব অনিবার্য্য ত্রুটী নিজগুণে মার্জ্জনা করিয়া লইবেন। পরবর্ত্তী সংস্করণে সমুদয় দোষ যথাসাধ্য সংশোধন করা হইবে। ইতি ২৫শে কার্ত্তিক ১৩৩১।

সূচীপত্র।

বিষয়		পত্রাঙ্ক
অবতরণিকা	...	১—১২
প্রথম অধ্যায়—আর্য্যজাতি ও জন্মগত জাতিভেদ		১৩—৩০
দ্বিতীয় অধ্যায়—গুণকর্ম্মগত জাতিভেদ		৩১—৫৫
তৃতীয় অধ্যায়—গুণকর্ম্মগত জাতিভেদের কতিপয় উদাহরণ		৫৬—৬৭
চতুর্থ অধ্যায়—বিবাহ ...	...	৬৮—৭৮
পঞ্চম অধ্যায়—আহার ...	...	
ষষ্ঠ অধ্যায়—জাতিভেদ উৎপত্তির কারণ	...	৮৯—১১২
সপ্তম অধ্যায়—সঙ্কর বর্ণ ...	...	১১৩—১৩৪
অষ্টম অধ্যায়—শূদ্রের প্রতি ঘোর অবিচার	...	১৩৫—১৬৫
নবম অধ্যায়—নিম্নশ্রেণী ...	...	১৬৬—২০০
দশম অধ্যায়—জাতিভেদের অনিষ্টকারিতা	...	২০১—২৩৫
একাদশ অধ্যায়—নিপীড়িতের নিদ্রাভঙ্গ	...	২৩৬—২৫১
দ্বাদশ অধ্যায়—পরিণাম ও প্রতিকার	...	২৫২—২৬২
ত্রয়োদশ অধ্যায়—জলচল ও অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন		২৬৩—২৮৫
চতুর্দ্দশ অধ্যায়—সমাজপতি ব্রাহ্মণের প্রতি নিবেদন		২৮৬—৩৫৯

অবতরণিকা।

এই সেই পবিত্রভূমি, যথায় সহস্র সহস্র ঋষি তটিনীতট মুখরিত করিয়া সামবেদের প্রাণস্পর্শী সঙ্গীতপ্রবাহে হিংস্র পশুপক্ষী পর্য্যন্ত আকুল করিয়া তুলিতেন; এই সেই প্রাচীন ভূমি, যে স্থানে হিমালয়-তুষার-শুভ্র-কিরিট-প্রবাহিনী জাহ্নবী-যমুনা, গোদাবরী-সরস্বতী, ব্রহ্মপুত্র-সিন্ধু, কাবেরী-নর্ম্মদা প্রভৃতি পুণ্যসলিলা স্রোতস্বিনীকুল, কুলকুলনাদে পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিগাথা গাইয়া গাইয়া এখনও অবিরাম গতিতে সমুদ্রাভিমুখে গমন করিতেছে; এই সেই দেশ, যেখানে মান্ধাতা-হরিশ্চন্দ্র, দিলীপ-রঘু, নিমি-শিবি, শ্রীরাম-যুধিষ্ঠির প্রভৃতি প্রজাবৎসল নরপতিগণ পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রকৃতিপুঞ্জকে লালনপালন ও শাসনসংরক্ষণ করিয়া ধরা হইতে অপসৃত হইয়াছেন; যেস্থানে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-জামদগ্ন্য, পৃথু-ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণ অজেয় বাহুবলে ধরাতলে বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন; যেস্থানে ভ্রাতৃ-স্নেহে অনুপ্রাণিত হইয়া কনিষ্ঠ সহোদর বিষয়সুখ পরিত্যাগ এবং জটাবল্কল পরিধানপূর্ব্বক দণ্ডীবেশে চতুর্দ্দশ বৎসর নিবিড় অরণ্যে জীবন যাপন করাই জীবনের সর্ব্বার্থ মনে করিতেন; ভ্রাতৃস্নেহে বক্ষে শেলাঘাত পর্য্যন্ত স্মিতমুখে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; যে স্থানে পিতৃসত্যপালনের নিমিত্ত জ্যেষ্ঠপুত্র যৌবরাজ্যে অভিষেকের পরিবর্ত্তে গহনারণ্যে গমন করিয়াছিলেন, যেখানে রাজনন্দিনী রাজবধূগণ রাজ্যপরিভ্রষ্ট স্বামীর সহিত অনাথিনী কাঙ্গালিনী বেশে কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর অরণ্যপথে ক্ষতবিক্ষতদেহে রক্তাক্তচরণে পরিভ্রমণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; যে দেশের নরপতি সসাগরা ধরিত্রী দান করিয়া দক্ষিণার জন্য স্ত্রীপুত্র বিক্রয় ও এমন কি নিজকে চণ্ডালকরে, বিক্রীত করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই; যে দেশের

নরপতি এবং অধিবাসিগণ অতিথি সৎকারের, শরণাগতের জীবনরক্ষার নিমিত্ত নিজের মাংস প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম সন্তানের মাংস দান করিয়াছেন, যে দেশের নারীগণ পতিনিন্দায় সতীত্ব রক্ষার জন্য অবলীলাক্রমে দেহত্যাগ ও জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে জীবন আহুতি দান করিয়াছেন, যে দেশের ঋষিগণ কাঞ্চনে কাচে, মণিতে লোষ্ট্রে, বিষধরে হারে, বিষ্ঠায় চন্দনে সমজ্ঞান করিতেন, সেই সব ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীর সত্যবীর দানবীর সমদর্শী বিশ্বপ্রাণ আর্য্যজাতির চির আদরের বাসভূমি, সসাগরা ধরিত্রীর বরেণ্য ভারতবর্ষের কি শোচনীয় পরিণাম! যে দেশে সর্ব্বপ্রথম সামগান উচ্চারিত হইয়াছিল, যে দেশে সর্ব্বপ্রথম মহাসাম্যবাদের বিজয়-দুন্দুভি-ধ্বনি উত্থিত হইয়া দিঙ্‌মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল, সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব যে দেশের মনীষি-বৃন্দের মস্তিষ্কে প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিল, "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং" ধ্বনি যে দেশে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল, যে দেশের ঋষিগণ "সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন" করিয়া ভগবানের অনন্তত্ব জগৎ সমক্ষে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন, জীব ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছুই নহে, ব্রহ্ম ব্যতীত এ জগতে অন্য কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব নাই, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র আকাশ পাতাল পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বস্থানে সর্ব্বজীবে ব্রহ্মদর্শন ব্যতীত মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই,—যে দেশের তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ এই মহাসত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই দেশে—সেই মহাসাম্যবাদের উৎপত্তিস্থান পুণ্যভূমি আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষে, বর্ত্তমান সময়ে, "ভেদের" ভীষণ বৈষম্যবাদ আলোচনার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। যে ঋষিগণ জীবমাত্রকে সচ্চিদানন্দ-সাগরের তরঙ্গরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্রাণীমাত্রকে সূর্য্য স্বরূপ পরম ব্রহ্মের রশ্মিরূপে প্রচার করিয়াছেন—সেই দেশে আজকাল মহাভেদ বুদ্ধির রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে আর্য্যগণের ভক্তিপ্রবণহৃদয় জলস্থলে, অনল-অনিলে সর্ব্বত্রই বিশ্বময় প্রভু ভগবান্

শ্রীহরির মঙ্গলময় মূর্ত্তি সন্দর্শন করিতেন; ব্যাঘ্র ভল্লুক সিংহ শার্দ্দূলকে যাঁহারা পদ্মপলাশনেত্র নারায়ণের বিভূতিজ্ঞানে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া যাইতেন, যাঁহারা বিশ্বের প্রতি বস্তুতে বিশ্বনাথ ভগবানের চিৎ শক্তির অপূর্ব্ব মাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া তন্ময়ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন; যে আর্য্যঋষিগণের বিশ্বপ্রেমিকতার মনোমোহিনী শক্তিতে পবিত্র মুনি-কাননে ব্যাঘ্র হরিণ, ভেক সর্প, মূষিক মার্জ্জার পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ ভুলিয়া আনন্দে বিহার করিত, যাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রাণী-হিতরত-বিশাল হৃদয় মানবজাতির যাবতীয় দুঃখ দৈন্য শোকতাপ ঘুচাইবার জন্য সর্ব্বদা প্রতিকার কল্পে নিয়োজিত থাকিত, সেই পবিত্র হৃদয়-রক্তে পরিবর্দ্ধিত আমরা, কি পাপ সঙ্কীর্ণতা লইয়াই না লিপ্ত রহিয়াছি? যে দেশে এমন সব মহান্ ভাব প্রচারিত হইয়াছিল, সেই দেশে কিনা জাতিভেদতর্ক উপস্থিত! বেদান্তকেশরী গভীর গর্জ্জনে বলিতেছেন "এক মহান্ গুণাতীত পরমেশ্বর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন। তিনিই একমাত্র অনন্ত। মহাসমুদ্রে জলচর জীবের ন্যায় অথবা মহাকাশে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদির ন্যায় এ জগৎ তাঁহাতে মগ্ন হইয়া আছে। ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। সমস্তই ব্রহ্মময়। জড়বুদ্ধি মানব ভ্রমবশতঃ তাঁহাতে উপাধি আরোপ করিয়া স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করিতেছেন। অজ্ঞানতাবশতঃই জীবকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক করিতেছে। এমন প্রাণপ্রদ মৃত সঞ্জীবন-মন্ত্র ত্যাগ করিয়া কেন আমরা এদিকে ওদিক ছুটাছুটি করিয়া থাকি। শ্রুতি বিগর্হিত মতবাদে কেন আমরা আত্মহারা হইয়া অন্ধের ন্যায় কুপথে বিপথে পদচালনা করিতেছি। জাতি আবার কি? জাতি বলিতে আমরা বুঝি একমাত্র মানবজাতি। এই মানবজাতির জন্য সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের অবতারকুল, ঋষিগণ ও ঋষিপ্রতিম মহাপুরুষগণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া নানাবিধ তত্ত্বজ্ঞান ও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সেইগুলিই

মানবমাত্রের চিন্তনীয় বিষয়—আলোচনার যোগ্য এবং ভাবিবার সামগ্রী। নেশন (Nation) বলিতে যেরূপ জাতি বুঝায়, তাহা এ হতভাগ্য দেশ হইতে বহুদিন লুপ্ত হইয়াছে, আর কাষ্ট (Caste) বলিতে যে জাতি বুঝায়, তাহাই এ হতভাগ্যদেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। নেশন (Nation) বলিতে আমাদের একটীও নাই; কিন্তু কাষ্ট (Caste) বলিতে আছে ছত্রিশটী বা ততোধিক। হায় ভারতের কর্ম্মভোগ! হিন্দুজাতি বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহা আর আমরা নহি। হিন্দু বা আর্য্যজাতি অনেকদিন লোকান্তর গমন করিয়াছেন, এখন যাহা আছে তাহা তাঁহাদের কঙ্কালাবশেষ মাত্র। হিন্দুজাতি অপেক্ষা হিন্দু সম্প্রদায় বলাই বর্ত্তমানে যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং যে জাতির একটা জাতীয়ত্বই নাই, তাহার আবার ভেদাভেদ কি? হিন্দু-সম্প্রদায়ের জাতিভেদকে বর্ণবিভাগ বা সম্প্রদায়-বিভাগ আখ্যা দেওয়াই যেন সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। জাতিভেদ বলিতে যাহা বুঝা যায়, সাম্প্রদায়িক বা বর্ণবিভাগ বলিতে ঠিক তাহাই বুঝা যায় না। এই সম্প্রদায়বিভাগ ভূমণ্ডলের সর্ব্বদেশে সর্ব্ব সময়ে বিদ্যমান ছিল, আছে ও থাকিবে। যেমন অভিজাত সম্প্রদায়, শ্রমজীবী সম্প্রদায়, ধনী সম্প্রদায় প্রভৃতি সভ্যদেশে আজকাল নানা সম্প্রদায়ের কথা আলোচিত হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে অভিজাতজাতি শ্রমজীবী জাতি বা ধনিজাতি বলা ঠিক নহে। কেননা আজ যে শ্রমজীবী—চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা কাল সে অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু আমাদের দেশেও কি সেইরূপ জাতিভেদ বিদ্যমান? আজ যে শূদ্র কালি সে ব্রাহ্মণ হইয়া যাইতে পারে? না, তাহা নহে, এ জাতিভেদের গ্রন্থি সেরূপ শিথিল নহে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতিভেদের ইহাই রহস্য, ইহাই পার্থক্য। অনেকে ভ্রমবশতঃ উভয় দেশের জাতিভেদকে একই স্থানে আসন প্রদান করিয়া থাকেন।

বিশ্বপতির রাজ্যে ভেদবুদ্ধি নাই—ভেদবুদ্ধি অজ্ঞানের নরক-হৃদয়ে। সেই পরম পিতার রাজ্যে সকলেই সমান, সকলেই এক মানব-পরিবারভুক্ত। তিনি কাহাকেও ছোট, কাহাকেও বড় করিয়া সৃষ্টি করেন নাই—তিনি ধনীর জন্য এক চন্দ্র, আর দীনহীন পদদলিত গরিবের জন্য আর এক চন্দ্র প্রদান করেন নাই। ব্রাহ্মণের জন্য এক সূর্য্য আর চণ্ডালের জন্য অন্য সূর্য্য পাঠাইয়া দেন নাই। এক নীল বিরাট চন্দ্রাতপতলে এক বিরাট মানবপরিবার, একই সূর্য্যের উত্তাপ ও একই পবনের নিশ্বাস গ্রহণ করিতেছে, এক চন্দ্রের শীতলকরস্পর্শে সকলেই সমভাবে চিত্তবিনোদন করিতেছে। তাঁহার রাজ্যে কোন বৈষম্য নাই—কোনও ভেদাভেদ নাই। ছোট বড় অভিমান তাঁহার পবিত্র রাজ্যে স্থান পায় না। সমস্ত পুত্র কন্যা তাঁহার সমান স্নেহের অধিকারী। ব্রাহ্মণকে তিনি ভালবাসেন আর চণ্ডালকে তিনি দূর দূর করিয়া তাঁহার স্নেহের ক্রোড় হইতে তাড়াইয়া দেন অথবা ধনবানের অতুল ঐশ্বর্য্য আছে বলিয়া ভগবান তাঁহারই কথা শুনিয়া থাকেন আর সহায়সম্পদবিহীন গরীবের পাষাণভেদী আর্ত্তনাদেও একটু আশ্বাসের অমৃতধারা ঢালিয়া দিতে কৃপণতা করিয়া থাকেন, ইহা হইতে পারে না। তবে অনেকে এস্থলে প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন, তিনি কাহাকেও পশু কাহাকেও পক্ষী, কাহাকেও কীট, কাহাকেও পতঙ্গ এবং কাহাকেও নরনারী অন্ধ খঞ্জ সুখী দুঃখী করিয়া কেন এ সংসারে পাঠাইলেন! তিনি না সমদর্শী! ইহার উত্তরে শাস্ত্রকার বলেন—শ্রীভগবান লীলাচ্ছলে বিভিন্ন আকারের জীবদেহ সৃষ্টিপূর্ব্বক তন্মধ্যে পরমাত্মারূপে অংশ কলায় অবস্থানকরতঃ তৎ তৎ দেহ দ্বারা স্বকীয় লীলারস ও এই বৈচিত্র্যময়ী ধরিত্রীর মাধুর্য্য সম্ভোগ করিতেছেন। কেবলমাত্র রাজা রাজড়া, মুনি ঋষি বা ইন্দ্রচন্দ্র দ্বারা যেমন কোন নাটক অভিনয় হইতে পারে না; অভিনয়ের জন্য রাজা প্রজা, দেবতা মানব,

পুরুষ নারী, পাপী পুণ্যবান, ভক্ত ভগবান, অন্ধ খঞ্জ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সাজিবার প্রয়োজন হয়, এই বিশ্ব রঙ্গমঞ্চের বিরাট অভিনয় ব্যাপারেও সেইরূপ বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন জাতির মানব এবং বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতিবিশিষ্ট জীব জন্তু সৃষ্টির প্রয়োজন। শুধু একই জাতীয়,—একই সাজসজ্জায় সজ্জিত, একই আকার ও প্রকৃতিবিশিষ্ট মানবগণের দ্বারা কখন অভিনয়ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না। অভিনয়ে বৈচিত্র্যের একান্ত প্রয়োজন। তাই শ্রীবিশ্বেশ্বর ভগবানের বিরাট বিশ্বে রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, নরনারী, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, পশু পক্ষীর সমাবেশ প্রয়োজন। এখানে বড় ছোট, উচ্চ নীচ, উত্তম অধমের কোন প্রশ্ন নাই। ইহা অভিনয় মাত্র।

বিধাতার রাজ্যে বৈচিত্র্য থাকিতে পারে, কিন্তু বৈষম্য থাকা অসম্ভব। তিনি মানবকে বিভিন্ন বংশে পাঠাইয়া দিলেও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে আমরা ইহা বেশ উপলব্ধি করিতে পারি যে, তিনি সকলকেই সমান শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই। শিল্পীর হৃদয়ে যে শিল্পনৈপুণ্য আছে, ধনীর তাহা নাই, আবার ধনবানের যাহা আছে, শিল্পীর তাহা নাই। শ্রমজীবির শরীরে যে শ্রমশক্তি আছে তাহা হয়ত একজন শিক্ষকের নাই; আবার শিক্ষকের যে ধীশক্তি আছে শ্রমজীবির তাহা নাই। একজন বিশ্ববিখ্যাত বলিষ্ঠ পালোয়ানের যে শারীরিক শক্তি আছে একজন বিচারপতির তাহা নাই এবং বিচারপতির যে সূক্ষ্মদর্শিতা আছে ঐ বলীর তাহা নাই। একজন চর্ম্মকারের বা একজন চিত্রকরের যে কর্ম্মশক্তি আছে, সে শক্তি কি কোনও বড় বৈজ্ঞানিকের কি বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আছে? তাহা নাই—আবার অন্য পক্ষেও ঐরূপ। একজন কৃষক বা একজন মুটে রবিকর-উত্তপ্ত মধ্যাহ্ন-সময়ে যেরূপ কৃষিকার্য্য করিতে পারিবে বা দুই মণ আড়াই মণের যে মোট বহিতে পারিবে, একজন

রসায়ন-তত্ত্ববিদ্ বা একজন দার্শনিক কি তাহা কখন পারিবেন? না কখনই পারিবেন না। সুতরাং আমরা বেশ দেখিতে পারিলাম সাংসারিক স্থূল দৃষ্টিতে আমরা বহু বিষমতা বা পার্থক্য দেখিলেও বিচারসিদ্ধ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এক মহান্ সমতা বিদ্যমান। কাজেই বলিতে হইতেছে, ঈশ্বর সমান শক্তি দিয়া সকলকে এ সংসারে পাঠাইয়াছেন। ছোট বড় ভেদ করিবার আমাদের কি শক্তি বা অধিকার আছে? ভগবান কি কোনও ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া বলিয়া দিয়াছেন "হে কলির ব্রাহ্মণগণ! তোমাদিগকে শূদ্রাপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ করিয়া, সমাজের সম্রাট করিয়া সংসারে পাঠাইলাম; তোমরা যথা ইচ্ছা ছলে বলে কৌশলে, শাস্ত্রের বচন দিয়া, বেদের দোহাই দিয়া, শূদ্রদের ধনরত্ন আত্মসাৎ কর, তাহাদের হৃদয়শোণিত মহাসুখে মনের আনন্দে পান কর, তাহাদিগকে কোনও প্রকার জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইবে না, তাহারা অবিদ্যার অন্ধকারে ডুবিয়া মরুক—তাহারাই সয়তান স্বরূপ নিত্য ঘৃণার্হ। উহাদের দ্বারা জগতের কোন উপকার নাই—উহারা ধরিত্রীর ভারস্বরূপ। 'যেন তেন প্রকারেন' উহাদিগকে পদদলিত করিয়া ধরা হইতে অপসৃত কর। উহাদিগকে দাবাইয়া মার, উহাতে ন্যায়ের মর্য্যাদা কিছুমাত্র লঙ্ঘিত হইবে না। জগতের যাবতীয় অত্যাচার লাঞ্ছনা নির্য্যাতন উহাদিগের মস্তকোপরি বর্ষণ কর। যে পর্য্যন্ত একটী মাত্রও অবশিষ্ট থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিরস্ত হইও না।"

বাস্তবিক সমদর্শী পরমমঙ্গলময় শ্রীভগবান মানবজাতিকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্ররূপে সংসার রঙ্গশালায় পাঠাইয়া দিয়াছেন কিনা সে বিচার আমরা পরে করিব ও হিন্দুশাস্ত্রকারগণ চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিরূপ কি লিখিয়াছেন তাহাও যথাক্রমে পরে লিপিবদ্ধ করিব। সংস্কৃত শ্লোক দেখিলেই দশাধরা আমাদের এ দুর্ব্বল প্রাণহীন জাতির একটা রোগের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। আর তাহাদের দোষই বা কি—বহুদিন ব্রাহ্মণগণের

কৃপার অপেক্ষায় থাকিয়া, জ্ঞান বিদ্যায় জলাঞ্জলি দিয়া, তাহারা একরূপ মনুষ্যাকার পশুবৎ হইয়া গিয়াছিল। শুভক্ষণে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কৃপায় অবাধ বিদ্যা প্রচারে দেশের নরনারীর তথাকথিত শূদ্রজাতির বিশুষ্ক বদনমণ্ডলে হাসিরেখা দেখা গিয়াছে, মনুষ্যত্বের পুনরধিকার পাইবার আশা, তাহাদের বেদনা-বিদ্ধ হৃদয়কে সরস করিয়া তুলিয়াছে।

সাম্যবাদ সম্বন্ধে বহুলোকের বহুভ্রান্ত ধারণা আছে, আমরা এসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে চাই। শুধু বর্ত্তমান যুগের দুই দশজন সমাজ বিপ্লবকারী নহে, যাবতীয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ ও সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের অবতারকুল দুই বাহু উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া জগৎ সমক্ষে পুনঃ পুনঃ এই সাম্যবাদ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এই মহাসাম্যবাদের প্রেম-মন্দাকিনী নীরে স্নান করিয়া জগতে কতজন স্ত্রী পুত্র পরিজন পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্যঝুলি স্কন্ধে লইয়া জগতের দ্বারে দ্বারে এই স্বর্গীয় বাণী অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে ঘোষণা করিয়াছেন, "আমরা সব ভাই ভাই, আমরা সব এক পিতার সন্তান"। এই স্বর্গীয় সুধা পান করিয়া এক সময়ে বৈদিক ঋষিগণ এই পৃথিবীতে সত্য যুগ আনয়ন করিয়াছিলেন। এই মহাসাম্যবাদের অমৃত আস্বাদ পাইয়া একদিন ঈশা মুসা শঙ্কর বুদ্ধ মহাবীর রামানুজ প্রভৃতি যুগাচার্য্যগণ পৃথিবীতে কি এক স্বর্গের স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন। "ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ভীষণ বৈষমভাবে যখন ভারত দগ্ধ হইতেছিল—যখন নীচ জাতি সকল কুক্কুর শৃগালের ন্যায় ব্রাহ্মণদিগের পরিত্যজ্য হইয়াছিল, যখন সমাজের কঠিন শাসনে সমাজবন্ধন কেবল যন্ত্রণার কারণস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল, যখন শুষ্ক তার্কিকতায় স্নেহ প্রেম ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়ের কোমলতমবৃত্তি সকল বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, সেই সময় মহাপ্রাণ চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। চৈতন্যদেব স্বয়ং অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্য নীরস, সাম্যভাব-

বিহীন ও হৃদয়ের পরিপুষ্টিবিরহিত ছিল না। স্বদেশের শোচনীয় দশা দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল—তিনি সন্ন্যাসী হইলেন। তাঁহার প্রেম-সংকীর্ত্তনে জগৎ মুগ্ধ হইল। নিদাঘের রবিকিরণপ্রতপ্ত মৃত্তিকায় যেন বারিধারা পতিত হইল। সেই আহ্বানে সেই প্রেমসংকীর্ত্তনে হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্মণ শূদ্র একই সাম্যক্ষেত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল—"আমরা সব এক পিতার সন্তান, আমরা সব ভাই ভাই, আমরা সব ভাই বোন।" ভারতে যত যত মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন সকলেই সাম্যবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কেহই জাতিভেদ মানিতেন না—অথবা ভগবান্ কর্ত্তৃক জাতিভেদ হইয়াছে ইহাও বিশ্বাস করিতেন না। কি ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক, কি আর্য্যসমাজ, কি খৃষ্টসমাজ, কি মুসলমান সমাজ, সর্ব্ব সমাজের প্রচারকগণই জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন। দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদেও ঐ একই সাম্যভাব বিদ্যমান। অদ্বৈতবাদে সবই ব্রহ্ম সুতরাং সকলেই সমান, ছোট ব্রহ্ম বা বড় ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ বা শূদ্রব্রহ্ম এরূপ শব্দ কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না।

ব্রহ্মে ছোট বড় লিঙ্গ বয়ঃ ভেদ নাই। সবই তিনি। এ মতের প্রধান প্রচারক ও আচার্য্য শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য। আর দ্বৈতবাদ বলিতেছেন আমরা সকলেই তাঁহার দাস, তাঁহার সন্তান, তাঁহার কৃপার্থী, তাঁহার সেবক, তাঁহার অনুচর—সুতরাং জাতিভেদ বা বড় ছোট ভাব কোথায়? এ মতের পরিপোষক কলিকলুষনাশন—শ্রীভগবানের প্রেমাবতার শ্রীমৎ গৌরাঙ্গ দেব। রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দয়ানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি ঋষিপ্রতিম ব্যক্তিগণ সাম্যবাদ প্রচার করিয়াছেন ও জাতিভেদরূপ মহাবৈষম্যবাদ শাস্ত্র ও নীতিবিগর্হিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামী, ত্রৈলঙ্গ স্বামী

রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বারদীর যোগী লোকনাথ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সকলেই বর্ত্তমান জাতিভেদের বিরোধী ছিলেন।

ঐ যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বলিতেছেন—

ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদ
পিতানৈব মে মাতা চ জন্ম
নবন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যং
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং।

যদি বল 'আমরা কলির দুর্ব্বল জীব আমাদের পক্ষে অদ্বৈতানুভূতি অসম্ভব, দ্বৈতবাদই আমাদের পক্ষে প্রশস্ততর পথ। তাহাতেই বা আসে যায় কি? দ্বৈতবাদ বল, অদ্বৈতবাদ বল, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বল, বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ বল, সর্ব্বত্রই সমদর্শন, খুঁজিয়া কোথাও ভেদবুদ্ধি পাইবেনা। দ্বৈতবাদেও একই ভাব, ভাষা পৃথক্‌মাত্র। আত্মপরিচয়দানচ্ছলে শঙ্কর বলিতেছেন :—

"মাতামে পার্ব্বতী দেবী পিতাদেবোমহেশ্বরঃ
বান্ধবাঃ শিবভক্তামে ভবনং ভুবনত্রয়ম্॥"

দেবাদিদেব পরমেশ্বর আমার পিতা, "জগজ্জননী ভগবতী" ঐশীশক্তিই আমার মাতা, জীব মাত্রেই আমার পরিবার, ত্রিভুবন আমার গৃহ। "বসুধৈব কুটুম্বকম্" চরাচর বিশ্বই আমার পরিবার,—এই উদার উক্তি হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি ছত্রে দেদীপ্যমান। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলিতেছেন : –

"একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাঃ
তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥

"একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনাং
একং বীজং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনু পশ্যন্তি ধীরাঃ
তেষাংসুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥

ঐ যে ধ্যান-স্তিমিত-নেত্র মহাপ্রাণ প্রেমিক পুরুষের পবিত্র কণ্ঠ হইতে বাহির হইতেছে ঃ—

"ব্রহ্মৈকমেবাস্তি চ বেদ একো
ন জীব ভেদোঽখিল বিশ্বমেকম্।
ধরাতলে তেন বিঘোষিতেয়ং
প্রেম্নো মহাগীতিরনর্ঘ্যনীতিঃ।"

"এক ব্রহ্ম, এক বেদ, জীবে জীবে নাহি ভেদ
নাহি উচ্চ নাহি নীচ, সবি একাকার ;
এ অমূল্য মহা নীতি বিশ্ব প্রেম-মহা গীতি,
চৈতন্য প্রভাবে ভবে হইল প্রচার।" (১)

যাঁহারা বলিতেন ঃ—

"ব্রহ্ম হ'তে কীটপরমাণু, সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথায় খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন. সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" (২)

সেই দেশে এমন জঘন্য ভেদবুদ্ধির কি ভয়াবহ রাজত্ব!

জগতের এমন কোনও মহাপুরুষের নাম শুনি নাই যিনি মানব-জগতে জাতিভেদ স্বীকার করিতেন বা জাতিভেদ বিধাতার সৃষ্টি এরূপ মত প্রকাশ

(১) শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন প্রণীত "সমাজ সংস্কার".
(২) স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত "বীরবাণী"।

করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের ধীরভাবে বিবেচনা করা উচিত. আমরা কোন্ পথ অবলম্বন করিব। প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অপৌরুষেয় গ্রন্থ বেদ-বেদান্ত—বৈদিক জ্ঞানময় বপুঃ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ঋষি, শঙ্করস্বরূপ শঙ্করাচার্য্য, প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবকে অবলম্বন করিয়া তদীয় মতবাদ ও শিক্ষা দীক্ষাই গ্রহণ করিব, অথবা শ্রুতিবিগর্হিত তন্নিম্ন স্থানাভিষিক্ত ভীষণ বৈষম্যবাদপরিপূর্ণ পৌরহিত্যশক্তি সংরক্ষণে প্রাণপণে দোহাই সর্ব্বস্ব, ব্রাহ্মণ প্রাধান্য স্থাপনে বদ্ধপরিকর, পরন্ত শূদ্রশোণিত পিপাসু পরবর্ত্তী যুগের স্মৃতি ও সংহিতা এবং বর্ত্তমানকালের কতিপয় যজ্ঞসূত্র সম্বল ব্রাহ্মণ্য-শক্তিবিহীন বৈদিকক্রিয়াকলাপবর্জ্জিত ম্লেচ্ছান্ন ও শূদ্রান্নপরিপুষ্ট উপাধিব্যাধিমণ্ডিত নামমাত্র ব্রাহ্মণ কতিপয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের যুক্তিহীন অসার মতবাদই গ্রহণ করিব ইহাই হইতেছে বুঝিবার বিষয়। তত্ত্বজ্ঞ অনায়াসেই স্বীয় কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবেন। অন্ধ যে সেই ভ্রান্ত মতে মজিবে। দ্বাবিংশতি কোটী নরনারী-সমন্বিত বিরাট হিন্দু জাতির জীবন মরণ সমস্যা প্রত্যেক হিন্দু সন্তানের সমক্ষে উপস্থিত। এ সময় জাতি হিংসা, জাতি গর্ব্বে মগ্ন থাকিলে চলিবে না। ভারতের বড় দুর্দ্দিন। সপ্ত শত বৎসরের পরাধীনতায় ভারতের প্রাণশক্তি বিগত প্রায়। এ সময় কাহারও আর নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে। ভারতীয় হিন্দু মহাজাতি সংগঠনে—প্রত্যেক হিন্দু সন্তানের হৃদয়-রুধির দান প্রয়োজন। কোন বড় কার্য্যই বড় ত্যাগ ব্যতীত সম্পন্ন হইবার নহে। আমরা ভারত জননীর সুধী সন্তান বর্গের উপর ধ্বংসোন্মুখ ভারতের গুরুভার অর্পণ করিয়া গ্রন্থ প্রতিপাদ্য পরবর্ত্তী বিষয়ের অবতারণায় প্রবৃত্ত হইলাম। কুল-দেবতা বংশীবদন কালাচাঁদ এই অকৃতি অধম দাসের লেখনীকে সার্থক ও জয় মণ্ডিত করুন।

জাতিভেদ।

প্রথম অধ্যায়।

আর্য্য হিন্দুজাতি ও জন্মগত জাতিভেদ।

—:০:—

আর্য্য হিন্দুজাতি।

আর্য্য হিন্দুজাতির আদিম বাসস্থান কোথায় ছিল, তাহা যথার্থভাবে নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার, এ বিষয়ে বহু আলোচনা, বহু যুক্তিতর্ক বহু গবেষণামূলক আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য ইউরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ, বাল্টিক সাগরের তীরবর্ত্তী দেশকেই আর্য্যজাতির আদিম নিবাস বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতদিগেরই এইরূপ অভিমত যে, মধ্য এসিয়াই আর্য্যজাতির আদিম নিবাস ভূমি! আর্য্যগণ মধ্য এসিয়া হইতেই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ভট্ট মোক্ষমূলর প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলী যে সকল যুক্তি সহায়ে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"প্রথমতঃ, আর্য্যজাতির দুইটী প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটী ভারতবর্ষাভিমুখে, অর্থাৎ দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে এবং আর একটি

ইউরোপের অভিমুখে অর্থাৎ উত্তরপশ্চিম দিকে। এই দুইটী প্রবাহের সংযোগস্থল এসিয়া মহাদেশ।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীনতনকালের সভ্যদেশসমূহ এসিয়া খণ্ডেই অবস্থিত। আর্য্যভাষাসমূহের মধ্যে ঋগ্বেদের ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম। সুতরাং এসিয়া খণ্ডের মধ্যে এবং ঋগ্বেদের জন্মস্থান পাঞ্জাব প্রদেশ হইতে অনতিদূরে কোনও প্রদেশে আর্য্যজাতির আদিম বাসস্থান হওয়াই সম্ভব।

তৃতীয়তঃ, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে মধ্য এশিয়া হইতে বারবার অনেক পরাক্রান্তজাতি উদ্ভূত হইয়া ইউরোপ মহাদেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর হূনজাতি ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মোগলজাতি তাহার উদাহরণস্থল। অতএব, প্রাচীনকালেও আর্য্যগণ মধ্য এশিয়া হইতে উদ্ভূত হইয়া ইউরোপ বিজয় করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়।"

চতুর্থতঃ, যদি ইউরোপ বিশেষতঃ স্কাণ্ডেনেভিয়া হইতে আর্য্যজাতির উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে আর্য্যভাষা সমূহে সমুদ্র সম্বন্ধীয় বহুসংখ্যক সাধারণ শব্দ পাওয়া যাইত। এই সকল ভাষায় পশুবিশেষের সাধারণ নাম পাওয়া যায়, কিন্তু এই সকল ভাষায় সমুদ্র বা জলচর জীবের সাধারণ নাম পাওয়া যায় না।" (১)

এই ত গেল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভিমত। হিন্দু প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের কিন্তু অন্য মত। তাঁহারা বলেন, ভারতবর্ষেরই কোন স্থানে আদিম আর্য্যগণ বাস করিতেন।

তৎকালের সেই আদিম যুগে প্রাচীন ভারতবর্ষে যাহারা অধিবাস করিত, তাহারা কৃষ্ণবর্ণ, অধর্ম্মশীল, নীচ, ম্লেচ্ছভাষী, ছাগনাসাবিশিষ্ট এবং আমমাংসভোজী ছিল।

---

(১) পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই।

"They (the Aryans) called their adversaries (the aboriginal tribes) "Dasyus' "Rakshas" &c. They are described as irreligious, impious, and lowest of the low; they are also in some texts contemptuously called black-skinned. Thus, during the Rigvedic period, there were, if we may so express ourselves, two 'colors'—the fair (Aryan) and the black (Dasyu or Dasa.)" (1)

অর্থাৎ আর্য্যগণ তাঁহাদিগের শত্রুদিগকে (আদিম অধিবাসীদিগকে) "দস্যু", "রাক্ষস' প্রভৃতি বলিয়া অভিহিত করিত। তাহারা নীচ হইতে নীচ, ধর্ম্মবিহীন ও অধার্ম্মিক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা কোন কোন স্থলে অবজ্ঞাভরে কৃষ্ণকায় বলিয়াও কথিত হইয়াছে। এইরূপে দেখা যায় যে, ঋগ্বেদের সময়ে দুই জাতি ছিল—শ্বেতকায় বা (আর্য্য), এবং কৃষ্ণকায় (দস্যু অথবা দাস)।

"The Dasyus sre contrasted with the Aryans and are represented as people of dark complexion who were unbelievers, *i e* did not worship the gods of the Aryas and perform the sacrifices, but followed another law. The Aryan gods Indra and Agni are frequently praised for having driven away the black people, destroyed their strongholds and given their possessions to the Aryas." (2)

অর্থাৎ দস্যুদিগকে আর্য্যজাতির সহিত তুলনা করিয়া তাহাদিগকে

(1) "Hinuu Civilization under British Rule." By r. P. N. Bose, B. SC., F. G. S, M. R. A. S. &C., &C.

(2) "Social History of India,"—By Ramkrishna Gopal Bhandarkar, M. A., PH. D. C. I. E.

কৃষ্ণকায় জাতি বলা হইয়াছে। তাহাদিগের ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই অর্থাৎ আর্য্যগণের দেবতাগণকে তাহারা পূজা করিত না এবং তাহারা অন্য শাস্ত্রের বিধান অনুসারে বলিদানক্রিয়া সম্পাদন করিত এইরূপভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। কৃষ্ণকায়দিগকে বিতাড়িত করা, তাহাদের দুর্গ সকল ধ্বংস করিয়া দিয়া আর্য্যদিগকে উহা অধিকার করিয়া দেওয়ার জন্য আর্য্যগণের দেবতা ইন্দ্র এবং অগ্নিকে বহুস্থলে প্রশংসা করা হইয়াছে।

ঋগ্বেদের মন্ত্র পাঠ করিলে দস্যু ও আর্য্য এই দুই শ্রেণীর লোকের সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর্য্যগণ গৌরবর্ণ সুন্দর নাসিকাযুক্ত ও পক্কমাংসভোজী ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই সমুদয় আদিম আর্য্যগণ প্রথম প্রথম প্রধানতঃ কৃষিকার্য্য দ্বারাই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। কৃষিকার্য্য হইতেই কর্ষক ধাত্বর্থমূলক আর্য্য নাম হইয়া থাকিবে। লাঙ্গল শকট প্রভৃতি কৃষিকার্য্যের উপকরণ সমূহের নাম তাঁহাদিগের ভাষায় পাওয়া যায়। (১) শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ, বলেন :—

"প্রকৃতির লীলাভূমি ভারতবর্ষের নগ্ন সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহারা মোহিত হইতেন। সেই সকল অভিনব প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহ তাঁহাদিগের সরল কোমল হৃদয়মধ্যে এমন সুন্দর সুশোভন চিত্রগুলি অঙ্কিত করিত এবং এমন স্বাভাবিক ভাবের সঞ্চার করিত যে, তাহাতেই তাঁহাদিগের 'কবিত্ব শক্তির উন্মেষ' এবং ধর্ম্মপ্রণালী গঠিত হইয়াছিল। চন্দ্র, সূর্য্য

(১) কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় এক মন্ত্রের কতকাংশ প্রদত্ত হইল :—"লাঙ্গলগুলি যোজন কর; যুগগুলি বিস্তারিত কর; এই স্থানে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাতে বীজ বপন কর; আর্য্যদিগের স্তবের সহিত আর্য্যদিগের অন্ন পরিপূর্ণ হউক ও শূনিগুলি নিকটবর্ত্তী পক্ক শস্যে পতিত হউক।"

পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্তের বঙ্গানুবাদ ঋগ্বেদ সংহিতা।

মেঘ, বজ্র, উষা, সন্ধ্যা প্রভৃতি এ সকলেরই তাঁহরা উপাসনা করিতেন। তখন ধর্ম্মভাব নিতান্ত সরল ও অকপট ছিল—তখন পর্য্যন্ত যাগ যজ্ঞাদির আড়ম্বর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল না।

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি সেই আদিম আর্য্যজাতির একদল দক্ষিণ এসিয়া অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। সেই এসিয়া-যাত্রিক-আর্য্যেরা ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। পাঞ্জাবকে তখন সপ্তসিন্ধু বলিত। সপ্তসিন্ধুদেশে আসিয়াও সেই হিন্দু ও ইরানীজাতি এক সঙ্গেই ছিল। কিন্তু কালক্রমে ধর্ম্মাদি বিষয়ে বিবাদ হওয়ায় সেই একই জাতি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। "দেবোপাসক হিন্দুরা পাঞ্জাবে রহিলেন; আর "অসুরোপাসক" ইরানীরা পারস্যে গমন করিলেন। এই দেবোপাসক হিন্দু আর্য্যই বেদে স্রষ্টা।

ঔপনিবেশিক আর্য্য হিন্দুগণ সপ্তসিন্ধু দেশে উপনিবেশ স্থাপনের প্রথম যুগে খর প্রবাহিত সিন্ধু তীরে বাস করিতেন। ক্রমে যতই ঔপনিবেশিক-গণের সংখ্যা অধিক হইতে লাগিল, তাঁহারা ততই নূতন নূতন স্থান অধিকার করিতে লাগিলেন। এইরূপে সিন্ধু এবং তাহার পঞ্চশাখা তীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ আর্য্য হিন্দু কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া গেল। নবীন উৎসাহ, অসীম বিক্রম, অদম্য সাহস, অজেয় বাহুবল ও জাতীয় মুক্ত জীবনের অনুরূপ মুক্ত স্বাধীনচিত্ত হইয়া আর্য্য ঔপনিবেশিকগণ যুদ্ধে মনযোগী হইলেন। হিন্দুর দুর্জ্জয় বাহুবলের নিকট অনার্য্য দস্যুদিগের বিক্রম টিকিতে পারিল না। আর্য্যগণ অনার্য্যদিগের সকল দেশ জয় করিয়া লইলেন। অন্যান্য দস্যুগণ কেহ পলায়ন করিল কেহ বা দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল। (১)

---

(1) "Those who submitted were reduced to slavery and the rest were driven to the fastnesses of mountain."

"Social History of India"—By R G. Bhandarkar, M. A.

আর্য্যদিগের বিজয়পতাকা দেশ হইতে দেশান্তরে উড্ডীন হইতে লাগিল। অনার্য্যগণ পদে পদে বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। যাহারা এই নূতন শত্রুর সম্মুখ হইতে কাননে, প্রান্তরে, দুর্গম গিরিগহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিল, তাহারা স্বাধীনতা বিস্মৃত হইতে পারিল না। দলে দলে আসিয়া আর্য্যদের অধিকৃত গ্রাম, জনপদ প্রভৃতি আক্রমণ করিতে লাগিল। তাঁহাদিগের লাঙ্গল, গো, গোবৎস প্রভৃতি অপহরণ করিতে লাগিল—আর্য্য ঔপনিবেশিকগণ অস্থির হইয়া উঠিলেন। হয়তঃ কখনও অন্ধতমসাচ্ছন্ন গভীররজনীতে একদল অনার্য্য দস্যু আসিয়া নিশ্চিন্ত, সুপ্ত আর্য্যদিগের গৃহাদি লুণ্ঠন করিয়া খাদ্যাদি যাহা পাইত লইয়া পলায়ন করিত।

যে সকল বীরগণ পঞ্চনদস্থ সমস্ত প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা সরস্বতী শতদ্রুর শ্যামলতীরে শান্তভাবে বসিয়া থাকিবার লোক নহেন। ভারতভূমির আদিম নিবাসীদিগের সহিত নিরন্তর অবিশ্রান্ত যুদ্ধ কলহ করিয়াও আর্য্যগণ ত্রিহুত পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মর্ষি (গাঙ্গ্য) প্রদেশ অধিকার করিয়া ফেলিলেন। যখন গাঙ্গ্য প্রদেশে অধিনিবেশের সূত্রপাত দেখা গেল, তখনই নানাস্থান হইতে দলে দলে আর্য্যগণ আসিয়া দোয়ার প্রদেশে বসতি করিতে লাগিলেন।

আর্য্যদিগের মধ্যে তখন পর্য্যন্ত কোন প্রকার জাতিবিচার ছিল না। কিন্তু 'আর্য্য' ও 'অনার্য্যের' মধ্যে যে প্রভেদ, 'আর্য্য'র ও 'দস্যু'র মধ্যে যে পার্থক্য তাহা তখন ছিল—'কৃষ্ণ' এবং 'গৌরের' ভিতর যে প্রভেদ তাহাও তখন ছিল।" (১)

"In the very early times the system of castes did

(১) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ, লিখিত "জাতিভেদ" প্রবন্ধ হিন্দু পত্রিকা—১ম বর্ষ—তৃতীয় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩০৯

not prevail, and it seems to have developed about the end of the Vedic period." (1)

অতি প্রাচীনকালে জাতিভেদ প্রথা ছিল না এবং এইরূপ অনুমান হয় যে, বৈদিক যুগের শেষ সময়ে ইহা গড়িয়া উঠিয়া প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়।

শ্রীযুক্ত আচার্য্য মহাশয় পুনরায় বলিতেছেন :—"কৃষি, যাজন, যুদ্ধাদি জীবিকাভেদজনক বর্ণ বিচার বংশানুক্রমে পুরোহিত বা রাজার প্রথা তখন ছিল না। শ্যামলশস্যভরা প্রভৃত ক্ষেত্রের অধিস্বামী যেমন স্বহস্তে ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেন, আবার তেমনি বাহুবলে স্বগ্রাম আত্মজীবন ও অর্থ প্রভৃতি রক্ষাও করিতেন। যুদ্ধান্তে গৃহে ফিরিয়া তাঁহাই আবার সুন্দর ভাষায় মন্ত্র রচনা করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসনা করিতেন। তখন দেবমূর্ত্তিও ছিল না, দেবগৃহও ছিল না, পূজা বিধির নানাবিধ আড়ম্বরও ছিল না।"

ঋগ্বেদ ও জাতিভেদ।—"জগতের সমুদয় গ্রন্থের মধ্যে আদি গ্রন্থ বেদ—ঋগ্বেদ তন্মধ্যে আদিতম। এই ঋগ্বেদ সম্বন্ধে এই দুইটী কথা বলা আবশ্যক। এই ঋগ্বেদ কতকগুলি মন্ত্রের সমষ্টি। এই সকল মন্ত্রের অধিকাংশ এমন এমন সময়ে রচিত হইয়াছিল, যখন বর্ণ মালার সৃষ্টি হয় নাই এবং লিখিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তখন ঐ সকল মন্ত্র মুখে মুখে রচিত হইয়া মুখে মুখে শেখা হইত এবং মুখে মুখে বিচরণ করিত। লোকে ইহার মুখে, উহার মুখে, তাহার মুখে মন্ত্র গুলি সর্ব্বদা শুনিত, কিন্তু কেহ কখনও তাহা লিখিত দেখে নাই। এই জন্য ঐ সকলের নাম শ্রুতি হইয়াছিল। তৎপরে বর্ণমালার সৃষ্টির পরে সময়ে

(1) Dr. R. G. Bhandarkar, Ph. D, on "Social Reform and the Programme of the Madras Hindu Social Reform Association."

সময়ে এক একজন পণ্ডিত উদ্যোগী হইয়া স্মৃতি হইতে ও লোক মুখ হইতে সংগ্রহ পূর্ব্বক বর্ণিত বিষয়ানুসারে তাহাদিগকে মণ্ডল, অধ্যায়, সূক্ত প্রভৃতিতে বিভাগ করিয়া গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল পণ্ডিত বেদব্যাস নামে উক্ত হইয়াছেন। এই ঋগ্বেদের কোন একটী সূক্ত পাঠ করিতে গেলেই দেখিতে পাইবেন যে, সর্ব্বাগ্রেই অমুক্ দেবতা, অমুক ঋষি, অমুক্ ছন্দ প্রভৃতি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ইহার তাৎপর্য্য এই, সংগ্রহ কর্ত্তা সংগ্রহ করিবার সময় যে ঋষিকে যে মন্ত্রের রচয়িতা বলিয়া শুনিয়াছেন সেই মন্ত্রের অগ্রে সেই নাম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

ঋগ্বেদের সূক্ত সংখ্যা মোট ১০২৮। "যে সূক্তের মধ্যে জাতিভেদের উৎপত্তির কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম পুরুষ সূক্ত। এই সূক্তটীতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, দেবগণ এক আশ্চর্য্য প্রকৃতি-সম্পন্নপুরুষকে যজ্ঞে বলি দিয়াছিলেন। সেই পুরুষের দেহ হইতে সৃষ্টির তাবৎ পদার্থ উৎপন্ন হইল। নানা প্রকার পদার্থের সৃষ্টি বর্ণনা করিয়া অবশেষে বলিতেছেন—

তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়ত। তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদাতঃ। গাবোহজজ্ঞিরে তস্মাজ্জাতা অজাবয়। * * * * "ব্রাহ্মণোস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।

অর্থ—"সেই সর্ব্বহুত যজ্ঞ হইতে ঋক সকল ও সাম সকল জন্ম গ্রহণ করিল। তাহা হইতে ছন্দ অর্থাৎ বেদ সকল ও যজুর্ব্বেদ উৎপন্ন হইল। তাহা হইতে অশ্ব সকল ও দুইপাটী দন্ত বিশিষ্ট অপর সকল প্রাণী এবং গো মেষ অজা প্রভৃতি উৎপন্ন হইল। * * * * *

* * * ইহাঁর মুখই ব্রাহ্মণ হইল, বাহুদ্বয় ক্ষত্রিয় রূপে পরিণত

হইল; বৈশ্য যাহা দেখিতেছ, ইহাই তাহার উরু এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল।" (১)

৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন,—"ঋগ্বেদের রচনা কালের অনেক পরে এই অংশ রচিত হইয়া ঋগ্বেদের ভিতর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদের অন্য কোন অংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতির উল্লেখ নাই। ব্যাকরণবিদ্ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই ঋকের ভাষাও আধুনিক সংস্কৃত। উক্ত সূক্তটীর ভাষা দেখিলেই মনে হয়, উহা আধুনিক সংস্কৃতের মত। ঋগ্বেদের অন্যান্য মন্ত্রগুলির ভাষা আধুনিক সংস্কৃতের মত নহে। তাহা অতিশয় কঠোর এবং তাহার ব্যাকরণও স্বতন্ত্র; শুধু ব্যাকরণ বিভিন্ন নহে, ছন্দও আবার অন্যরূপ।" এল্‌ফিনষ্টোন সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনার স্থানে লিখিত হইয়াছে,—"There can be little doubt, for instance, that the 90th hymn of the 10th Book is modern both in its character and its diction." অন্যত্রও দেখিতে পাওয়া যায় "European critics are able to show that even this verse is of latter origin than the great mass of the hymns and that it contains modern words such as Sudra and Rajanya, which are not found again in the other hymns of the Rig-Veda. (Vide chips from a German workshop Vol. II) ফলতঃ মন্বাদিসংহিতাকারদিগের অভ্যুত্থানের এবং মহাভারতাদি লিখিত হইবার বহুপূর্ব্বে এই সূক্ত রচিত হইয়াছিল, মহাভারত প্রভৃতিতে এবং মন্বাদি গ্রন্থে এই সূক্তের ছায়া পরিলক্ষিত হয়।

লোকানান্ত বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ। মনু ১।১৩

(১) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ, প্রণীত বক্তৃতা "জাতিভেদ"।

অর্থাৎ "পৃথিব্যাদি লোক সকলের সমৃদ্ধি কামনায় পরমেশ্বর আপনার মুখ বাহু উরু ও পদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণ সৃষ্টি করিলেন। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ইহার ছায়া এইরূপ ভাবে পড়িয়াছে।

পুরুরবা উবাচ। কুতশ্চিৎ ব্রাহ্মণো জাতো, বর্ণাশ্চাপি কুতস্ত্রয়ঃ।
কস্মাচ্চ ভবতি শ্রেষ্ঠস্তন্মে ব্যাখ্যাতু মর্হসি।

মাতরিশ্বোবাচ। ব্রাহ্মণোমুখতঃ সৃষ্টো ব্রহ্মণো রাজসত্তম।
বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ সৃষ্ট উরুভ্যাং বৈশ্য এব চ।
বর্ণানাং পরিচর্য্যার্থং ত্রয়াণাং ভরতর্ষভ,
বর্ণশ্চতুর্থঃ সম্ভূতঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো বিনির্ম্মিতঃ।

অতঃপর আমরা জন্মগত জাতিভেদের সমর্থনসূচক তাবদীয় শ্লোক প্রদর্শন করিয়া পরে তাহার যথাযথ বিচারে প্রবৃত্ত হইব। জাতিভেদ জন্মগত সম্বন্ধে, শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে আছে,—বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বমূর্ত্তি সহস্রশিরা পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় তাঁহার ভূজ, বৈশ্য তাঁহার উরু এবং কৃষ্ণবর্ণ শূদ্র তাঁহার পদ। পুনশ্চ একাদশ স্কন্ধে—সপ্তদশ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকেও আছে,—

বিপ্র ক্ষত্রিয়-বিটশূদ্র মুখবাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষজ্জাতা য আত্মচার লক্ষণাঃ।
(শ্রীমদ্ভগবত ১১।১৭।১১)

বিষ্ণুপুরাণে প্রথম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ;—

ব্রাহ্মণা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম।
পাদোরু বক্ষঃস্থলতো মুখতশ্চ সমুদগতা॥
যজ্ঞনিষ্পত্তয়ে সর্ব্বমেতদ্‌ব্রহ্মা চকার বৈ।
চতুর্ব্বর্ণাং মহাভাগং যজ্ঞসাধনমুত্তমম্ ; (বিষ্ণুপুরাণ ১।৬)

পুরাণান্তরেও আছে,—মুখতো ব্রাহ্মণো যজ্ঞে বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়ো বিরাট্।
উরুভ্যামুদ্ভূতে বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোব্যজায়ত॥

মন্বাদি-সংহিতা শাস্ত্র ও পুরাণাদিতে যে বহুবিধ জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় সে সমস্তই জন্মগত রূপে সমাজের উচ্চ-নীচ স্তরে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ত গেল জাতিভেদ সম্বন্ধে শাস্ত্রের দোহাই বা অনুকূল মত। এখন আমরা ইহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। ঋগ্বেদে বর্ণ বিচার সম্বন্ধে স্থূলতঃ কিছু বলা হইয়াছে; কিন্তু বর্ত্তমান বিষয়টির বিশদ আলোচনা আবশ্যক। আমরা ইতঃপূর্ব্বেই একবার বলিয়াছি যে, ঋগ্বেদের কেবলমাত্র একটী সূক্তের একটী ঋকে জাতিভেদ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আছে, আলোচ্য সূক্তে বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরকে পুরুষ কল্পনায় যজ্ঞীয় পশুর স্বরূপ যজ্ঞীয় বহ্নিতে পূজা দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়।

যৎপুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ।
তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা শ্চ ঋষয়শ্চযে।

অর্থাৎ যখন পুরুষকে হব্যরূপে গ্রহণ করিয়া দেবতারা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, তখন বসন্ত ঘৃত হইল, গ্রীষ্ম কাষ্ঠ হইল, শরৎ হব্য হইল।

যিনি সকলের অগ্রে জন্মিয়াছিলেন, সেই পুরুষকে যজ্ঞীয় পশুরূপে সেই বহ্নিতে পূজা দেওয়া হইল। দেবতারা, সাধ্যবর্গ এবং ঋষিগণ উহা দ্বারা যজ্ঞ করিলেন। এইরূপে সেই পুরুষকে যজ্ঞীয় পশু কল্পনা করিয়া যে বলি দেওয়ার কথা আছে, সেই সূত্রে ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তের বর্ণ-ভেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা অনুবাদ সহ সেই স্থানটী উদ্ধৃত করিতেছি।

যৎপুরুষং বদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্
মুখং কিমস্য কৌ বাহু কা উরু পাদা উচ্যেতে।

অর্থাৎ পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হইল, কয়েক খণ্ড করা হইয়াছিল। উহার মুখ কি হইল, দুই হস্ত দুই উরু দুই চরণ কি হইল।

উত্তরস্বরূপ বলা হইতেছে,—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥

(ঋগ্বেদ ১২।১০।১৯)

ইহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুই বাহু রাজন্য হইল, যাহা উরু ছিল, তাহা বৈশ্য হইল, দুই চরণ হইতে শূদ্র হইল।

ইহাই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বা জাতিভেদের মূল ভিত্তি। এই কথার উপরই প্রাচীন সমাজের জাতিভেদ নির্ভর করে। এখন এই সূক্তের আলোচনা করা যাউক। বলা বাহুল্য এই একটীমাত্র সূক্ত অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী সংহিতা ও পুরাণকারগণ তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে শ্লোক রচনা ও জাতিভেদ সমর্থন করিয়াছেন। এই বিরাট পুরুষের বলি সম্বন্ধে রমেশ বাবু বলেন,—"বিশ্বনিয়ন্তাকে বলিস্বরূপ অর্পণ করা অনুভবটী ঋগ্বেদের আর কোথাও ইহা পাওয়া যায় না। ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের অনুভব।" মুয়ার সাহেবও বলেন—It was evidently produced at a period when the ceremonial of sacrifice was largely developed...........penetrated with a sense of the sanctity and efficacy of the rites, the priestly poet to whom we owe this hymn has thought it no profanity to represent the supreme Purush himself as forming the Victim." (Muir's Sanskrit Texts—Vol—V.)

অর্থাৎ বলিপ্রথা অতিশয় বিস্তৃতি লাভ করিলেই বর্ত্তমান কল্পনা সম্ভব

হয়, নতুবা নহে। এই বলি প্রথার আনুসঙ্গিক ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে যাহার সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা আছে, যিনি এই প্রথার পবিত্রতা এবং সফলতা বিশ্বাস করিয়া থাকেন, শুধু সেইরূপ পুরোহিত কবিই কল্পনা করিতে পারেন যে, পরমপুরুষ পরমেশ্বরকেও বলি দেওয়া যাইতে পারে। অন্যের পক্ষে এরূপ কল্পনা ধর্ম্মবিগর্হিত।

ঋগ্বেদ আর্য্য-জাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ ও সমগ্র জগতের আদি পুস্তক। এই আদি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই পরবর্ত্তী লেখকগণ অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; সুতরাং আমাদের আলোচ্য বিষয় "জাতিভেদ" সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে সর্ব্বপ্রথম এই ঋগ্বেদ অনুসন্ধান করাই বিধেয়। ৺রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন,—কি প্রকারে মানব-হৃদয়ে প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির নিয়ন্তা ঈশ্বরের জ্ঞান জন্মে ঋগ্বেদ তাহার প্রমাণ স্বরূপ। আর্য্যেরা পৃথিবীর নানাস্থানে যে সভ্যতা লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যাহা প্রাচীনতম ঋগ্বেদে তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। ঋগ্বেদে আধুনিক হিন্দু ধর্ম্মের উৎপত্তির ব্যাখ্যা রহিয়াছে, অতি প্রাচীনকাল হইতে অধুনাতন সময় পর্য্যন্ত হিন্দু জাতির মানসিক ভাবের বৃত্তান্ত ঋগ্বেদ না পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় না। কেবল আধ্যাত্মিক কেন ঋগ্বেদ পাঠে ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিষয়ও অনেক জানিতে পারা যায়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সেই প্রাচীনতম আর্য্য হিন্দু-সমাজের অবস্থা জানিবার জন্য ঋগ্বেদই একমাত্র পথ। জাতিভেদ প্রভৃতি সামাজিক বিষয়ের অস্তিত্ব ঋগ্বেদ হইতেই প্রামাণ্য। ঋগ্বেদে তাৎকালিক সমাজের সকল কথাই বিশেষ ভাবে লিখিত রহিয়াছে। কেমন করিয়া ক্ষেত্রে লাঙ্গল দেওয়া হইত, কেমন করিয়া সোমরস প্রস্তুত হইত, কি উপায়ে যবাদি পেষণ কার্য্য সম্পন্ন হইত প্রভৃতি প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনুটি পর্য্যন্ত যে ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়—জাতিভেদের কথাও নিশ্চয়ই সেই স্থানে থাকিবে কিন্তু ঋগ্বেদের

১০২ এবং ঋকসংখ্যা ১০৪০২ অথবা ১০৪২২ সেই ঋগ্বেদে জাতিভেদ সম্বন্ধে মাত্র একটী ঋকে অতি সামান্য কয়েকটী কথা লিখিত রহিয়াছে।" (১)

"পাঁচ কি ছয় শত বৎসর ব্যাপিয়া এই মহাগ্রন্থ ঋগ্বেদের প্রণয়ন কার্য্য চলিয়াছিল। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহাতে আর্য্যদিগের আচার, নীতি, ব্যবহার বিশ্বাস প্রভৃতির ভূরি ভূরি বর্ণনা আছে। আর্য্যদিগের গার্হস্থ্য নীতি, স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা, বিবাহ পদ্ধতি যজ্ঞাদি ধর্ম্মাচার, জ্যোতিষ, আর্য্যদিগের শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, দস্যুদিগের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি সমস্তই বিশেষরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। কিন্তু এই জাতিভেদের কথাই তেমন ভাবে লিখিত হয় নাই। ইহাও কি সম্ভব? এই স্থলে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে! তিনি বলিতেছেন,— "পরবর্ত্তী সংস্কৃত ভাষায় যে বর্ণ শব্দ জন্মগত জাতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা ঋগ্বেদে আর্য্য ও অনার্য্যের (গৌর ও কৃষ্ণের) বিভিন্ন শারীরিক বর্ণ (রং) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।" (২)

ভাষা ও শব্দ শাস্ত্রদ্বারা বিভিন্ন জাতির সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। এই ভাষার সাহায্যেই ইউরোপীয় সভ্য জাতিগণের সহিত আর্য্য জাতির সম্বন্ধ অনুমিত হইতেছে। ঋগ্বেদের অন্যান্য শ্লোকের ভাষা ও প্রকৃতির সহিত তুলনা করিলে এই সাধারণ ছন্দের শ্লোকটীকে অনায়াসেই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রাচীন যুগে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ শব্দই এখন অপ্রচলিত। নিম্নে ঋগ্বেদের একটী মন্ত্র উদ্ধৃত হইল। যাঁহারা শুধু আধুনিক সংস্কৃতে অভিজ্ঞ, তাঁহারা যে

(১) ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্ত দ্রষ্টব্য।

(২) শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ লিখিত "জাতিভেদ" প্রবন্ধ।

টীকাকারের সাহায্য ব্যতীত উক্ত মন্ত্রটীর অর্থ গ্রহণে সম্যক্ কৃতকার্য্য হইবেন, এরূপ মনে হয় না।

মন্ত্রটী এই,—

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং।

হোতারং রত্নধাতমম্"। (ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তের সর্ব্বপ্রথম ঋক)

বিশেষতঃ ঋগ্বেদ প্রণেতা যে একজন নহেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। 'আমরা মৎস্য পুরাণেও ৯১ জন বৈদিক ঋষির নামোল্লেখ দেখিতে পাই। ইঁহারাই ঋকসমূহ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।' (মৎস্যপুরাণ ১৩২ অধ্যায়)

ঋগ্বেদের মন্ত্র দশমণ্ডলে বিভক্ত। প্রথম ও দশম মণ্ডল ভিন্ন অপর আট মণ্ডল ৮ জন ঋষির রচিত। একজন ঋষি বলিতে বোধ হয় সেই ঋষির বংশীয় ব্যক্তি অথবা তদনুসারী শিষ্য পরম্পরা বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রণেতা গৃৎসমিৎ। এই গৃৎসমিৎ ও শৌনক একই ব্যক্তি বলিয়া প্রবাদ আছে। তৃতীয় মণ্ডলের প্রণেতা বিশ্বামিত্র, চতুর্থ মণ্ডলের প্রণেতা বামদেব, পঞ্চম মণ্ডলের প্রণেতা অত্রি, ষষ্ঠ মণ্ডলের প্রণেতা ভরদ্বাজ, সপ্তম মণ্ডলের প্রণেতা বশিষ্ঠ, অষ্টম মণ্ডলের প্রণেতা অঙ্গিরা। প্রথম মণ্ডলে ১৯১ সূক্ত, দশম মণ্ডলেও ১৯১ সূক্ত। তাহা নানা ঋষির প্রণীত বলিয়া কথিত আছে (১)! যাঁহারাই ঋগ্বেদ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়া থাকিবেন যে, ইহার দশম মণ্ডল অন্যান্য নয় মণ্ডল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ইহা যেন সেই মহাগ্রন্থের পরিশিষ্ট মাত্র। এই দশম মণ্ডলের অধিকাংশ সূক্তই অপ্রাচীন। এই সূক্ত হইতে তাৎকালিক সমাজে স্বাধীন চিন্তা শক্তির বিকাশ সামাজিক উন্নতি, সমাজান্তর্গত নানাবিধ জটিল অবস্থা প্রভৃতির সমূহ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া

---

(১) পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই।

যায়। বিবাহ প্রভৃতির বর্ণনা ও মন্ত্র এবং পরলোকের বর্ণনা এই দশম মণ্ডলের অন্যতম অংশ।" (১)। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সম্বন্ধে ৺রমেশ বাবু বলিয়াছেন,—"আবার দশম মণ্ডলের অনেক মন্ত্রের প্রণেতা স্ব স্ব নাম গুপ্ত রাখিয়া মন্ত্রগুলি দেবতার নামে প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। দেবতাদিগের রচিত বলিলে এই সকল মন্ত্র প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়া যাইবে, বোধ হয় এইরূপ অভিপ্রায়। অন্য এক স্থানে তিনি বলিতেছেন,—"যে সময় মন্ত্রগুলি মণ্ডলাদিতে বিভক্ত হইয়া সংগৃহীত হয়, সেই সময় দশম মণ্ডলের অধিকাংশ মন্ত্র রচিত হইয়া থাকিবে। সেই সময়ই তাহা সঙ্কলিত ও ঋগ্বেদের শেষভাগে সংযুক্ত হইয়া যায়।"

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বলেন,—"বর্ত্তমান যুগের ন্যায় বৈদিক যুগে সাহিত্য-চর্চ্চা এত বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিয়াছিল না। ঋষিদের সময়ে বর্ণমালার সৃষ্টি হয় নাই। তাই লিখন প্রণালী তখন ছিল না। আর্য্যগণ লীলাময়ী প্রকৃতির সুন্দর সুন্দর বিচিত্র দৃশ্য সকল দর্শন করিয়া আপন আপন সরল হৃদয়ের সাময়িক ভাবানুযায়ী গীত রচনা করিতেন, মন্ত্র রচনা করিতেন কখনও বা সামাজিক অভাব অভিযোগ, রীতিনীতি সম্বন্ধেও শ্লোকাবলী রচিত হইত, আর সেই সকল গীত বা মন্ত্র বা শ্লোক আবহমান কাল পর্য্যন্ত শ্রবণ মাত্রেই আবদ্ধ ছিল, পিতার নিকট পুত্র তাহা শিক্ষা করিত, গুরুর নিকট শিষ্য তাহা শিক্ষা করিত। এই সকল হইতে বেশ অনুমিত হইতে পারে যে, ঋগ্বেদের মত একখানি অতিশয় প্রাচীন গ্রন্থ—যে গ্রন্থের রচয়িতা ভিন্ন ভিন্ন এবং সংগ্রহকর্ত্তাও তাহাই, যে গ্রন্থ প্রণয়নে প্রায় ছয় শতাব্দী কাল ব্যয়িত হইয়া থাকিবে, যে গ্রন্থের শ্লোকগুলি সর্ব্বপ্রথমে কেবল মাত্র শুনিয়াই শিখিয়া রাখিতে হইত, কারণ লিখিত ভাষা বা অক্ষরের সৃষ্টি তখনও হইয়াছিল না, সেই প্রচীন গ্রন্থ

(১) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ, লিখিত "জাতিভেদ"।

ঋগ্বেদের অনেক শ্লোক সংগ্রহকারক কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। এরূপ হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং প্রথম যুগের পরবর্ত্তী যুগ সমূহে অনেকে হয়ত একেবারে মৌলিক শ্লোকগুলি শিক্ষা করিবার আদৌ সুযোগ পান নাই। তাহার পর যিনি যখন যে শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন (এখনও আমরা অনেক পুস্তকের পাঠান্তর গ্রহণ করিয়া থাকি) এবং যিনি যখন যে নূতন শ্লোক রচনা করিয়া, তাহা সেই ঋগ্বেদেরযুগের প্রাচীন আর্য্যদিগের রচিত শ্লোক বলিয়া ঋগ্বেদের কলেবরে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, সেই নব রচিত শ্লোক সমূহে নিশ্চয়ই তাৎকালিক অভাব অভিযোগ এবং সামাজিক চিত্রের ছায়া থাকিবেই থাকিবে। কারণ সমাজ মানব-হৃদয় গঠন করে, আর ভাষা ও ভাব সেই হৃদয়ের অধিকৃত চিত্র। আর এক কথা, ঋগ্বেদ প্রণয়নের যুগে আর্য্যভূমে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য বিস্তার করিবার একটী বিশাল তরঙ্গ রঙ্গে-ভঙ্গে উত্তোলিত হইয়া গ্রামে গ্রামে, জনপদ জনপদে বাত্যাসংক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। ব্রাহ্মণ প্রাধান্য স্থাপয়িতৃগণের যত্নে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অনেকগুলি সূক্ত প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ভট্টমোক্ষমূলের, মিঃ ওয়েবর, মিঃ কোলব্রুক, ৺মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে তিলমাত্রও সন্দেহ করেন না। রমেশ বাবু ও মুয়ার সাহেবের মত ইতিপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। শুধু ঋগ্বেদ বলিয়া নহে, হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের অভাব নাই। অধুনা রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থেও প্রক্ষিপ্ত শ্লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে! হিন্দু শাস্ত্রে এত ভূরি ভূরি শ্লোক স্থান পাইয়াছে, যাহা আলোচনা বা লিপিবদ্ধ করিতে গেলে একখানা পুস্তক রচিত হইতে পারে। এসব বহু শ্লোক বহু শাস্ত্র গ্রন্থে আছে, যাহার মধ্যে পরস্পর ঐক্য নাই এবং ভীষণ সামঞ্জস্য বিরহিত। এ সম্বন্ধে আমরা গ্রন্থান্তরে আমাদের বক্তব্য আলোচনা করিতে ইচ্ছুক রহিলাম।

উল্লিখিত আলোচনায় দেখা যাইতেছে যে, বর্ণভেদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে

যাঁহারা ঋগ্বেদের দোহাই দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সে নজীরের মূল্য কিছুই নাই। আমরা অনায়াসে সে নজীর অবহেলা করিতে পারি। এলফিনষ্টোন সাহেব তাঁহার ভারত ইতিহাসে বলেন,—"In the Rigveda the caste system of latter times is wholly unknown" (Apendix VIII page 286), অর্থাৎ আধুনিক কালের জাতিভেদ প্রথা ঋগ্বেদের সময় সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিল।

ফলতঃ "সৃষ্টির আদিম কালে বা সত্যযুগে লোকের রূপ গুণ পরমায়ু ও চেষ্টা এক ছিল কেহই বুদ্ধি খাটাইয়া কিছু করিতে পারিতেন না। সকলেই যদৃচ্ছা লব্ধ ফল মূল ও আম মাংসাদি খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। পাপ পুণ্য কার্য্য কাহাকে বলে তাহা তাঁহারা জানিতেন না। তখন বর্ণ বা জাতি বা বর্ণ সঙ্করের কথাও অজ্ঞাত ছিল। কেহ ইচ্ছা বা সঙ্কল্প করিয়া কোন কার্য্য করিতেন না। পরস্পরের মধ্যে হিংসা দ্বেষও ছিল না। সকলেরই রূপও ভেদাভেদ ছিল না। পরে ত্রেতাযুগে বা পরবর্ত্তী সময়ে গুণ কর্ম্মের বিভেদ বশতঃ চাতুর্ব্বর্ণং প্রতিষ্ঠাপিত হয়।" * শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—"সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা প্রথমে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত, ক্রতু, প্রচেতা, ভৃগু, বশিষ্ট, নারদ এই দশ প্রজাপতি সৃষ্টি করেন। এই দশ প্রজাপতি হইতেই পরে ক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণের উৎপত্তি। ফলকথা জন্মতঃ কেহই বড় ছোট হয় নাই। গুণ ও কর্ম্ম দ্বারাই বড় ছোট বলিয়া মনে করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

---

* বায়ু পুরাণ, ৮ম অধ্যায়।

—o—

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রাচীন আর্য্যদিগের গুণকর্ম্মগত জাতিভেদ।

এক্ষণে আমরা প্রাচীন আর্য্যদিগের যে জাতিগত কোন পার্থক্য ছিল না—তাহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব। শাস্ত্রকারগণ এবিষয়ে আমাদিগকে কতটুকু সাহায্য করিতে পারেন—সর্ব্বপ্রথমে তাহাই প্রদর্শন করিব। বর্ত্তমান বিষয়ে আমরা দেখাইব—আর্য্যগণ কত উদার ভাব পোষণ করিয়া গিয়াছেন,—তাঁহাদের অন্তঃকরণে ভ্রমেও বৈষম্য স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। যাহার যাহাতে অধিকার, তাহাকে তাহা হইতে বিন্দুমাত্র বঞ্চিত করা হয় নাই। পঞ্চমবেদ মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ১৮৮ অধ্যায়ে ভৃগু ভরদ্বাজ সংবাদে বর্ণভেদের আলোচনা আছে—আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

ভৃগুরুবাচ—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ
ব্রহ্মণা পূর্ব্বস্থষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্॥
কাম ভোগ প্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয় সাহসাঃ।
ত্যক্ত স্বধর্ম্মারক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধা সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচ পরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্বস্তা দ্বিজাবর্ণন্তরং গতাঃ
ধর্ম্মো যজ্ঞঃ ক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে॥

ইহার অর্থ এই যে,—ভৃগু কহিলেন, তপোধন! ইহলোকে বস্তুতঃ বর্ণের ইতর বিশেষ নাই। সমুদয় জগতই ব্রহ্মময়, মনুষ্যগণ পূর্ব্বে ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইয়া—ক্রমে ক্রমে কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছেন অথবা সমস্ত জগতে এক ব্রাহ্মণ মাত্র ব্রহ্মা কর্তৃক পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছিলেন, তৎপরে কর্ম্মের বিভিন্নতা বশতঃ বর্ণের বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে ব্রাহ্মণগণ রজোগুণ প্রভাবে কামভোগে প্রিয় ক্রোধপরতন্ত্র, রক্তবর্ণ সাহসী ও হঠকারী হইয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব ও যে ব্রাহ্মণগণ গোপালন বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা বৈশ্যত্ব এবং যাঁহারা তমোগুণ-প্রভাবে হিংসাপরতন্ত্র, লুব্ধ, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী কৃষ্ণবর্ণ মিথ্যাবাদী ও শৌচভ্রষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন তাঁহারাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।" ব্রাহ্মণগণ এইরূপ কার্য্যের দ্বারাই পৃথক্ পৃথক্ বর্ণলাভ করিয়াছেন।"

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন,—"জাতিভেদ সমস্যার একমাত্র যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা ভারতেই পাওয়া যায়। মহাভারতে লিখিত আছে, সত্যযুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি ছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন। ইহাই জাতিভেদ সমস্যার সত্য ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা।" (১)

সুতরাং ইহার দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে পূর্ব্বে এক বর্ণ ছিল কিন্তু কার্য্যের বিভিন্নতা হেতু ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ সৃষ্টি হইয়াছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বলিয়াছেনঃ—

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্রে আসীৎ একমেব, তদেকং সৎ নব্যভবৎ।
তচ্ছ্রেয়ো রূপং অত্যসৃজত ক্ষত্রং"।

(১) ভারতে বিবেকানন্দ, ১১৩ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ "অগ্রে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিল। ঐ জাতি একাকী বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইল না, সুতরাং সেই শ্রেষ্ঠবর্ণ (ব্রাহ্মণ) ক্ষত্রকে সৃষ্টি করিলেন।" এস্থলে একটা কথা বলা আবশ্যক—ব্রহ্ম শব্দের অর্থ লইয়া একটু গোলযোগ হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক বেদ ও স্মৃতি পাঠকই জানেন যে, ব্রাহ্মণ অর্থে ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ অনেক স্থলেই আছে। যিনি ব্রহ্মকে জানেন বা ধারণ করেন, তিনি ব্রাহ্মণ—ইহাই ব্রাহ্মণ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ব্রহ্ম শব্দের অনেক অর্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে; যথা—ঈশ্বর, ব্রাহ্মণ জাতি, বেদমন্ত্র, দেব, তপঃ, ব্রহ্মতেজ, বেদমন্ত্র যাঁহারা ধারণ করেন তাঁহারা। 'ভূমণ্ডলে মানব সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রথমে ব্রাহ্মণগণ সৃষ্ট হইয়াছিলেন। পরে কার্য্য প্রভাবে সেই ব্রাহ্মণগণই অন্য বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।'

যথা,—

বাক্য সংযমকালে হি তস্য বরপ্রদস্য দেবদেবস্য ব্রাহ্মণাঃ।
প্রথমং প্রাদুর্ভূতা ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ শেষবর্ণাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ॥
(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ৩৪২ অধ্যায় ২১ শ্লোক)

"সর্ব্বকর্ত্তা লোকের হিতকারী বরপ্রদ ব্রাহ্মণগণ, নারায়ণের বাক্য সংযমকালে, মুখ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ হইতে অন্যান্য সমুদয় বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে।"

সসর্জ্জ ব্রাহ্মণানগ্রে সৃষ্ট্যাদৌ চ চতুর্ম্মুখঃ।
সর্ব্ববর্ণাঃ পৃথক পশ্চাৎ তেষাং বংশেষু জজ্ঞিরে॥
(উৎকলখণ্ড, ৩৮ অ, ৪৪ শ্লোক)

"ব্রহ্মা, সৃষ্টির প্রারম্ভে অগ্রে ব্রাহ্মণগণকেই সৃজন করিয়াছিলেন। তৎপরে পৃথক্ পৃথক্ সমস্ত বর্ণ তাঁহাদিগেরই বংশে উৎপন্ন হইয়াছে।"

অপিচ—

তস্মাৎ বর্ণাঋজবো জ্ঞাতিবর্ণাঃ সংসৃজ্যতে তস্য বিকার এব।
এবং সাম যজুরেকমৃগেকা বিপ্রশ্চৈকো নিশ্চয়ে তেষু স্পৃষ্টঃ॥
(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৬০ অধ্যায়, ৪৭ শ্লোক)

"যখন ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তখন ঐ তিন বর্ণ, ব্রাহ্মণের জ্ঞাতিস্বরূপ। তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইলে ঋক্, যজু ও সামবেদের প্রচার নিমিত্ত, প্রথমে ব্রাহ্মণেরই সৃষ্টি হইয়াছে।"

গুণকর্ম্মগত জাতিভেদ সম্বন্ধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় তাঁহার "সমাজ সংস্কার" নামক পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন—সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে উহা অবিকল উদ্ধৃত হইল।

তিনি বলিতেছেন :—

"* * * * * এ সময়ে মানবের প্রকৃত জাতিত্ব বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক ও অসাময়িক নহে। এ বিষয়ে ভারতের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বজনোপজীব্য শাস্ত্রকার ভগবান্ মনু ও মহর্ষি বেদব্যাসের উক্তি আলোচিত হইলেই যথেষ্ট হইবে। মহাভারতের ও মন্বাদি শাস্ত্রের নানা স্থানে এ বিষয় সংক্ষেপে এবং বিস্তারে কথিত হইয়াছে। মূল কথা—প্রকৃত জাতিত্ব জন্মাধীন নহে, উহা সংস্কারাধীন।—"সংস্কারৈর্দ্বিজউচ্যতে"। সংস্কার অর্থাৎ সদ্‌গুরুসঙ্গজনিত, লোকপাবন সদাচার লাভ করিয়াই মানব দ্বিজত্ব লাভ করে। যেমন মলিন অঙ্গার অগ্নিসংযোগে অগ্নি হইয়া যায়। পতিতপাবনী ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে উচ্চ পদবী লাভ করা বিচিত্র নহে। এই ব্রহ্মবিদ্যাজনিত শ্রেষ্ঠজাতিত্বই অজর ও অমর। * * *

এই জাতিতত্ত্বের মীমাংসা সর্ব্বোপজীব্য মহাভারতাদি গ্রন্থের নানাস্থানে

প্রসঙ্গক্রমে নিরূপিত হইয়াছে। সে মীমাংসা সর্ব্বত্রই অভিন্ন। মহাভারতের বনপর্ব্ব, অজগর পর্ব্ব হইতে সংক্ষেপে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে; —পঞ্চপাণ্ডবের বনবাসকালে, একদা ভীমসেন একাকী ফলাদি সংগ্রহে বহির্গত হইয়া এক মহাকায় ভুজঙ্গ দর্শন করিলেন। ভূজঙ্গ ভীমকে ভোগবেষ্টনে বদ্ধ করায়, ভীম, নাগাযুতবলশালী হইয়াও স্পন্দনহীন হইলেন। তখন সেই মহানাগ ভীমকে কহিলেন,—"আমি সামান্য নাগ নহি। আমি পূর্ব্বজন্মে মহারাজ নহুষ ছিলাম। পুণ্যবলে স্বর্গের অধীশ্বর হইয়াছিলাম। তথায় ঐশ্বর্য্যমদে ব্রহ্মর্ষি অগস্ত্যের অপমান করায়, তদীয় শাপে এই বিকৃত নাগযোনি প্রাপ্ত হইয়াছি। ব্রহ্মর্ষি কহিয়াছেন,—যিনি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন, তিনি তোমার গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা ও তোমাকে এ পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। নহিলে, তোমারও উদ্ধার নাই, এবং তোমার কবলে পতিত ব্যক্তিরও উদ্ধার নাই।" ভীম তদীয় প্রশ্নের উত্তরদানে অক্ষম হওয়ায় তৎকর্ত্তৃক কবলিত হইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ভীমের আগমনবিলম্ব দেখিয়া যুধিষ্ঠির তদনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণাধিক ভ্রাতাকে তদবস্থায় দর্শন করিলেন। অনন্তর ভীমের মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া, সেই নাগের নিকট ভ্রাতার প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। নাগ কহিলেন,—"তুমি আমার প্রশ্নোত্তর দিলেই তোমার ভ্রাতাকে মুক্ত করিব, নহিলে আমার কবল হইতে রক্ষা নাই"। যুধিষ্ঠির তাঁহার প্রশ্ন শুনিতে চাহিলে নাগ কহিলেন।

নাগ।—"ব্রাহ্মণঃ কো ভবেদ্রাজন্! বেদ্যং কিঞ্চ যুধিষ্ঠির!'

হে যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে? এ জগতে বেদ্য অর্থাৎ জ্ঞেয় বস্তু কি?

যুধিষ্ঠির। বেদ্য বস্তু—সেই সুখদুঃখাতীত, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, যাঁহাকে লাভ করিলে, জীব শোক মোহের অতীত হয়। আর আপনি যে ব্রাহ্মণের

কথা জিজ্ঞাসিলেন, সে বিষয়ে আমি সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকেই প্রমাণ করিয়া বলিতেছি ;—

"ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ।
যত্রৈতৎ লক্ষ্যতে সর্প! বৃত্তং স ব্রাহ্মণো স্মৃতঃ॥
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প! তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥"

———শূদ্র হইয়াও শূদ্র হয় না, ব্রাহ্মণ হইয়াও ব্রাহ্মণ হয় না, অর্থাৎ শূদ্র বংশে বা ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম, শূদ্রত্ব বা ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে। 'বৃত্ত' অর্থাৎ সদাচার যাহাতে লক্ষ্য করিবে, তাহাকেই ব্রাহ্মণ জানিও।

এই কথা শুনিয়া নাগ কহিলেন, যদি—একমাত্র চরিত্রই ব্রাহ্মণত্বের কারণ হয়, তবে সেই চরিত্রের অভাবে, তাহার জন্মাধীন জাতিত্ব বৃথা হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন ;—

"জাতিরত্র মহাসর্প! মনুষ্যত্বে মহামতে!
সঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ॥
সর্ব্বে সর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্ মৈথুনমথো জন্ম মরণং চ সমং নৃণাম্॥
ইদমার্ষং প্রমাণং চ যে যজামহ ইত্যপি।
তস্মাচ্ছীলং প্রধানেষ্টং বিদুর্যে তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

—হে মহানাগ! হে মহামতে! সর্ব্ববর্ণমধ্যে সঙ্করতা জন্য মানবের জন্মাধীন জাতিত্ব সুদুর্জ্ঞেয়। উদ্দাম ইচ্ছার পরতন্ত্র হইয়া, মানবগণ সকল যোনিতেই অপত্যোৎপাদন করিতেছে। যেমন মহাসমুদ্রে অসংখ্য জলচরের গতিবিধি নির্ণয় হয় না, তেমনি মানবের বাক্য, মৈথুন, জন্ম ও মরণ, এই কয়টী নির্ণয় হয় না। অতএব যাঁহারা যজ্ঞশীল অর্থাৎ যজন-যাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি জ্ঞান-পুণ্যের অধিষ্ঠানেই সদা নিযুক্ত, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ।

—"ভোঁ ভোঁ করে ভোমরা নয়, গলায় পৈতা বামুণ নয়।" কপর্দ্দক মূল্যের কয়েকগাছি সূত্র স্কন্ধে ধারণ করিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। এ জগতে একমাত্র পুরুষকারেই লোকের আত্মপরিচয়।

একটী কৌতুকাবহ পৌরাণিক কথা মনে হইল, তাহা এস্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে। কথিত আছে, একদা লোমশমুনি সর্ব্বাঙ্গে রাশি রাশি লোমভারে বড়ই অসুখী হইয়া ব্রহ্মার আরাধনা করায়, ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন। লোমশ করযোড়ে কহিলেন,—"ভগবন্! আমি আর কিছুই চাহি না, কাশ্মীরী ভেড়ার ন্যায় এ লোমভার হইতে আমাকে মুক্ত করুন।" ব্রহ্মা কহিলেন—"বৎস! তুমি ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলেই এ লোমসঙ্কট হইতে মুক্ত হইবে।" লোমশও তদবধি নানাস্থানে বহু ব্রাহ্মণের প্রসাদ ভোজন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার গাত্রের একগাছি লোমও স্খলিত হইল না। তখন তিনি হতাশ হইয়া, পুনরায় বিরিঞ্চির শরণাপন্ন হইলেন, কহিলেন,—"ভগবন্! আমার অদৃষ্টে ব্রহ্মবাক্যও বিফল হইল! আমি আপনার আদেশে বহু ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন করিলাম; কৈ? আমার ত একটী লোমও পতিত হইল না!" ব্রহ্মা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—"বৎস! তুমি বংশ ও উপবীত দেখিয়াই প্রতারিত হইয়াছ। প্রকৃত পক্ষে উহারা কেহই ব্রাহ্মণ নহে। তোমার আশ্রমের দূরে যে চণ্ডালপল্লী আছে, সেই স্থানে হরিদাস নামে এক চণ্ডাল সপরিবার বাস করে, তুমি তাহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলেই সফল মনোরথ হইবে। তখন মুনিবর সেই চণ্ডালের ভবনে গিয়া হরিদাসের নিকট অন্ন চাহিলে, সপরিবার হরিদাস ধরাবলুণ্ঠিত হইয়া কাতরস্বরে কহিল,—"ঠাকুর! আপনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব, আপনি আমাদের প্রত্যক্ষ নারায়ণ।—এ অস্পৃশ্য, নীচাধম, পাতকী চণ্ডাল আপনাকে কিরূপে উচ্ছিষ্ট ভোজন করাইবে? ক্ষমা করুন, অতিথি সেবায় আমরা সপরিবার আমাদের ধনপ্রাণ দিতে বিন্দুমাত্র কাতর নহি। কিন্তু

চণ্ডাল হইয়া ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে কিরূপে উচ্ছিষ্ট ভোজন করাইব?" মহর্ষিকে তখন অগত্যা প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল। তিনি মনে মনে উপায় উদ্ভাবন করিলেন। একদা ঐ চণ্ডাল ভোজনে বসিয়াছে, ইত্যবসরে লামশ অলক্ষ্যভাবে গিয়া তদীয় পাত্রস্থ অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর পরমানন্দে সেই উচ্ছিষ্ট ভোজন ও সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার দেহ নির্লোম ও নির্ম্মল হইল।

চণ্ডালোঽপি ভবেদ্ বিপ্রো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥
—"মুচি হ'লেও, হয় শুচি যদি কৃষ্ণ ভজে;
শুচি হ'লেও হয় মুচি, যদি কৃষ্ণ ত্যজে॥"

যদি কেহ কঠোর সাধনাবলে উচ্চ জ্ঞান ধর্ম্মাদি অধিকার করে, তবে সে স্বতঃই শ্রেষ্ঠ পূজা লাভ করিবে। মনুষ্যত্বই মনুষ্যের জাতি।"

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

এক এব পুরা বেদ প্রণব সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবনারায়ণোনান্য একাগ্নির্বর্ণ এব চ।

অর্থাৎ পূর্ব্বে একবেদ, সর্ব্ববাঙ্ময় এক প্রণব, এক নারায়ণ দেবতা, এক অগ্নি ও একমাত্র বর্ণ ছিল।

অন্যত্র—পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড ২৫ অধ্যায়ে আছে,—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতম্।

পুনশ্চ মহাভারতে,—

একবর্ণমিদং পূর্ণং বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥ ১৮শ অঃ।

অর্থাৎ স্বভাবসম্ভূত গুণানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্ম্ম বিভাগ হইয়াছে। যে ব্যক্তি যেরূপ গুণসম্পন্ন, তাহার পক্ষে তদুপযোগী কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে বলিতেছেন,—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

অর্থাৎ গুণকর্ম্মের বিভাগানুসারে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ আমি সৃষ্টি করিয়াছি। "গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" এই অংশই সমুদয় সংশয় বিনষ্ট করিতেছে।

অত্রি-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে ;—

দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশুম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ॥৩৬৪
সন্ধ্যাং স্নানং জপং হোমং দেবতানিত্যপূজনম্।
অতিথিং বৈশ্বদেবঞ্চ দেবব্রাহ্মণ উচ্যতে॥ ৩৬৫
শাকে পত্রে ফলেমূলে বনবাসে সদা রতঃ।
নিরতোঽহরহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্রো মুনিরুচ্যতে॥ ৩৬৬
বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাঙ্খ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে॥ ৩৬৭
অস্ত্রাহতাশ্চ ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্ব্বসম্মুখে
আরম্ভে নির্জ্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে॥ ৩৬৮

কৃষিকর্ম্মরতো যশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ।
বাণিজ্য ব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে॥ ৩৬৯
লাক্ষালবণসম্মিশ্র কুসুম্ভক্ষীর সর্পিষাম্।
বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে॥ ৩৭০
চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা।
মৎস্যমাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে॥ ৩৭১
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥ ৩৭২
বাপীকূপতড়াগানামারামস্য সরঃসু চ।
নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে॥ ৩৭৩
ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে॥ ৩৭৪
বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং, শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণ পাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি, ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি॥ ৩৭৫
জ্যোতির্ব্বিদো হ্যথর্ব্বাণঃ কীরপৌরাণ পাঠকাঃ।
শ্রাদ্ধে যজ্ঞে মহাদানে বরণীয়াঃ কদাচ ন॥ ৩৭৬

"দেব, মুনি, দ্বিজ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ এবং চণ্ডাল এই দশবিধ (দশ লক্ষণাক্রান্ত) ব্রাহ্মণ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট। যিনি প্রতিদিন সন্ধ্যা, জপ, হোম, দেবপূজা, অতিথিসেবা এবং বৈশ্বদেব করেন, তাঁহাকে "দেব" ব্রাহ্মণ কহে (এই সকল ধর্ম্ম-কর্ত্তা ব্রাহ্মণ, দেবসংজ্ঞক)। শাক-পত্র-ফল-মূল-ভোজী বনবাসী এবং নিত্য-শ্রাদ্ধরত ব্রাহ্মণ "মুনি" বলিয়া কীর্ত্তিত হন। যিনি প্রত্যহ বেদান্ত পাঠী, সর্ব্বসঙ্গত্যাগী, সাংখ্য এবং যোগের তাৎপর্য্য জ্ঞানে তৎপর সেই ব্রাহ্মণ "দ্বিজ" নামে অভিহিত হন। যিনি সমরস্থলে সর্ব্বসমক্ষে আরম্ভ সময়েই ধন্বীদিগকে অস্ত্রদ্বারা আহত ও

পরাজিত করেন, সেই ব্রাহ্মণের "ক্ষত্র" সংজ্ঞা। কৃষিকার্য্যের গো-প্রতিপালক এবং বাণিজ্য-তৎপর ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বলিয়া উক্ত হন। যে লাক্ষা, লবণ, কুসুম্ভ, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু বা মাংস বিক্রয় করে, সেই ব্রাহ্মণ শূদ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। চৌর, তস্কর (বলপূর্ব্বক পরধনাপহারী), সূচক (কুপরামর্শদাতা), দংশক (কটুভাষী) এবং সর্ব্বদা মৎস্য-মাংস লোভী ব্রাহ্মণ "নিষাদ" বলিয়া কথিত। যে ব্রাহ্মণ (বেদ এবং পরমাত্মা) তত্ত্ব কিছুই জানে না অথচ কেবল যজ্ঞোপবীতের বলে অতিশয় গর্ব্ব প্রকাশ করে, এই পাপে সেই ব্রাহ্মণ "পশু" বলিয়া খ্যাত। ৩৬৪—৩৭১। যে নিঃশঙ্কভাবে (পাপের ভয় না করিয়া) কূপ, তড়াগ, সরোবর এবং আরাম (সাধারণ ভোগ্য উপবন) রুদ্ধ করে, (তত্তৎ স্থলে ব্যবহার বন্ধ করে), সেই ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছ বলিয়া কথিত হয়। ক্রিয়াহীন (সন্ধ্যাদি নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মহীন), মূর্খ, সর্ব্বধর্ম্ম (সত্যবাদিতা প্রভৃতি) রহিত, সকল প্রাণীর প্রতি নির্দ্দয় ব্রাহ্মণ "চণ্ডাল" বলিয়া গণ্য। বেদ অধ্যয়নে কিছু জ্ঞান না জন্মিলে, ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করে; তাহা নিষ্ফল হইলে পুরাণপাঠী এবং পূর্ব্ববৎ তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে, কৃষিকর্ম্মে রত হয়; তাহাতেও বিফল মনোরথ হইলে, ভাগবত (ভণ্ডবৈষ্ণব) ধর্ম্ম অবলম্বন করে। জ্যোতির্ব্বিদ্ (ধন গ্রহণ করিয়া গ্রহ নক্ষত্রের ফলাফল নির্ণয়কারী), অথর্ব্ববেদী, শুকবৎ পুরাণ পাঠক (অর্থ বোধ না করিয়া, যাহারা পুরাণ আবৃত্তি করে), ইহাদিগকে শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ এবং মহাদানে কদাপি বরণ করিবে না।"

অত্রি আরও বলিতেছেন,—

আবিকশ্চিত্রকারশ্চ বৈদ্যো নক্ষত্র পাঠকঃ।
চতুর্ব্বিপ্রা ন পূজ্যন্তে বৃহস্পতিসমা যদি ॥ ৩৭৮
মাগধো মাথুরশ্চৈব কাপটঃ কৌটকামলৌ।
পঞ্চবিপ্রা ন পূজ্যন্তে বৃহস্পতিসমা যদি ॥ ৩৭৯

"অজাজীবী, চিত্রকর, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, নক্ষত্র-পাঠক (নক্ষত্রজীবী), এই চতুর্ব্বিধ বিপ্র বৃহস্পতিতুল্য পণ্ডিত হইলেও পূজনীয় নহে। মাগধ (মগধদেশীয়), মাধুর (তোষামোদকারী), কপটাচারী, কটুব্যবহারী, কামল (লোভী), এই পঞ্চবিধ ব্রাহ্মণ, বৃহস্পতিতুল্য পণ্ডিত হইলেও পূজনীয় নহে।"

বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে,—

শমোদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবং।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণং॥
শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণং॥
দেবগুর্ব্বচ্যুতে ভক্তিস্ত্রিবর্গ পরিপোষণং।
আস্তিক্যমুদ্যমোনিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্যলক্ষণং॥
শূদ্রস্য সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া।
অমন্ত্র যজ্ঞোহ্যস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণং।

(শ্রীমদ্ভাগবত)

আমরা যতই আলোচনা করিতেছি, ততই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেছি যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রাহ্মণ হইয়াই, কি ক্ষত্রিয় হইয়াই, কি বৈশ্য হইয়াই, অথবা কি শূদ্র হইয়াই জন্মগ্রহণ করে নাই। জন্ম সকলের একরূপেই হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্য দ্বারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি নিম্নস্তরে উপনীত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যথাক্রমে সত্যগুণ, সত্যরজঃ উভয়বিধ মিশ্রিত গুণ, রজঃ ও তমঃ ভাবাপন্ন এবং তমঃ ভাবাপন্ন মানব ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এই জন্যই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে—

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্মস্বভাবজম্॥

মনুও

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।

দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥

ক্ষত্রিয় সম্বন্ধে ভগবদ্গীতা বলিতেছেন,—

শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥

মনু বলিতেছেন,—

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ॥

বিষয়েষু প্রসক্তি চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥

কৃষিজীবী, গো-পালক ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ী আর্য্য-সম্প্রদায় বৈশ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে; যথা—ভগবদ্গীতা :—

কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্মস্বভাবজম্।

অন্যত্র—

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।

বণিকপথং কুশীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥

আর শূদ্র হইতেছে তমোগুণ প্রধান; অলস, নিরুৎসাহ এবং অজ্ঞান ব্যক্তির কেবল দাসত্ব-বৃত্তিই স্বাভাবিক কর্ম্ম।

এই জন্য,—

পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্মশূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্। (ভগবদ্গীতা)

অপিচ,—

একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুকর্ম্মসমাদিশন্।

এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষানুসূয়য়া॥

বাস্তবিক পক্ষে প্রাচীন আর্য্যগণ এইরূপ বিভিন্ন বিভিন্ন কার্য্যে ব্রতী হওয়ায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এইরূপ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া

পড়িয়াছিলেন। ফলতঃ গুণ ও কর্ম্মগত জাতিভেদ প্রথা তৎকালে এরূপ আধিপত্য লাভ করিয়াছিল যে, সত্যগুণ প্রধান ব্রাহ্মণের পুত্রে যদি রজোগুণ প্রধান ক্ষত্রিয় লক্ষণ অথবা রজো ও তমোগুণ প্রধান বৈশ্য লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইত, কিম্বা তমোপ্রধান শূদ্র-গুণ যদি তাহাতে প্রকাশ পাইত, তবে সে ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়াও ক্ষত্রিয় বৈশ্য অথবা শূদ্র শ্রেণীভুক্ত হইয়া যাইত। এইরূপে চারি সম্প্রদায়ভুক্ত সকলেই গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে সমাজে উচ্চ বা নিম্নস্তরে গমন করিত।

শাস্ত্রকারগণ এরূপ প্রথা অনুমোদন এবং দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন। সমুদয় বর্ণের লক্ষণ বলিয়া, যাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার পরে ভাগবতকার বলিতেছেন,—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসোবর্ণাভিব্যঞ্জকং।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত—৭ম স্কন্ধ)

"যে বর্ণের যে লক্ষণ বলা গেল, তাহা অন্যত্র দৃষ্ট হইলেও তাহাকে তদ্দ্বারা নির্দ্দেশ করা যাইবে।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বংশজ ব্যক্তিতে যদি ক্ষত্রিয় কর্ম্ম বা ক্ষত্রিয়গুণ, বৈশ্যকর্ম্ম বা বৈশ্যগুণ, শূদ্রকর্ম্ম বা শূদ্রগুণ দেখা যায়, তাহা হইলে তিনি ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবেন, তদ্রূপ ক্ষত্রিয় পুত্রে যদি ব্রাহ্মণ গুণ এবং ব্রাহ্মণ কর্ম্ম, বৈশ্যগুণ ও বৈশ্যকর্ম্ম অথবা শূদ্রগুণ ও শূদ্রকর্ম্ম দেখা যায়, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণ বৈশ্য বা শূদ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবেন। বৈশ্য শূদ্রের সম্বন্ধেও ঠিক ঐরূপই নিয়ম।

সৎকার্য্য দ্বারা উচ্চ বর্ণত্ব ও অসৎ কার্য্য দ্বারা হীনবর্ণত্ব প্রাপ্ত হওয়া সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ বহুবিধ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন।

ভগবান্ গৌতম বলিতেছেন—

বর্ণান্তর গমনমুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাং।

"অর্থাৎ সৎগুণ ও সৎক্রিয়া এবং অসৎ গুণ ও অসৎ ক্রিয়া দ্বারা বর্ণান্তর গমন হয়।"

বর্ণাপেতমবিজ্ঞাতং নরং কলুষযোনিজম্ !
আর্য্যরূপমিবানার্য্যং কর্ম্মভিঃ স্বৈর্বিভাবয়েৎ ॥ ৫৭

মনুসংহিতা,—দশম অধ্যায়।

"বর্ণ-বহির্ভূত সবিশেষ অবিদিত সঙ্করজাতি-সম্ভূত, আপাততঃ আর্য্যবৎ প্রতীয়মান কিন্তু অনার্য্য—এবম্ভূত ব্যক্তির কর্ম্মদর্শনে জাতি-নির্ণয় করিবে।"

"অনার্য্যতা নিষ্ঠুরতা ক্রূরতা নিষ্ক্রিয়াত্মতা।
পুরুষং ব্যঞ্জয়ন্তীহ লোক কলুষযোনিজম্। ৫৮

মনুসংহিতা,—দশম অধ্যায়।

"অনার্য্যতা, নিষ্ঠুরতা এবং বধকর্ম্মের অনুষ্ঠান—এই সকল মনুষ্যের নীচজাতিত্ব প্রকাশ করে।"

অত্রি বলিতেছেন,—

"সদ্যঃ পতিতমাংসেন লাক্ষয়া লবণে ন চ।
ত্র্যহেনশূদ্রো ভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ ॥ ২১

"ব্রাহ্মণ মাংস, লাক্ষা (গালা), লবণ বিক্রয় করিলে সদ্য পতিত হয় এবং দুগ্ধ বিক্রয় করিলে, তিন দিনে শূদ্রবৎ হয়।"

"পরনিপানেম্বপঃ পীত্বা তৎসাম্যমুপগচ্ছতীতি ॥ ৩৮

বিষ্ণুসংহিতা,—চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

"পরকীয় জলাশয়ে জলপান করিলে, জলাশয় স্বামীর সমতা প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ পানকর্ত্তা যদি ব্রাহ্মণ, আর জলাশয়স্বামী ক্ষত্রিয় হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সদৃশ হইয়া যাইবে ইত্যাদি।"

"যস্য কায়গতং ব্রহ্মমদ্যেনাপ্লাব্যতে সকৃৎ।
তস্য ব্যপৈতি ব্রাহ্মণ্যং শূদ্রত্বঞ্চ স গচ্ছতি॥ ৯৮

মনুসংহিতা,—একাদশঃ অধ্যায়ঃ।

"যাঁহার কায়গত ব্রহ্ম একবারও মদ্য দ্বারা আপ্লাবিত হয়, তাঁহার ব্রহ্মণ্য দূরীভূত হয় এবং তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।"

"ভুঞ্জতে যে তু শূদ্রান্নং মাসমেকং নিরন্তরং।
ইহজন্মনি শূদ্রত্বং জায়ন্তে তে মৃতাঃ শুনি॥ ৭
শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কং শূদ্রেনৈব সহাসনম্।
শূদ্রাজ্জ্ঞানাগমঃ কশ্চিজ্জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ॥ ৮

আপস্তম্বসংহিতা,—অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

"যে সকল ব্রাহ্মণ একমাস নিরন্তর শূদ্রান্নভোজন করে, সে এই জন্মেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, জন্মান্তরে কুক্কুর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। শূদ্রান্নভোজন, শূদ্রের সম্পর্ক এবং শূদ্রের সহিত একাসনে উপবেশন, শূদ্রের নিকট জ্ঞান লাভ করা এ সকল কার্য্য তেজস্বী পুরুষকেও পতিত করে।" ফলতঃ কর্ম্ম দ্বারাই ব্রাহ্মণ পূজ্য ও হেয়,—জন্ম দ্বারা নহে।

মনু বলিতেছেন,—

চণ্ডালান্ত্যস্ত্রিয়ো গত্বা ভুক্‌ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ।
পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাৎ সামান্ত গচ্ছতি॥ ১৭৬

মনুসংহিতা,—একাদশঃ অধ্যায়ঃ।

"অজ্ঞানতঃ চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতীয় স্ত্রীগমন করিলে, উহাদিগের অন্ন ভক্ষণ এবং উহাদিগের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিলে, ব্রাহ্মণ পতিত হইবেন এবং জ্ঞানপূর্ব্বক ঐ সকল আচরণ করিলে, সমানতা অর্থাৎ তত্তজ্জাতীয়তা প্রাপ্ত হইবেন।

শাস্ত্র বলিতেছেন,—

"ব্রাহ্মণস্য সদাকালং শূদ্রপ্রেষণকারিণঃ।
ভূমাবন্নং প্রদাতব্যং যথৈব শ্বা তথৈব সঃ॥ ৩৩

আপস্তম্বসংহিতা,—নবমোঽধ্যায়ঃ।

"সর্ব্বদা শূদ্রের আজ্ঞা প্রতিপালনকারী ব্রাহ্মণকে ভূমিতে অন্ন প্রদান করিবে, কুক্কুর যেমন অস্পৃশ্য, সেই ব্রাহ্মণও তদ্রূপ জানিবে।"

মহাভারতে কথিত হইয়াছে,—

শূদ্রো রাজন্ ভবতি ব্রহ্মবন্ধুর্দুশ্চারিত্রো যশ্চ ধর্ম্মদপেতঃ।
বৃষলীপতিঃ পিশুনো নর্ত্তনশ্চ রাজপ্রেষ্যো যশ্চ ভবেদ্বিকর্ম্মা॥
জপন্ বেদাজপংশ্চাপি রাজন্ সমঃ শূদ্রৈর্দাসবচ্চাপি ভোজ্যঃ।
এতে সর্ব্বে শূদ্রসমাভবন্তি রাজন্নেতান্ বর্জ্জয়েদ্দেবকৃত্যে॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৫৩ অঃ, ৪।৫ শ্লোক)

"যে সকল ব্রাহ্মণ দুশ্চরিত্র ও স্বধর্ম্মত্যাগী হইয়া শূদ্রাগমন, নৃত্য ও গ্রাম্যদৌত্য প্রভৃতি পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা বেদ অধ্যয়ন করুন বা না করুন, তাঁহাদিগকে শূদ্রতুল্য জ্ঞান করিয়া, শূদ্রপংক্তির মধ্যে ভোজন প্রদান ও দেবকার্য্যানুষ্ঠান সময়ে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।" এই ত গেল কর্ম্মগুণে ব্রাহ্মণের শূদ্রত্বে অপনয়নের কথা। এক্ষণে শূদ্র যে ব্রাহ্মণ হইতে পারে, তাহা দেখান যাইতেছে।

ঐ মহাভারতে আছে,—

যস্তু শূদ্রো দমে সত্যে ধর্ম্মে চ সততোত্থিতঃ।
তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দ্বিজঃ॥

(মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১২৫ অধ্যায়)

"যে শূদ্র, দম (বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ), সত্য ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচনা করি, কারণ ব্যবহারেই দ্বিজ হয়।"

সত্যং দমস্তপোদানমহিংসা ধর্ম্মনিত্যতা।
সাধকানি সদা পুংসাং ন জাতি র্ন কুলং নৃপ॥
শূদ্রেচৈতল্লবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রোভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ॥

(মহাভারত, বনপর্ব্ব)

"সত্য, দম, তপ, দান, অহিংসা ও ধর্ম্মনিত্যতাই পুরুষার্থ সাধক। জাতি ও কুল কোন কার্য্যকারক নহে। যদি কোনও ব্যক্তি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শূদ্রবৎ আচরণ করে, তাহাকে শূদ্র এবং যদি কোন ব্যক্তি শূদ্রকুলে জন্ম লইয়া আচারনিষ্ঠ হয়, তবে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায়।"

এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে এত অনুকূল শ্লোক নিবদ্ধ আছে, যাহা লিপিবদ্ধ করিতে গেলে এই অধ্যায়টিই স্বতন্ত্র একখানা গ্রন্থ হইয়া পড়ে। আবার শাস্ত্র না দেখাইতে চেষ্টা পাইলেও সমাজপতি পণ্ডিতমণ্ডলী, আমাদের কথায় মোটেই কর্ণপাত করিবেন না বা তাহা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিবেন না। কাজেই বাধ্য হইয়া আমাদিগকে অনর্থক কতকগুলি পত্রাঙ্ক অপব্যয় করিতে ও অযথা লেখনী সঞ্চালন করিয়া বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইতেছে মাত্র।

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ১৪ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে,—

কর্ম্মভিঃ শুচিভির্দেবি শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
শূদ্রোঽপি দ্বিজবৎসেব্য ইতি ব্রহ্মানুশাসনম্॥ ৪৮
স্বভাব কর্ম্ম চ শুভং যত্র শূদ্রোঽপি তিষ্ঠতি।
বিশিষ্টঃ স দ্বিজাতেৰ্বৈবিজ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ॥ ৪৯
ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন স্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্থ বৃত্তমেব তু কারণম্॥ ৫০

সর্ব্বোহয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন চ বিধীয়তে।
বৃত্তেস্থিতস্তু শূদ্রোহপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি॥ ৫১

"ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে, শূদ্রও যদি পবিত্র কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা বিশুদ্ধাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হয়, তবে তাহাকে ব্রাহ্মণের ন্যায় সমাদর করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ আমার (শিবের) মতে শূদ্র সচ্চরিত্র ও সৎকর্ম্মান্বিত হইলে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রশংসনীয় হয়। কেবল জন্ম, সংস্কার, শাস্ত্রজ্ঞান ও কুল ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে। সদাচার দ্বারা, সকলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে। সদাচারী শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে।" মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রও এই কথাই বলিতেছেন,—

শ্বপচোহপি কুলজ্ঞানী ব্রাহ্মণাদতিরিচ্যতে।
কুলাচারবিহীনস্তু ব্রাহ্মণ শ্বপচাধমঃ॥

(মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৪ উ, ৪২ শ্লোক)

"অর্থাৎ আচারনিষ্ঠ চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং আচারবিহীন ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল অপেক্ষা নিকৃষ্ট।"

মনুও বলিতেছেন,—তপোবীজপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেম্বিহ জন্মতঃ॥

(মনুসংহিতা—দশম অধ্যায়ঃ ৪২ শ্লোক)

"অর্থাৎ উক্ত কয়েক প্রকার জাতি যুগে যুগে তপস্যা প্রভাবে ও বীজোৎকর্ষে মনুষ্য মধ্যে যেমন জাত্যুৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তদ্বৈপরীত্যে তাহাদের জাত্যপকর্ষও ঘটিয়া থাকে।" এ বিষয়ের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ পরে উদাহরণ দ্বারা বিশদরূপে প্রদর্শন করিব। আমরা দেখাইব, কত জাতি ও কত পুরুষ সৎকর্ম্ম প্রভাবে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ-স্তরে সম্মানিত হইয়াছে ও অসৎ কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণেরাও কিরূপ অধোগতি লাভ করিয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণাদির শ্রেষ্ঠতা যে গুণকর্ম্মানুসারিণী এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ দেখান যাইতে পারে।

"সর্ব্বস্য প্রভবো বিপ্রাঃ শ্রুতাধ্যয়নশালিনঃ।
তেভ্যঃ ক্রিয়াপরাঃ শ্রেষ্ঠাস্তেভ্যোঽপ্যধ্যাত্মবিত্তমাঃ॥ ১৯৯
ন বিদ্যয়া কেবলয়া তপসা বাপি পাত্রতা।
যত্র বৃত্তমিমে চোভে তদ্ধি পাত্রং প্রকীর্ত্তিতম্॥২০০

(যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা)

"কর্ম্ম এবং জাতি দ্বারা ব্রাহ্মণগণ সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ উৎকৃষ্ট, তাহার মধ্যে কর্ম্মিগণ প্রধান এবং তাহাদিগের মধ্যেও উত্তম আত্মতত্ত্বজ্ঞগণ শ্রেষ্ঠ। কেবল বিদ্যা, কেবল তপস্যা, (কেবল কর্ম্ম, অথবা কেবল জাতি) দ্বারা সম্পূর্ণ পাত্র হয় না। কিন্তু যাহার কর্ম্ম এবং বিদ্যা-তপস্যা এই উভয় আছে, পূর্ব্বে ঋষিগণ তাহাকেই সম্পূর্ণ পাত্র বলিয়াছেন।"

পুনশ্চ মহাভারতে—ভরদ্বাজঃ উবাচ—

ব্রাহ্মণঃ কেন ভবতি ক্ষত্রিয়োবা দ্বিজোত্তম।
বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ বিপ্রর্ষে তদ্‌ব্রুহি বদতাম্বরং॥ ২১॥

ভৃগুরুবাচ—

জাত কর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃত শুচিঃ
বেদাধ্যয়ন সম্পন্নঃ ষট্‌সুকর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥ ২২॥
শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্‌ বিবসাশী গুরুপ্রিয়ঃ॥
নিত্যব্রতো সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥ ২৩॥
সত্যং দানমথাদ্রোহ অনৃশংস্যংত্রপ ঘৃণা।।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥ ২৪॥

ক্ষত্রজং সেবতে কর্ম্ম বেদাধ্যয়ন সঙ্গতঃ।
দানাদানরতির্যস্তু স বৈ ক্ষত্রিয় উচ্যতে॥ ২৫॥
বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদান রতিঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সঙ্গিতঃ॥ ২৬॥
সর্ব্বভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥ ২৭॥

শান্তিপর্ব্ব, ভৃগুভরদ্বাজ সংবাদ।

ভরদ্বাজ ঋষি ভৃগুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণ কিরূপে হয়, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রই বা কিরূপে হয় আমাকে বলুন—ভৃগু কহিলেন, জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সংস্কার দ্বারা যে ব্যক্তি সংস্কৃত ও শুচি, বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন ষট্‌কর্ম্মশালী (সন্ধ্যাবন্দনা জপ হোম দেবপূজা অতিথি সৎকার এই ছয়টী অথবা যাজন-যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন সৎপাত্রে দান ও সৎপ্রতিগ্রহ এই ছয়টী ষট্‌কর্ম্ম) যে শৌচাচারস্থ, দেবপ্রসাদভোজী, গুরুপ্রিয়, নিত্য ব্রতপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, সে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ এই সকল গুণ থাকিলে ব্রাহ্মণ হয়। সত্য, দান অদ্রোহ, অনৃশংসতা লজ্জা (কুকার্য্য করিতে লজ্জা), ঘৃণা (নিন্দনীয় কর্ম্মে ঘৃণা) ও তপস্যা যাহাতে দেখিবে, সেই ব্রাহ্মণ জানিবে। যিনি বেদাধ্যয়ন করেন এবং ক্ষত্রোচিত বিপন্ন রক্ষায় দীক্ষিত হয়েন, সৎপাত্রে দান ও প্রজার নিকট হইতে যোগ্যকর গ্রহণ করেন, তিনি ক্ষত্রিয়। বৈশ্যও বেদাধ্যায়ী হইবে। পশুরক্ষা, কৃষি, ধনোপার্জ্জন, প্রিয় ও শুচি হওয়া বৈশ্যের লক্ষণ। যে ব্যক্তির সকল খাদ্য গ্রাহ্য অর্থাৎ খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই, যাহার ভাল মন্দ কর্ম্মের বিচার নাই এবং যে বেদত্যাগী আচার-রহিত, সে শূদ্র বলিয়া কথিত হয়।

যোঽধীত্যবিধিবদ্বেদং বেদান্তং ন বিচারয়েৎ।
স সান্বয়ঃ শূদ্রকল্পঃ স পাদ্যং ন প্রপদ্যতে॥ ২৮॥ উশনঃ সংহিতা

"যে ব্যক্তি যথাবিধি বেদাধ্যয়ন করিয়া পশ্চাৎ বেদান্ত (উপনিষদ্) আলোচনা না করে, সে সবংশে শূদ্রবৎ হইবে এবং পাদ প্রক্ষালন জল বা প্রাপ্য পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। (ঐ)

"এবং বেদং বেদৌ বেদান্ বা স্বীকুর্য্যাৎ ॥ ৩৪ ॥

ততো বেদাঙ্গানি ॥ ৩৫।

যস্ত্বনধীতবেদোঽন্যত্র শ্রমং কুর্য্যাদসৌ সসন্তানঃ শূদ্রত্বমেতি ॥ ৩৬

মাতুরগ্রে বিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনম্ ॥ ৩৭ ॥

তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী ভবতি পিতাত্বাচার্য্যঃ ॥ ৩৮ ॥

এতেনৈব তেষাং দ্বিজত্বম্ ॥ ৩৯ ॥

প্রাঙ্মৌঞ্জীবন্ধনাদ্দ্বিজঃ শূদ্রসমো ভবতি ॥ ৪০ ॥

এইরূপে একবেদ দুইবেদ বা তিনবেদ আয়ত্ত করিবে। অনন্তর বেদাঙ্গ সকল (আয়ত্ত করিবে)। যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য বিষয় পরিশ্রম করে, সে সসন্তানে শূদ্রতা প্রাপ্ত হয়। অগ্রে মাতার নিকট হইতে জন্ম, মৌঞ্জীবন্ধন অর্থাৎ উপনয়ন দ্বিতীয় জন্ম; এই জন্মে, গায়ত্রী মাতা এবং আচার্য্য পিতা হন। এই জন্যই তাহাদিগের দ্বিজত্ব। মৌঞ্জীবন্ধনের পূর্ব্বে দ্বিজ শূদ্রতুল্য থাকে।

এই সমস্ত শ্লোকে সুস্পষ্ট প্রতিপাদিত হইল যে কর্ম্মভেদেই ব্রাহ্মণাদির ভেদ। জন্মগত ভেদের কোনও কথা এ সকল স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গেল না। যদি গুণকর্ম্মই বর্ণভেদের কারণ হয়, জন্মের সহিত উহার বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে সমাজের আদিম অবস্থায় বর্ণভেদের কারণ পাওয়া কঠিন এবং বর্ত্তমান জাতিভেদ বৃথা। মানব স্ব স্ব কর্ম্ম অনুসারেই যদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি হইল, তবে এ সকল কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে সে কি ছিল? সৃষ্টির আদি অন্ত নাই, সুতরাং বলিতে হইতেছে, প্রথমে সকলেই সমান ছিল, বর্ণভেদ ছিল না; স্বীয় কর্ম্মানুসারে মনুষ্য ব্রাহ্মণত্বাদি

লাভ করিয়াছে এবং তাহা পরবর্ত্তী সময়ের সামাজিক নির্দ্দেশ মাত্র। সমাজে সম্মান, স্বাতন্ত্র্য রক্ষা, উচ্চনীচতার পরিমাণ অনুসারে যোগ্যতমের প্রতিষ্ঠা ও অধিকার লাভ, দোষের প্রশ্রয় না দিয়া বরং দোষীকে অবনত করিয়া শাসন করা ইত্যাদি কতকগুলি যুক্তি দ্বারাই জাতি বা বর্ণভেদ সমাজে সমর্থিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ জাতিভেদ প্রথমে ছিল না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, —

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্॥ ১০

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব)

বর্ণ বা জাতির কোনও বিশেষ অর্থাৎ পার্থক্য নাই—সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় তৎকর্ত্তৃক পূর্ব্বে সৃষ্ট। কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন বর্ণপ্রাপ্তি হইয়াছে।

বাস্তবিকও একপ্রকারের বহু ব্যক্তি বহু কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতা লাভ করিলে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্টের জন্য সমাজ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হয়। নচেৎ সমাজে উৎশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইতে পারে। সমাজের মজ্জাগত দোষ দূর করিতে হইলে উত্তম অধম বিভাগ আবশ্যক হয়। মহাভারত ও ভাগবতের মতে বর্ণভেদ সমাজ শাসন বা সম্বর্দ্ধনের জন্য আবশ্যক বলিয়াই হইয়াছিল, এরূপ মনে হয়। ক্রমে এই গুণ ও কর্ম্মগত জাতিভেদ, জাতিগত বা বংশানুক্রমিক হইয়া সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে।

গুণগত জাতিভেদ সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহুবিধ শ্লোক নিবদ্ধ আছে। এবিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র।

বনপর্ব্বে মহাত্মা যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন যে, সকল মনুষ্যেরই জন্ম মৃত্যু ও সন্তানোৎপত্তি একইরূপ। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যাঁহার চরিত্র পবিত্র তিনিই ব্রাহ্মণ।

যুধিষ্ঠিরের মত বুদ্ধদেবও বলিয়াছেন যে, জন্ম বংশ বা জটাজুট দ্বারা কেহই ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। যাহাতে সততা ও ধর্ম্ম বিরাজমান তিনিই ব্রাহ্মণ।

যে মনু শূদ্রের উপর একেবারে খড়্গহস্ত ছিলেন, যিনি শূদ্রদিগকে সর্ব্বপ্রকার সামাজিক সুখাস্বাদন হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন, যিনি ধর্ম্মের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, স্বোপার্জ্জিত ধনের অধিকার প্রভৃতি সকল প্রকার অধিকার হইতেই তাহাদিগকে দূরে রাখিয়াছিলেন, তিনিও বলিতেছেন,—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈব চ॥

(মনু দশম অধ্যায়, ৬৫ শ্লোক)

"এই ক্রমে যেরূপে শূদ্র ব্রাহ্মণ হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণেরও শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হয়,—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধেও ঐরূপ জনিবে।"

শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন,—

ন জাতা ব্রাহ্মণাশ্চাত্র ক্ষত্রিয় বৈশ্য এব বা।
ন শূদ্রো ন চ বা ম্লেচ্ছো ভেদিতা গুণকর্ম্মভিঃ। (শুক্রনীতি)

সর্ব্বে চোত্তরোত্তরং পরিচরেয়ূরার্য্যানার্য্যায়ো-
র্ব্বতিক্ষেপে কর্ম্মণঃ সাম্যং সাম্যম্।

(দশম অধ্যায়ঃ, গৌতম-সংহিতা।)

"বর্ণগণ আপনার আপনার উর্দ্ধতন বর্ণের পরিচর্য্যা করিবে, কর্ম্মের বৈলক্ষণ্য ছাড়িয়া দিলে সমুদয় আর্য্য ও অনার্য্য জাতির সর্ব্বতোভাবে সাম্য হয়।

অন্যত্রও উক্ত আছে—

জ্ঞানকর্ম্মোপাসনাভির্দেবতারাধনে রতঃ।
শান্তো দান্তো দয়ালুশ্চ ব্রাহ্মণশ্চ গুণৈঃ কৃতঃ। (শুক্রনীতি)

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

(শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় ভাববাক্য)।

ভট্টমোক্ষমুলর—ধৃত ধর্ম্মসূত্র বচনে আমরা দেখিতে পাই,—

ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যোবর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ।

অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বো বর্ণো জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতে জাতি পরিবৃত্তৌ॥

মহর্ষি আপস্তম্ব শূদ্রের প্রতি নিষ্ঠুর বিধি প্রণয়ন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, তথাপি তিনিও বলিতেছেন,—"ব্রাহ্মণ ক্ষাত্রিয় ও বৈশ্য অধর্ম্মাচরণ দ্বারা পর পর বা একেবারে অধম জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেইরূপ শূদ্র বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় ক্রিয়াবান হইলে পর পর বা একেবারে উচ্চ-জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

মনু অন্য এক স্থলে বলিতেছেন,—

জাতোনার্য্যামনার্য্যায়ামার্য্যাদার্য্যো ভবেদ্‌গুণৈঃ।

"আর্য্য পিতা অনার্য্য মাতার পুত্রও গুণের দ্বারা আর্য্যই হইতে পারে।" বস্তুতঃ ব্রাহ্মণকুলে জন্মিলেই যে ব্রাহ্মণ হইবে তাহার কোন অর্থ নাই।

"অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।

সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষত্ত্বং ন বিদ্যতে॥ ১১৪॥

(দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ, মনুসংহিতা)

"যাহাদের কোন ব্রত নাই,—যাহাদের বেদাধ্যয়ন নাই, যাহারা জাতি-মাত্রে ব্রাহ্মণ এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তি সমবেত হইলেও তাহাতে পরিষত্ত্ব নাই জানিবে। সেই পরিষদের উপদেশ গ্রাহ্য হইতে পারে না।"

তৃতীয় অধ্যায়।

গুণকর্ম্মগত জাতিভেদের কতিপয় উদাহরণ।

গুণকর্ম্ম সম্বন্ধে বিখ্যাতনামা ব্যবস্থা-শাস্ত্রকার অত্রি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে "যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নযুক্ত ও অনিত্য সংসার-মোহমুক্ত সেই ব্রাহ্মণ। যে বীরধর্ম্মা ও সর্ব্ববিধ ক্ষত্রিয় কর্ম্মা সেই ক্ষত্রিয়। যে কৃষি বাণিজ্য-গোরক্ষাকারী বিহিত বৈশ্যাচারী, সেই বৈশ্য। যে মধু-মাংস-লবণ-বিক্রয়ী, অজ্ঞ, অনয়ী সেই শূদ্র। আর যে সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত, মহামূর্খ ও সর্ব্বপ্রাণী হিংসাপরায়ণ, সেই চণ্ডাল। অপিচ, বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশ একবাক্যে বলিতেছেন যে, ঘৃৎসমদের পৌত্র, শুনকের পুত্র শৌনক আপন পুত্রগণকে স্ব স্ব কর্ম্মভেদে বিভক্ত করিলেন।

যথা—বায়ুপুরাণঃ—

"পুত্রো ঘৃৎসমদস্য শুনকে যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ॥
এতস্য বংশসম্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ,—

"ঘৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রবর্ত্তয়িতাভূৎ।"

হরিবংশ বায়ুপুরাণের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। যথা,—

পুত্রগৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ॥

(হরিবংশ ২৯ অধ্যায়)

ঘৃৎসমদের পুত্র শুনক, শুনকের পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইয়াছিল। এক পিতার পুত্রগণ গুণকর্ম্মানুসারে বিভিন্ন বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ঘৃৎসমদ বা গৃৎসমিত একজন সামান্য ব্যক্তি নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ বায়ুপুরাণ ও হরিবংশে ইহাঁর বিষয় লিখিত হইয়াছে। ইনি বংশগৌরবে পুরাকালে সবিশেষ খ্যাত ছিলেন। ইহাঁর পিতৃপুরুষগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপ; বিতথের পঞ্চপুত্র—সুহোত্র, সুহোত্ব, গয়, গর্গ ও মহাত্মা কপিল। সুহোত্রের দুই পুত্র, কাশক ও রাজা গৃহসমিত। ফলতঃ একই পিতার পুত্রগণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবার প্রমাণ ভূরি ভূরি প্রদর্শিত হইতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত লইয়াছে;—ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব ঋষভের একশত পুত্রের মধ্যে একাশীতি জন কর্ম্মতন্ত্র প্রণেতা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন এবং কবি হবিঃ প্রভৃতি নয় জন পরমার্থ নিরূপক মুনি হইয়াছিলেন।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২)

"ঋগ্বেদে সরলভাবে একজন ঋষি বলিতেছেন,—দেখ আমি স্তোত্রকার, আমার পিতা চিকিৎসক, আমার মাতা প্রস্তরের উপর যবভর্জ্জনকারিণী। আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিতেছি। যেরূপ গাভীগণ গোষ্ঠমধ্যে তৃণকামনায় ভিন্ন দিকে বিচরণ করে, তদ্রূপ আমরা ধনকামনায় তোমার পরিচর্য্যা করিতেছি অতএব হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও। তাই রমেশ বাবু বলিতেছেন—যাহারা বৈদিক সময়ে জাতিভেদ প্রথা ছিলেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাই বলুন, যে পরিবারের পুত্র মন্ত্র প্রণেতা ঋষি, পিতা বৈদ্য এবং মাতা ময়দাওয়ালী তাঁহারা কোন জাতিভুক্ত?" বিস্ময়ের বিষয় ইহাই যে, আর্য্য রীতিনীতির সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ ছিন্ন হইলেও প্রাচ্য জাপানে বর্ত্তমান সময়ে ইহার অত্যন্ত সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে। একটী পরিবারে ৬টী সন্তান, সকলেরই কর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, কেহ হয়ত

চর্ম্মকার, কেহ হয়ত ক্ষৌরকার, কেহ হয়ত অধ্যাপক, কেহ হয়ত সূত্রধর, কেহ হয়ত চিত্রকর, কেহ হয়ত দর্জ্জি এবং কেহ হয়ত বস্ত্রবয়নকারী; প্রাতে ছয় ভাই এক সঙ্গে আহরাদি করিয়া, যার যার কর্ম্মক্ষেত্রে সে সে চলিয়া গেল। সারাদিন অতিবাহিত হইবার পর আবার পুনরায় সন্ধ্যাবেলায় ৬ ভাই একত্র হইল ও একত্রে পান ভোজনাদি করিল। বিবাহ প্রথাও তথায় ঐরূপ। কিন্তু পুরাণ সংহিতা, বেদবেদান্ত দর্শন বিজ্ঞানের জন্মভূমি বিধি ব্যবস্থা শাস্ত্রাদির উৎপত্তিস্থল ভারতে এ প্রথা একরূপ লুপ্ত প্রায়।

মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গতঃ অজগর পর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে;—শূদ্র বংশজ হইলেই যে শূদ্র হয় এবং ব্রাহ্মণবংশীয় হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয় এরূপ নহে। যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ লক্ষিত হয় না তাহারাই শূদ্র। পূর্ব্বে কেরল রাজ্যে ব্রাহ্মণ ছিল না। ভৃগুবংশাবতংশ ক্ষত্রিয়কুলারি পরশুরামের সাহায্যে কেরল দেশীয় ধীবরগণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

অব্রাহ্মণ্যে তদাদেশে কৈবর্ত্তান্‌প্রেক্ষ্য ভার্গবঃ।
* * * যজ্ঞসূত্রমকল্পয়ৎ।
স্থাপয়িত্বা স্বকীয়ে সঃ ক্ষেত্রে বিপ্রান্ প্রকল্পিতান্।
যামদগ্ন্য স্তদোবাচ সুপ্রীতে নান্তরাত্মনা। (স্কন্দপুরাণ)

দার্শনিক মহর্ষি কণাদের জননী অনার্য্য জাতীয়া—তাহার নাম ওলকা ছিল। এই জন্যই কণাদ দর্শনের অন্য নাম ঔলক্যদর্শন। বশিষ্ঠ পত্নী অক্ষমালা শূদ্রা হইয়াও পরে ব্রাহ্মণী হইয়াছিলেন। ম্লেচ্ছরমণী শুকীর গর্ভে অসাধারণ জ্ঞানী ভারত বিখ্যাত শুকদেবের জন্ম। মহর্ষি বেদব্যাসের জননী সত্যবতী ধীবর কন্যা কুমারীকালীন পরাশরের ঔরসে যে সন্তান প্রসব করে, তিনিই সাধনা ও ক্ষমতাবলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মহারাজা যযাতি ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানির গর্ভে যে দুইটী পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ভারত বিখ্যাত ক্ষত্রিয় বংশের আদিপুরুষ।

আজিও যে গায়ত্রীর দ্বারা ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব রক্ষিত হইতেছে, সেই বেদমাতা গায়ত্রীর রচয়িতা বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ-সন্তান নহেন, ক্ষত্রিয়ের সন্তান। তিনি তপস্যাবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

"করূষাৎ মানবাৎ আসন্ করূষাঃ ক্ষত্রজাতয়ঃ।
উত্তরাপথগোপ্তারো ব্রহ্মণ্যা ধর্ম্মবৎসলাঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৯।২)

"মনুর পুত্র করূষ হইতে কারূষ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়, ইহারা ক্ষত্র-জাতীয়। ইহারা উত্তরা ও পথের রক্ষক, ব্রহ্মণ্য এবং ধর্ম্মবৎসল ছিল।

"পৃষধ্রো হিংসয়িত্বাতু গুরোর্গাং জনমেজয়।
শাপাৎ শূদ্রত্বমাপন্নঃ। (হরিবংশ ৯ম অধ্যায়)

মনুর পুত্র পৃষধ্র রাজা গুরুর গোহত্যা করিয়া শাপবশতঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্দ ২য় অধ্যায়)

"নাভাগারিষ্ট পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।"

(হরিবংশ ১১।৬৫৮)

নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র বৈশ্য হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্দ ২ অধ্যায়)

মৌদ্গল্য ও কাম্বায়ণ গোত্রজ সমস্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বংশজাত। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মুদ্গল হইতে ব্রাহ্মণ জাতির মৌদ্গল্য গোত্রসম্ভূত হইয়াছিল। (শ্রীমদ্ভাগবতে ৯।২১)

মুদ্গলাচ্চ মৌদ্গল্যাঃ ক্ষত্রো পেতা দ্বিজাতয়ো বভূবঃ।

(বিষ্ণুপুরাণ)

মুদ্গলস্য তু দায়াদো মৌদ্গল্যঃ সুমহাযশাঃ।
এতে সর্ব্বে মহাত্মানো ক্ষত্রো পেতা দ্বিজাতয়ঃ॥

ভর্ম্যাশ্বের পুত্র মুদ্গল, মুদ্গলের পুত্র রাজা দিবোদাস, দিবোদাসের পুত্র মিত্রায়ু ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (হরিবংশ)

পুরুরবার বংশে রস্ত নামক নৃপের রভস নামক পুত্র, তাহার বংশে গভীর জন্মিয়াছিলেন, সেই গভীরের বংশে ব্রাহ্মণ জন্মিয়াছিলেন।" (ভাগবত)

শুধু গুণ ও কর্ম্মদ্বারাই বশিষ্ঠ ব্যাস নারদ শুকদেব মন্দপাল কণাদ প্রভৃতি ভারত বিখ্যাত ঋষিগণ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ইহাদের মাতৃগণ সকলেই নীচ জাতীয় শূদ্রকুল-সমুৎপন্না।

গর্গ হইতে শিনি উৎপন্ন হয়েন। শিনির পুত্র গার্গ্য। "গার্গ্য ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন হইলেও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।"

(শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্ধ, ১২শ অধ্যায়)

গর্গাৎ শিনিঃ ততোঃ গার্গ্যাঃ শৈনেয়াঃ
ক্ষত্রো পেতা দ্বিজাতয়ো বভুবঃ। (বিষ্ণুপুরাণ)

ক্ষত্রিয় মহাবীর্য্য হইতে দুরিত ক্ষয় উৎপন্ন হন। দুরিত ক্ষয়ের তিনটী পুত্র ত্রয্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুনি, তিন জন্যই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

দুরিত ক্ষয়ো মহাবীর্য্যাৎ তস্য ত্রয্যারুণিঃ কবিঃ।
পুষ্করারুণিরিত্যত্র যে ব্রাহ্মণ গতিং গতাঃ॥ (ভাগবত)

যযাতি বংশীয় ঋতেষুর সন্তান রন্তিনার, তাঁহার পুত্র তংসু, অপ্রতিরথ এবং ধ্রুব। অপ্রতিরথের বংশে কণ্ব জন্মগ্রহণ করে। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি হইতে কণ্বায়ন ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি হয়।

ঋতেয়োঃ রন্তিনারঃ পুত্রোঽভূৎ। তং সুং
অপ্রতিরথাং ধ্রুবঞ্চ রন্তিনারঃ পুত্রান্ অবাপ।

অপ্রতিরথাৎ কণ্বঃ তস্যাপি মেধাতিথিঃ।
যতঃ কণ্বায়না দ্বিজাঃ বভূবুঃ। (বিষ্ণুপুরাণ)

ঋতেয়ুর পুত্র রন্তিনার। রন্তিনারের সুমতি, ধ্রুব ও অপ্রতিরথ,—এই তিন পুত্র। অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব, কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। এই মেধাতিথি হইতে প্রস্কন্ন প্রভৃতি দ্বিজগণ উৎপন্ন হন। (ভাগবত—নবম স্কন্দ)

আর্য্যদিগের প্রাচীন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে জানিতে পারা যায় যে, দশ প্রজাপতি হইতে সমুদয় মনুষ্য সৃষ্টি হইয়াছে। সূর্য্যবংশের আদি রাজা ইক্ষ্বাকুর পিতৃপিতামহাদির অনুসন্ধান করিলে মরীচির বংশোদ্ভব প্রমাণ হয়। মরীচির পুত্র কশ্যপ, তৎপুত্র বিবস্বান, তাঁহার পুত্র সাবর্ণি মনু, তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকু এবং সেই ইক্ষ্বাকু হইতে সূর্যবংশীয় রাজন্যগণ জন্মিয়াছিলেন। চন্দ্রবংশ সম্বন্ধেও ঐ একরূপই। চন্দ্রবংশের আদি রাজা পুরোরবা, তৎপিতা বুধ (ইক্ষ্বাকু রাজভগিনী ইলা তাঁহার মাতা), বুধের পিতা চন্দ্র, চন্দ্র আবার অত্রির পুত্র। সুতরাং আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম, প্রজাপতিগণ হইতেই সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের সমুদয় ক্ষত্রিয় রাজাগণের উৎপত্তি।

স্বায়ম্ভুব মনু হইতে প্রিয়ব্রত ও ভক্তচূড়ামণি ধ্রুবের পিতা উত্তানপাদ নামক দুই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণে ৪র্থ অধ্যায়ে আছে,—মনুর পুত্রগণ মধ্যে পৃষধ্র শূদ্র, নেদিষ্টের পুত্র বৈশ্য, অঙ্গীরা ক্ষত্রিয় রথীতরের ভার্য্যাতে জাত পুত্রগণ ব্রাহ্মণ। যুবনাশ্ব রাজার পুত্র হরিত, তৎপুত্র আঙ্গিরস ব্রাহ্মণ। যবনাদি ম্লেচ্ছতা প্রাপ্ত। মেধাতিথি ক্ষত্রিয় তৎপুত্রেরা ব্রাহ্মণ, গর্গ ক্ষত্রিয় তৎপুত্র শিনি ও তৎপুত্রগণও ব্রাহ্মণ। উরুক্ষয় ক্ষত্রিয়, তাঁহার তিন পুত্রই পরে ব্রাহ্মণ হয়। মুদ্গল ক্ষত্রিয় তৎপুত্রগণ ব্রাহ্মণ।

হস্তিনাপুর নির্ম্মাতা হস্তীর তিন পুত্র, অজমীঢ় দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ়।

অজমীঢ়ের বংশে প্রিয় মেধাদি দ্বিজগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

অপিচ,—রুচিরাশ্বের পুত্র পার, পারের পুত্র পৃথুসেন। পারের নীপ নামে যে আর এক পুত্র ছিলেন, তাঁহার একশত পুত্র হয়। ঐ নীপই শুককন্যা কৃত্বীর গর্ভে ব্রহ্মদত্তকে উৎপন্ন করেন। সেই ব্রহ্মদত্ত যোগী।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্দ—২১শ অধ্যায়)

"কক্ষিবান্ বৈদিক ঋষিদিগের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ঋষি। তিনি কলিঙ্গ দেশীয় রাজপুত্র এবং ক্ষত্রিয়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৬ হইতে ১২৫ এবং নবম মণ্ডলের ৭৪ সূক্ত তাঁহার রচিত।"

কবষ ঐলূষ ঋষি একজন শূদ্র। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ ও ৩৪ সূক্ত এই ঋষির প্রণীত। যে হীন বাচক শূদ্রের পক্ষে বেদ প্রণয়ন দূরে থাকুক, বেদ পাঠ বা শ্রবণের অধিকারও ছিল না বলিয়া বর্ণিত আছে, সেই শূদ্রই বেদের শ্রেষ্ঠ ঋগ্বেদের প্রণেতা। এই ঋষি ব্রাহ্মণদিগের সহিত কলহ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। (কৌষতকী ব্রাহ্মণ);

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখা যাইতেছে যে, জন্মে ব্রাহ্মণ না হইয়াও লোকে গুণবলে ব্রাহ্মণশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিত এবং হীনকর্ম্মদ্বারা হীনবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইত। কোন যজ্ঞে ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট ভাগ ক্ষত্রিয় ভোজন করিতে পাইলে, তাঁহার সন্তানেরা ব্রাহ্মণ গুণবিশিষ্ট হইয়া প্রতিগ্রহ সমর্থ সোম পিপাসু, ক্ষুধার্ত্ত, সর্ব্বত্রগামী হইতেন। দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষে তাঁহাদের সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণত্ব জন্মিত। কোন ক্ষত্রিয় যজ্ঞে বৈশ্যের অংশ ভোজন করিলে, তদ্বংশীয়েরা বৈশ্য গুণোপেত হইয়া জন্মিত, রাজাকে কর প্রদান করিত এবং তাহার দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষ বৈশ্য জাতির উপযুক্ত হইত। যদি যজ্ঞে ক্ষত্রিয় শূদ্রের অংশ গ্রহণ করিত তাহার সন্তানেরা

শূদ্র-গুণোপেত হইয়া জন্মিত। তাহারা পরের সেবা করিত এবং প্রভুর ইচ্ছানুসারে তাড়িত ও প্রহারিত হইত। দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষে তাহারা শূদ্র শ্রেণীর যোগ্য হইত।" (৺রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই)

"বিদেহরাজ রাজর্ষি জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রাহ্মণের অজ্ঞাত উপনিষদ্-তত্ত্ব শিক্ষাপ্রদান করিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য মহা আনন্দিত হইয়া রাজাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তাহাতে জনক রাজা বলিলেন,—'আমি যাহা অভিলাষ করিতেছি আমাকে তাহা প্রদান করুন।' তদবধি জনক ব্রাহ্মণ হইলেন।" (শতপথ ব্রাহ্মণ)

"ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ না করিয়াও অনেকে বিদ্যা জ্ঞান কর্ম্ম ও যশঃ প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। জনক তাহার অন্যতম উদাহরণ। পরন্তু এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। 'দ্যূতক্রীড়াসক্ত, দাসীপুত্র, অব্রাহ্মণ আমাদের মধ্যে আসিয়া যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত হইবে।' এই বলিয়া ঋষিগণ ইলুষের পুত্র কাকষকে যজ্ঞীয় ভূমি হইতে অপমানিত করিয়া বিতাড়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবতাগণ কাকষকে জানিতেন এবং কাকষও দেবতাদিগকে জানিতেন; তাই কাকষ ঋষি মধ্যে গণ্য হইলেন।

(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ)

ক্ষত্রিয় পুরুর বংশ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে একস্থানে লিখিত আছে,—"এই বংশে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জন্মিয়াছেন। অনেক রাজর্ষি এই বংশকে পবিত্র করিয়াছেন। কলিযুগে ক্ষেমকের পর এই বংশলোপ পাইবে।"

বিষ্ণু পুরাণের অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায়,—এই বংশে গর্গের জন্ম। গর্গ হইতে সিবির জন্ম। তাঁহা হইতে গার্গ্য ও সৈবদেবের জন্ম। গার্গ্য ও সৈবেরা ক্ষত্রিয়গুণবিশিষ্ট হইয়াও অবশেষে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

উক্ত পুরাণের অন্যত্র দৃষ্ট হয়,—গর্গের ভ্রাতা মহাবীরের তিন পৌত্র ত্রয়ারুণ, পুষ্করি এবং কপি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

"মৎস্যপুরাণে ৯১ জন বৈদিক ঋষির নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই পুরাণের ১৩২ অধ্যায়ে আবার লিখিত আছে "এই ৯১ জন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঋক্‌সমূহ প্রণীত বা সৃষ্ট হইয়াছিল। এই সকল ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ছিলেন; তাঁহারা ঋষিদিগের সন্তান, ঋষিকেরা বৈদিক ঋষিগণের সন্তান।

মহাভারতে লিখিত আছে,—

শূদ্রেচৈব ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছুদ্রো ব্রাহ্মনো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥

ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি কেহ শূদ্রের ন্যায় লক্ষণযুক্ত হয় তাহা হইলে সে শূদ্ররূপে পরিগণিত হইবে, এবং যদি কেহ শূদ্রবংশে জন্মিয়াও ব্রাহ্মণের লক্ষণযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

তির্য্যগজাতিসম্ভূত ঋষ্যশৃঙ্গ বেদবিজ্ঞনাদি দ্বারা কিরূপে ঋষিত্ব লাভ করিয়া সর্ব্বজনের অর্চ্চনীয় হইয়াছিলেন তাহা শাস্ত্র পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

মনুসংহিতাই পুনরায় গুণকর্ম্ম সম্বন্ধে কি বলিতেছেন—শ্রবণ করুন।

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

"যে সকল দ্বিজ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্যত্র অর্থাৎ ঐহিক বিদ্যাদি লাভে যত্নবান হয়, তাহারা জীবিতাবস্থাতেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়!"

ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণত্ব লাভ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের ৯২।১৭ শ্লোকে কথিত হইয়াছে,—

"ধৃষ্টার্দ্ধাষ্ট৴মভূৎ ক্ষত্রং ব্রহ্মভূয়ং গতং ক্ষিতৌ।"

মনুর পুত্র ধৃষ্ট, তাহা হইতেই ধার্ষ্ট নামক ক্ষত্রিয় বংশের উৎপত্তি হয়। ধার্ষ্টগণ ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

"বিনানুষ্ঠানে একজন ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণ হইবার উপাখ্যান এইরূপে বর্ণিত আছে,—বীতহব্যের পুত্রগণ কাশীরাজ দিবোদাসকে আক্রমণ করেন। সেই যুদ্ধে কাশীরাজের আত্মীয়গণ প্রাণত্যাগ করেন। রাজা দিবোদাস ভরদ্বাজের আশ্রমে গিয়া বাস করিতে থাকেন। ভরদ্বাজ দিবোদাসের জন্য এক যজ্ঞ করিলেন, তাহাতে প্রতর্দ্দন নামে দিবোদাসের এক পুত্র জন্মিল। যথাকালে প্রতর্দ্দন পিতাকর্ত্তৃক বীতহব্যের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। বীতহব্য পলায়ন করতঃ মহর্ষি ভৃগুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। প্রতর্দ্দন তাহা জানিতে পারিয়া ভৃগুর আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং ক্ষত্রিয় বীতহব্যকে দেখাইয়া দিতে বলিলেন। ভৃগু মিথ্যা করিয়া বলিলেন—, "এখানে কোন ক্ষত্রিয় নাই।" প্রতর্দ্দন প্রস্থান করিলেন। কিন্তু ভৃগুর কথায় ক্ষত্রিয় বীতহব্য সেই অবধি ব্রাহ্মণ হইলেন।"

অন্য একটি দৃষ্টান্ত দেখুন,—

'বৎসস্ত বৎসভূমিস্ত ভার্গভূমিস্ত ভার্গবাৎ।
এতেত্বঙ্গিরসঃ পুত্রাজাতা বংশেঽথভার্গবে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ ভরতর্ষভ।

বৎস্য হইতে বৎস্যভূমি এবং ভার্গব হইতে ভার্গভূমি। ভার্গবের বংশে অঙ্গিরস পুত্রগণ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণ জন্মগ্রহণ করেন।

মনু ক্ষত্রিয়দিগের শূদ্রত্ব লাভের সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

"শনকৈস্ত ক্রিয়া লোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণা দর্শনেন চ ॥ ৪৩ ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রবিড়া কাম্বোজাজবনাঃ শকাঃ
পারদাপহ্নবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ ॥ ৪৪ ॥

মুখবাহূরুপাজ্জানাং যালোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ” ॥ ৪৫ ॥

১০ম অধ্যায়, মনুসংহিতা।

বক্ষমাণ ক্ষত্রিয়েরা উপনয়নাদি সংস্কারাভাবে এবং যজনাধ্যয়নাদির অভাবে ক্রমশঃ শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। ৪৩। “পৌণ্ড্রক” ঔড্র দ্রাবিড়, কম্বোজ, জবন, শক, পারদ, পহ্নব, চীন, কিরাত, দরদ এবং ‘খশ’ এই কয়েক দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়েরা পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মদোষে শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছে।৪৪। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে ক্রিয়া লোপাদি কারণে যাহারা বাহ্যজাতি বলিয়া পরিগণিত হয়,—সাধুভাষীই হউক আর ম্লেচ্ছভাষীই হউক উহারা দস্যু আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

প্রাচীন কালে সত্যপ্রিয়তা, বিদ্যাবত্তা ও তত্ত্ব জ্ঞানের উপরেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ নির্ভর করিত। এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদে একটী মনোরম উপখ্যান আছে নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ হইল।

জাবালার পুত্র সত্যকাম একদিন মাতাকে বলিল “মা! আমি ব্রহ্মচারী হইব, কোন্ বংশে আমার জন্ম ও আমি কোন্ গোত্রীয়?” মাতা সে কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন “যৌবন কালে আমি যখন বিভিন্ন লোকের দাস্যবৃত্তি করিতাম তুমি সেই সময় হইয়াছিলে—কাহার ঔরসে যে তোমার জন্ম তাহা আমি জানি না। তোমার নাম সত্যকাম, আমার নাম জবালা। তুমি এখন হইতে সত্যকাম জাবাল বলিয়া আত্মপরিচয় দিও।

সত্যকাম গৌতমের নিকট উপনীত হইয়া ব্রহ্মচারী হইবার সঙ্কল্প জানাইল। কিন্তু গৌতম কর্ত্তৃক বংশ পরিচয় জিজ্ঞাসিত হইলে সত্যকাম মাতার নিকট যাহা শুনিয়াছিল—তাহাই বলিল। সত্যকামের সত্য নিষ্ঠায় পরম জ্ঞানী মহর্ষি গৌতম মহা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন :—

"তং হোবাচ নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তু মর্হতি
সমিধং সোম্যাহরোপত্বা নেষ্যেন সত্যদগা। ইত্যাদি
(ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৪র্থ অধ্যায়)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ভিন্ন এমন করিয়া আর কেহ সত্য কথা বলিতে পারে না। তুমি সমিধ আহরণ কর, আমি তোমাকে উপনীত করিব। সেই অবধি সত্যকাম ব্রাহ্মণ হইল।

এস্থলে আমরা দেখিতে পাই যে সত্যই ব্রাহ্মণত্ব লাভের একমাত্র উপায় ছিল। সত্যকামের জাতি বা বংশের প্রতি আদৌ লক্ষ্য করা হয় নাই। বালক সত্য কথা বলিল, অমনি তাহাকে ব্রহ্মচারী করিয়া লওয়া লইল। পরে তিনি একজন মহর্ষি হইয়াছিলেন। অজ্ঞাতকুলশীল দাসী পুত্রও যখন ঋষি হইতে পারিয়াছিলেন, তখন প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের উদারতা সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। ফলতঃ যাহাদের পিতৃনির্ণয় না হয়, তাহাদের স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম দ্বারাই কেবল বর্ণ নির্ণীত হইয়া থাকে। যথা মনুসংহিতায় ১০ম অধ্যায় ৪০ শ্লোকে আছে,—

প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ।

এইরূপে আমরা ভূরি ভূরি উদাহরণ প্রদর্শনপূর্ব্বক গুণকর্ম্মানুযায়ী জাতি বিভাগের সমর্থন করিতে পারি; কিন্তু তাহা বাহুল্যমাত্র। কেননা বহু দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। কে না জানে, গুণ ও কর্ম্মানুযায়ী সূত পুত্র কর্ণ ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন, দ্রোণাচার্য্য অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয় শ্রেণী মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। আমরা এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করি না। অতঃপর বিবাহ ও আহার সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

বিবাহ।

বিবাহ। অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের কথা আর্য্য শাস্ত্রে বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। উচ্চ জাতীয় পুরুষ ও নিম্ন জাতীয়া স্ত্রীলোকে যে বিবাহ তাহাকে অনুলোম বিবাহ বলে। প্রতিলোম বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু অনুলোম বিবাহের বিধি ছিল। প্রতিলোম বিবাহ নিষিদ্ধ সত্ত্বেও আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই প্রতিলোমজ রোমহর্ষণ বেদব্যাসের শিষ্য ছিলেন। যখন নৈমিষারণ্যে ঋষিগণ শৌনকের দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তখন বেদব্যাস শিষ্য রোমহর্ষণ বিপ্রগণ মধ্যে উচ্চ আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৭৮।১৩, ১৪)

পূর্ব্বে ভারত সমাজে অসবর্ণ বিবাহ অবাধে প্রচলিত ছিল। আমরা এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ নানা শাস্ত্র হইতে ক্রমশঃ প্রদর্শন করিয়া আমাদের বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব।

"তিস্রস্তু ভার্য্যা বিপ্রস্য দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্য তু॥ ৬
একৈব ভার্য্যা বৈশ্যস্য তথা শূদ্রস্য কীর্ত্তিতা।
ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৭
ক্ষত্রিয়া চৈব বৈশ্যা চ ক্ষত্রিয়স্য বিধীয়তে।
বৈশ্যৈব ভার্য্যা বৈশ্যস্য শূদ্রা শূদ্রস্য কীর্ত্তিতা॥৮

* * * *

পাণিগ্রাহ্যঃ সবর্ণাসু গৃহ্ণীয়াৎ ক্ষত্রিয়া শরম্।
বৈশ্যা প্রতোদমাদদ্যাদ্বেদনে তু দ্বিজন্মনঃ॥১৪। চতুর্থ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণের তিনজাতি কন্যা ভার্য্যা, ক্ষত্রিয়ের দুইজাতি কন্যা ও বৈশ্যের একজাতীয়া কন্যা ভার্য্যা হইবে। শূদ্রের একজাতীয়া কন্যা ভার্য্যা হইবে।

ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা এবং বৈশ্যকন্যা, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় কন্যা এবং বৈশ্যকন্যা, এই দুইজাতীয়া, বৈশ্যগণের বৈশ্যকন্যা মাত্র, শূদ্রগণের শূদ্রকন্যা মাত্র।"

মহর্ষি ব্যাসও ঐ কথা সমর্থন করিয়া বলিতেছেন :—

"উঢ়ায়াং হি সবর্ণায়ামন্যাং বা কামমুদ্বহেৎ
তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রো ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে ॥ ১০
উদ্বহেৎ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্যাঞ্চ ক্ষত্রিয়ো বিশাম্।"

(দ্বিতীয় অধ্যায়, ব্যাসসংহিতা।)

"সবর্ণা বিবাহ করিয়া ইচ্ছা হইলে অন্যবর্ণীয়াকেও বিবাহ করিতে পারে। তাহা হইলে পূর্ব্ব পরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভসম্ভূত পুত্র অসবর্ণ হইবে না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কন্যা এবং বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিতে পারেন, ক্ষত্রিয়ও বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করিতে পারে এবং বৈশ্যও শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করিতে পারে।"

বিষ্ণুসংহিতায় উক্ত হইতেছে :—

"অথ ব্রাহ্মণস্য বর্ণানুক্রমেণ চতস্রো ভার্য্যা ভবন্তি ॥ ১ ॥
তিস্রঃ ক্ষত্রিয়স্য ॥ ২ ॥ দ্বে বৈশ্যস্য ॥ ৩ ॥ একা শূদ্রস্য ॥ ৪ ॥
তাসাং সবর্ণাবেদনে পাণি গ্রাহ্যঃ ॥ ৫ ॥
অসবর্ণা বেদনে শরঃ ক্ষত্রিয়কন্যয়া ॥ ৬ ॥
প্রতোদো বৈশ্যকন্যয়া ॥ ৭ ॥ বসনদশান্তঃ শূদ্রকন্যয়া ॥ ৮

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ভগবান্ বিষ্ণু পুনরায় বলিতেছেন,—

"সবর্ণাসু বহুভার্য্যাসু বিদ্যমানাসু
জ্যেষ্ঠয়া সহ ধর্ম্মকার্য্যং কুর্য্যাৎ ॥ ১
মিশ্রাসু চ কনিষ্ঠয়াপি সমানবর্ণয়া ॥ ২
সমানবর্ণায়া অভাবে ত্বনন্তরয়ৈবাপদি চ ॥ ৩

"সবর্ণা বহুপত্নী বিদ্যমান থাকিলে জ্যেষ্ঠা (অর্থাৎ তন্মধ্যে প্রথম পরিণীতা) ভার্য্যার সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিবে। মিশ্রা (অর্থাৎ সবর্ণা অসবর্ণা) বহুবিধা থাকিলে, সবর্ণা পত্নী কনিষ্ঠা হইলেও তাহার সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিবে, সমানবর্ণা পত্নীর অভাবে অব্যবহিত পরবর্ণার সহিত ঐ কার্য্য করিবে। (যথা,—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সহিত ইত্যাদি।)

পূর্ব্বে অসবর্ণ বিবাহ যে অবাধে প্রচলিত ছিল তাহা বহু প্রকারেই দেখান যাইতে পারে। অসবর্ণা ও হীনবর্ণা গুরুপত্নীকে কিরূপভাবে সম্বর্দ্ধনাদি করিতে হইবে শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে।

বিষ্ণুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

"হীনবর্ণানাং গুরুপত্নীনাং দূরাদভিবাদনং ন পাদোপসংস্পর্শনম্ ॥ ৫

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

"হীনবর্ণা গুরুপত্নীদিগের অভিবাদন দূর হইতে করিবে। পাদস্পর্শ করিবে না।'

অন্যত্রও দৃষ্ট হইতেছে,—

"গুরুবৎ প্রতিপূজ্যাশ্চ সবর্ণা গুরুযোষিতঃ।
অসবর্ণাস্তু সম্পূজ্যাঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ ॥ ২৭

তৃতীয় অধ্যায়, উশনঃসংহিতা।

দায়ভাগ সম্বন্ধে বিষ্ণুসংহিতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। পাঠকবর্গকে আমরা সেই অধ্যায়টী পাঠ করিতে অনুরোধ

করি। তবে প্রমাণস্বরূপ আমরা উহা হইতে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি,—

"ব্রাহ্মণস্য চতুর্ষু বর্ণেষু চেৎপুত্রাভবেয়ুস্তে
পৈত্রিকমৃক্‌থং দশধা বিভজেয়ুঃ ॥ ১
তত্র ব্রাহ্মণীপুত্রশ্চতুরোঽংশানাদদ্যাৎ ॥ ২
ক্ষত্রিয়াপুত্রস্ত্রীন্ ॥ ৩ ॥
দ্বাবংশৌ বৈশ্যাপুত্রঃ ॥ ৪ ॥
শূদ্রাপুত্রস্ত্বেকম্ ॥ ৫
* * * দ্বিজাতীনাং শূদ্রস্ত্বেকঃ পুত্রোঽর্দ্ধহরঃ ॥ ৩২

"ব্রাহ্মণের যদি চতুর্ব্বর্ণীয়া স্ত্রীতেই পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহারা (যথাকালে) পৈত্রিক ধন দশধা বিভক্ত করিবে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণী পুত্র চারি অংশ, ক্ষত্রিয়া পুত্র তিন অংশ, বৈশ্যা পুত্র দুই অংশ এবং শূদ্রা পুত্র একাংশ গ্রহণ করিবে। দ্বিজাতিগণের একমাত্র পুত্র শূদ্র হইলে সে অর্দ্ধাংশের অধিকারী হইবে।"

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—

"চতুস্ত্রিদ্ব্যেকভাগাঃ স্যুর্ব্বর্ণশো ব্রাহ্মণাত্মজাঃ ॥
ক্ষত্রজাস্ত্রিদ্ব্যেক ভাগা বিড়্জাস্তদ্ব্যেকভাগিনঃ।

দ্বিতীয় অধ্যায়, দায়ভাগ প্রকরণ।

"চারিজন (ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই চতুর্ব্বর্ণীয়া পত্নীর গর্ভজাত ব্রাহ্মণ পুত্র বর্ণানুক্রমে সমস্ত পৈতৃক ধনের চারি ভাগ, তিন ভাগ, দুই ভাগ এবং এক ভাগ; তিন জন (ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা এবং শূদ্রা এই ত্রিবর্ণীয়া পত্নীর গর্ভজাত) ক্ষত্রিয় পুত্র বর্ণানুক্রমে তিন ভাগ, দুই ভাগ, এক ভাগ, এইরূপ দুই জন (বৈশ্যা ও শূদ্রার গর্ভজাত) বৈশ্যপুত্র দুই ভাগ এবং এক ভাগ প্রাপ্ত হইবে।

গৌতম বলেন,—

"ব্রাহ্মণস্য রাজন্যা পুত্রো জ্যেষ্ঠো গুণসম্পন্ন
স্তুল্যাংশভাক্ জ্যেষ্ঠাংশহীনমন্যৎ
রাজন্যা বৈশ্যা পুত্রসমবায়ে স যথা
ব্রাহ্মণী পুত্রেন ক্ষত্রিয়াচ্চেৎ শূদ্রাপুত্রোঽপ্যনপত্যস্য
শুশ্রূষুর্লভেত বৃত্তিমূলমন্তেবাসবিধিনা।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ—গৌতমসংহিতা।

অতঃপর দাহাদির কথা উল্লিখিত হইতেছে,—

"পিতরং মাতরঞ্চ পুত্রা নির্হরেযুঃ॥ ৩
ন দ্বিজং পিতরমপি শূদ্রাঃ॥ ৪

একোনবিংশ অধ্যায়, বিষ্ণুসংহিতা।

"পুত্রগণ পিতামাতার নির্হরণ (শববহন দাহনাদি) করিবে। কিন্তু পিতা দ্বিজ হইলে, শূদ্র পুত্র তাহা (নির্হরণ) করিবে না। অর্থাৎ শাস্ত্রকার ক্ষত্রিয় বৈশ্য পুত্র দ্বারা মৃত ব্রাহ্মণ পিতার শববহন দাহনাদি করিতে পারিবে;—শুধু শূদ্র পুত্র দ্বারা এ কাজ চলিবে না, এইরূপে নিষেধ বিধি করিয়া দিলেন। ইহা দ্বারাও অসবর্ণ বিবাহ প্রতিপন্ন হইতেছে। দাহাদির পর অশৌচাদির কথা বলা হইতেছে—

রাজন্য বৈশ্যাবপ্যেবং হীনবর্ণাসু যোনিষু।
ষড়্রাত্রং বা ত্রিরাত্রং বাপ্যেকরাত্রক্রমেণ হি॥ ৩৬
বৈশ্য ক্ষত্রিয় বিপ্রাণাং শূদ্রেষ্বাশৌচমেব তু।
অর্দ্ধমাসেঽথ ষড়্রাত্রং ত্রিরাত্রং দ্বিজপুঙ্গবাঃ॥ ৩৭
শূদ্র ক্ষত্রিয় বিপ্রাণাং বৈশ্যেষ্বাশৌচ মিষ্যতে।
ষড়্রাত্রং দ্বাদশাহশ্চ বিপ্রাণাং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ।
অশৌচং ক্ষত্রিয়ে প্রোক্তং ক্রমেণ দ্বিজপুঙ্গবাঃ॥ ৩৮

শূদ্রবিট্‌ক্ষত্রিয়াণাস্তু ব্রাহ্মণে সংস্থিতে যদি।
একরাত্রেণ শুদ্ধিঃ স্যাদিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ॥ ৩৯

উশনঃসংহিতা, ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ।

"সপিণ্ড শূদ্রের জন্ম মরণে, বৈশ্য ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের যথাক্রমে ষড়রাত্র, ত্রিরাত্র ও একরাত্র অশৌচ। হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠগণ! সপিণ্ড বৈশ্যের জন্ম মরণে শূদ্র ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের যথাক্রমে ১৫—৬—৩ দিন অশৌচ। সপিণ্ড ক্ষত্রিয়ের জন্ম মরণে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য শূদ্রের যথাক্রমে ষড়রাত্র ও দ্বাদশাহ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ছয় দিন, বৈশ্য শূদ্রের বার দিন অশৌচ। সপিণ্ড ব্রাহ্মণের জন্ম মরণে, শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের প্রোক্ত (ব্রাহ্মণের যে কয়দিন অশৌচ উক্ত হইয়াছে—দশ দিন) অশৌচ হইবে।" এইত গেল অশৌচের কথা।

এক্ষণে আমরা জাতকর্ম্মাদি সংস্কারের কথা উভয় শাস্ত্রকারগণ কি বলিয়াছেন, তাহাও পাঠকবর্গের গোচরীভূত করিতে চাহি।

তাঁহারা বলেন,—

"বিপ্রবদ্বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্রবিন্নাসু বিপ্রবৎ।
জাতকর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ॥৭
বৈশ্যাসু বিপ্রক্ষত্রাভ্যাং ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ।"

প্রথম অধ্যায়—ব্যাসসংহিতা।

"ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা যে ব্রাহ্মণ কন্যা তাহাকে বিপ্রবিন্ন কহে। বিপ্রবিন্না পত্নীতে জাতসন্তানের, জাতকর্ম্মাদি সংস্কার ব্রাহ্মণের মত করিবে; ক্ষত্রবিন্না পত্নীতে (ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্র কন্যাকে ক্ষত্রবিন্না বলে) জাতসন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার ক্ষত্রিয় জাতির ন্যায় করিবে। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা শূদ্রা কন্যাতে জাতসন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার শূদ্রের ন্যায় করিবে। ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বিবাহিতা বৈশ্যকন্যাতে জাতসন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার বৈশ্যজাতির মত করিবে এবং ব্রাহ্মণ

ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য কর্ত্তৃক বিবাহিতা শূদ্র কন্যাতে জাতসন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার শূদ্রজাতির মত করিবে।

সর্ব্বশেষে অসবর্ণ বিবাহের প্রমাণস্বরূপ আর একটী মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আমরা এ অধ্যায় শেষ করিব।

কাত্যায়ন-সংহিতা বলিতেছেন,—

"বর্ণ জ্যৈষ্ঠ্যেন বহ্বীভিঃ সবর্ণাভিশ্চ জন্মতঃ।
কার্য্যমগ্নিচ্যুতেবাভিঃ স্বাধ্বীভির্ম্মথনং পুনঃ॥ ৫

অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

"ব্রাহ্মণের সবর্ণা অসবর্ণা বহুপত্নী থাকিলে, বর্ণজ্যেষ্ঠতা প্রযুক্ত সবর্ণা সাধ্বী পত্নীগণই অগ্নিনিঃসরণ উদ্দেশ্যে মন্থন করিবে। তন্মধ্যে অতি নিপুণা একজন বা ইহাদিগের মধ্যে যে কোন একজন পত্নী মন্থন করিবে। তদভাবে দ্বিজাতি জাতীয়া অসবর্ণা যে কোন পত্নীও বিশেষরূপে অগ্নিমন্থন করিতে পারিবে।"

অনুলোম বিবাহ সম্বন্ধে মনুসংহিতায় ত্রয়োদশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে :—

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুস্তাশ্চ স্বাচাগ্রজন্মনঃ॥ ১৩॥

(৩য় অঃ মনু)

"শূদ্রাই কেবল শূদ্রের ভার্য্যা হইবে; শূদ্রা এবং বৈশ্যা, বৈশ্যের বিবাহ যোগ্য। শূদ্রা, বৈশ্যা ও ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রিয় বর্ণের বিবাহ যোগ্যা এবং শূদ্রা, বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া এবং ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের বিবাহযোগ্য হইবে।"

এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেব (Mr. Elphinstone) তৎকৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসেও লিখিয়াছেন :—Men of the three first classes are freely indulged in the choice of woman from any inferior caste, provided they do not give them the first place

in their family. But not marriage is permitted with woman of a higher class.

অনুলোম বিবাহ সম্বন্ধে মনুসংহিতায় অন্যত্র লিখিত হইয়াছে ঃ—

পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সবর্ণাস্বুপদিশ্যতে।
অসবর্ণাস্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহকর্ম্মণি॥ ৪৩
শরঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহ্যঃ প্রতোদো বৈশ্যকন্যয়া।
বসনস্য দশা গ্রাহ্যা শূদ্রয়োৎকৃষ্ট বেদনে॥ ৪৪

(মনু তৃতীয় অধ্যায়)

"শাস্ত্রে সবর্ণা স্ত্রীরই পাণিগ্রহণ সংস্কারের বিধি আছে। অসবর্ণা স্ত্রী বিবাহকালে পাণিগ্রহণের পরিবর্ত্তে বক্ষ্যমাণ বিধিই প্রশস্ত। শূদ্রাদি নিকৃষ্ট বর্ণের অন্তর্গত বংশ সমূহ ব্রাহ্মণাদি উচ্চবংশের সহিত বৈবাহিক সূত্রেবদ্ধ হইয়া উচ্চবংশত্ব প্রাপ্ত হইত।"

এ সম্বন্ধে মনু বলিতেছেন ঃ—

শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজায়তে।
অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যাসপ্তমাদ্‌যুগাৎ॥ ৬৪॥
শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাত মেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈব চ॥ ৬৫॥

(মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়)

"স্বপত্নী শূদ্রাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাতা পারশব নাম্নীকন্যা যদি অন্য ব্রাহ্মণ বিবাহ করে এবং তাহার কন্যাকে যদি অপর ব্রাহ্মণে বিবাহ করে এবং এইরূপ ব্রাহ্মণ সংসর্গ যদি ধারাবাহিক সাত পুরুষ পর্য্যন্ত হয়, তবে সপ্তম জন্মে ঐ পারশাখ্য বর্ণ, বীজের উৎকর্ষতা জন্য ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয় এবং এই ক্রমে যেরূপ শূদ্র ব্রাহ্মণ হয় তদ্রূপ ব্রাহ্মণেরও শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হয়— ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধেও ঐরূপ জানিবে।"

এ সম্বন্ধে আর অধিক শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই। আমরা কেবল এতদ্‌বিষয়ক কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াই নিরস্ত হইব।

ক্ষত্রিয় যযাতি রাজা ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দেশে ঐরূপ প্রথা না থাকিলে কখনই এরূপ বিবাহ হইতে পারিত না। "যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য চতুর্ব্বেদ ও ষড়ঙ্গবেত্তা সর্ব্বগুণান্বিত ব্রহ্মদত্ত নামে বিখ্যাত এক যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ, বাসুদেবের তুষ্টির জন্য পঞ্চশত ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পাঁচ শত মধ্যে দুই শত ব্রাহ্মণ, এক শত ক্ষত্রিয়া, এক শত বৈশ্যা ও এক শত শূদ্রা। * * * দুর্ব্বাসার সেবা করায় তিনি বর দেন, প্রত্যেক ভার্য্যাতে, একটী করিয়া পুত্র ও একটী করিয়া কন্যা জন্মিবে, অধিকাংশ কন্যা যদুবংশীয়দিগকে সম্প্রদান করিয়া অবশিষ্ট কন্যাগুলি অন্যান্য নরপতির সঙ্গে বিবাহ দেন। (১)

হিন্দু জাতির শীর্ষস্থানীয় চন্দ্রবংশোজ্জ্বল পাণ্ডবগণ যেমন পঞ্চাল ও যদুবংশে বিবাহ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অনার্য্য নাগ বংশীয়া উলুপী এবং রাক্ষসী হিড়িম্বারও পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। রঘুবংশে লিখিত আছে যে শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশ এক নাগ কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অনেক জাতীয়া বহুবিধা স্ত্রী ছিল বলিয়া প্রকাশ। চন্দ্রগুপ্ত যবনরাজের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজপুত বংশীয় ললনাগণের সহিত দিল্লীর মোগল সম্রাটগণের বিবাহ হইয়াছে—কিন্তু তাহাতে রাজপুত জাতির জাতি নষ্ট হয় নাই।

মৃচ্ছকটিক নাটকের নায়ক চারুদত্ত গণিকা বসন্ত সেনাকে বিবাহ করিয়াও জাতিভ্রষ্ট হয়েন নাই এবং ব্রাহ্মণ শর্বিলক অন্যতর গণিকা

(১) "৺প্রতাপ রায়ের অনুবাদ (হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব্ব ৩৪৪ পৃষ্ঠা)।"

মদনিকাকে বিবাহ করিয়া জাতিচ্যুত হন নাই। কাব্য বা নাটকের বিষয় উড়াইয়া দিবার কাহারও অধিকার নাই। বরং পুরাণ সংহিতা অপেক্ষা নাটকে তাৎকালিক যুগের সামাজিক আচার ব্যবহার স্ফুটতর রূপে চিত্রিত রহিয়াছে। সমাজের নিখুঁত চিত্রই নাট্যকার তদীয় নাটকে সুরঞ্জিতরূপে চিত্রিত করিয়া থাকেন। তৎসময়ে এরূপ বিবাহ কোন দোষাবহ ছিল না এরূপ অনুমান করা অন্যায় হইবে না। ফলতঃ পূর্ব্বযুগে বিবাহ ব্যাপার এ কালের ন্যায় বাঁধাবাধি রীতিতে নিবদ্ধ ছিল না।

মনু নবম অধ্যায়ে বলিতেছেন :—

অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তাধম যোনিজা
শারঙ্গী মন্দপালেন জগামাভ্যর্হনীয়তাম্ ॥২৩॥
এতাশ্চান্যাশ্চ লোকেঽস্মিন্নপকৃষ্ট প্রসূতয়ঃ।
উৎকর্ষং যোষিতঃ প্রাপ্তাঃ স্বৈঃ স্বৈর্ভর্ত্তৃগুণৈঃ শুভৈঃ ॥২৪॥

(মনুসংহিতা, নবম অধ্যায়)

"নিকৃষ্টাকুলসম্ভূতা অক্ষমালা এবং পক্ষিনী শারঙ্গী ক্রমান্বয়ে ঋষি বশিষ্ঠ ও মন্দপালের সহিত উদ্বাহসূত্রে মিলিত হইয়া পরম মান্যা হইয়াছিলেন। উক্ত রমণীদ্বয় এবং সত্যবতী প্রভৃতি আরও কতকগুলি রমণী অপকৃষ্ট বংশীয়া বা অপকৃষ্ট যোনিজা হইলেও ভর্ত্তৃগুণে সবিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন।"

মনু অন্যত্র বলিয়াছেন :—

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যা মাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥২৩৮॥
স্ত্রিয়ো রত্নান্যথো বিদ্যা ধর্ম্মঃ শৌচং সুভাষিতম্।
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ ॥২৪০॥

(মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়)

"শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইতর লোকের নিকট হইতেও শ্রেয়স্করী বিদ্যা গ্রহণ করিবে। অতি অন্ত্যজ চণ্ডালাদির নিকট হইতেও পরম ধর্ম্ম লাভ করিবে এবং স্ত্রীরত্ন দুষ্কুলজাত হইলেও গ্রহণ করিবে।২৩৮। স্ত্রী, রত্ন, বিদ্যা, ধর্ম্ম, শৌচ, হিতকথা, এবং বিবিধ শিল্প কার্য্য সকলের নিকট হইতে সকলে লাভ বা শিক্ষা করিতে পারে।২৪০।" ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ আদিতে প্রাচীন-কালে একই পিতা কশ্যপ ঋষির সন্তান ছিলেন এবং নিজদিগকে পরস্পর সহোদর ভাই বলিয়াই জ্ঞান করিতেন,—পরস্পরের মধ্যে বিবাহ, আহার ও আদানপ্রদান স্বচ্ছন্দে চলিত। পরে যখন এই চারি শ্রেণীর মধ্য হইতে প্রেম ও ভালবাসা, প্রীতি ও মমতার ভাব তিরোহিত হইতে আরম্ভ হইল—তখনই পরস্পরের মধ্য হইতে আহার, পান ও বিবাহাদি প্রথা উঠিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে এই ভাব বদ্ধমূল হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। জ্ঞাতিত্ব ও স্বজাতীয়ত্ব বোধ চলিয়া যাওয়াতেই এবং পরস্পর স্নেহ ভালবাসা, মায়া মমতার অভাব হওয়াতেই এই সব সামাজিক ও জাতিগত পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা ভিন্ন বিবাহাদি না হইবার আর কোন কারণ নাই। ব্রাহ্মণাদি চারি-বর্ণের মধ্যে যে ভেদ ও ব্যবধান দেখা যাইতেছে—এ সবই কৃত্রিম ও মিথ্যা। এই মিথ্যা, অশাস্ত্রীয় কুলাচার ও দেশাচার ভাঙ্গিতে হইবে। বিবাহের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভাঙ্গিয়া আদানপ্রদানের সীমা বাড়াইতে ও প্রশস্ততর করিতে হইবে। আবার বৈদিক যুগ ফিরাইয়া আনিতে হইবে। বিবাহের স্বর্ণ-শৃঙ্খলে চারি বর্ণকে বাঁধিতে হইবে। রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, কুলিন, কাপ শ্রোত্রীয় প্রভৃতির মিথ্যা বেড়া ও কুসংস্কারের সনাতন প্রাচীর এই দণ্ডে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

আহার।

পরাশর স্মৃতিই কলিকালের ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। উক্ত শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে,—

ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যোবা ক্রিয়াবন্তৌ শুচিব্রতৌ
তদ্‌গৃহেষু দ্বিজৈর্ভোজ্যং হব্যকব্যেষু নিত্যশঃ॥

"যে সকল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ক্রিয়াবান্ এবং শুচিব্রতধারী তাঁহাদের গৃহে ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদা "হব্যে কব্যে" ভোজন করিবে।"

মনু আপস্তম্ব গৌতম প্রভৃতি শাস্ত্রকারদিগের মতামত উদ্ধৃত করিয়া ভারত গৌরব পরম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, এম, এ; পি, এইচ, ডি; সি, আই, ই, মহোদয় তাঁহার বিখ্যাত "ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস নামক ইংরাজী ভাষায় লিখিত পুস্তকে আহারাদি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মতামত রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—But in the olden times we see trom the Mahabharat and other works, that Brahmans, Kshatriyas and Vaisyas couid eat the food cooked by each other, Manu lays down generally that a twice-born should not eat the food coocked by a Sudra (IV 223);. but he allows that prepared by a Sudra, who has attached himself to one, or is one's barber, milkman, slave, family-friend, and co-sharer in the profits of agriculture, to be partaken (IV 253). The implication that lies here is that the

three higher castes could dine with each other. Gautama, the author of Dharmasutra, permits a Brahman's dining with a twice-born (Kshatriyas or Vaisyas) who observes his religous duties (17, 1,). Apastamba, another writer of the class, having laid down that a Brahman should not eat with a Kshatriya and others, says that according to some, he may do so with men of all the varnas, who observe their proper religious duties, except with the Sudra. But even here there is a counter-exception, and as allowed by Manu, a Brahman may dine with a Sudra, who may have attached himself to him with a holy intent (1-18. 9. 13. 14.)

বর্ত্তমান সময়ে আহারাদি সম্বন্ধে যেরূপ আঁটাআঁটী ভাব দেখা যায়, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। ভাণ্ডারকার মহাশয়ই এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত এলফিনষ্টোন সাহেব তৎকৃত "ভারত ইতিহাসের ২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—But there is no prohibition in the code against eating with other classes or partaking of food cooked by them (which is now the great occasion for loss of caste), except in the case of Sudras; and even then the offence is expiated by living on water-gruel for seven days (Ch. XI, 153)

পুনর্ব্বার ভাণ্ডারকার মহাশয় মান্দ্রাজের হিন্দুসমাজ সংস্কার সমিতির অধিবেশনে বলিয়াছেন—"Even in the time of the epics, the Brahmans dined with the "Kshatriyas and Vaisyas, as we see from the Brahmanic—sage Durvasa, having shared the hospitality of Draupadi, the wife of Pandavas,

প্রাচীন আর্য্যসমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এবং শেষে কখন কখনও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের ভিতর আহারাদি চলিত। তৎকালে ক্ষত্রিয় রাজগণ যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং ব্রাহ্মণগণও সেই সকল যজ্ঞস্থলে উপনীত হইয়া আনন্দের সহিত ভোজন করিতেন। মহাভারত পাঠে জানিতে পারা যায় যে পাণ্ডবদিগের বনবাস কালে স্বয়ং দ্রৌপদী রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইতেন। সকলেই অবগত আছেন যে প্রাচীনকালে বৈশ্য সুপকার ছিল। বিরাট রাজভবনে ভীম নিজকে সুপকার বলিয়া পরিচয় দান করতঃ উক্ত কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া অজ্ঞাতবাস সমাপ্ত করেন। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এক সময় বলিয়াছিলেন, "রন্ধনাদির কার্য্য কেন ব্রাহ্মণের হইতে যাইবে। রন্ধনের কার্য্য হইতেছে চাকর-বাকরের কার্য্য।" বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুজাতির যদি কোনও গৌরব করিবার কিছু থাকে, তবে তাহা খাদ্যাখাদ্য বিচার ও স্পর্শদোষ ভীতি। পৃথিবী পূজিত কোনও মহাপুরুষ একদিন বলিয়াছিলেন,—"জ্ঞানমার্গ কর্ম্মমার্গ ভক্তিমার্গ সব পলায়ন এখন আছেন কেবল ছুৎমার্গ, কেবল আমায় ছুঁওনা আমায় ছুঁওনা—পৃথিবীর সব অপবিত্র কেবল আমিই পবিত্র। হিন্দুর ব্রহ্ম এখন ব্রহ্মলোকেও নাই, গোলকেও নাই—মুনি ঋষির হৃদয়কন্দরেও নাই, উপাসনা তপস্যাতে নাই, ব্রহ্ম এখন রান্নাঘরে, ব্রহ্ম এখন ভাতের হাঁড়িতে।" হিন্দুসমাজ রসাতলে গিয়াছে, পাপে যে ডুবিয়াছে তবুও কপটতা ছাড়িতে পারিতেছে না। কত সমাজশিরোমণি নেতা মহাশয়কে দেখিতেছি, যাঁহারা নিশাকালে নিম্নশ্রেণীর রক্ষিতা নারীর গৃহে গোপনে স্বচ্ছন্দে তাহার তৈয়ারী খাদ্য আহার করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতেছেন ও বাটী আসিয়া বিলাতযাত্রীর প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা লিখিয়া দিতেছেন। কত সমাজপতিকে দেখিতেছি যাঁহারা ষ্টিমারে স্বচ্ছন্দে বাবুর্চ্চির প্রস্তুত মুরগীর মাংস দিয়া আহার করিতেছেন ও বাটী আসিয়া মুখ মুছিয়া দুর্ব্বল স্বজাতীয়

ভ্রাতাকে সামান্য অপরাধের জন্য সকলে মিলিয়া এক ঘরে করিয়া রাখিতেছেন এবং বিলাত ফেরতের কিছুতেই প্রায়শ্চিত্ত নাই বলিয়া বক্তৃতা করিতেছেন। এমন ভদ্রলোক বা তথা কথিত বিদ্বানের নাম শোনা যায় না, যাঁহার শুড়ির অন্নে প্রস্তুত সুরা দেবীর আরাধনায় তৎপর নহেন।

যাঁহারা মদ্যপান করেন না, তাঁহারা তাঁহাদিগের নিকট ভদ্র আখ্যাধারীই নহেন। শতকরা দশজন ভদ্রনামধারী লোককে আমরা এ কার্য্যে প্রতিনিবৃত্ত দেখিলেই সমাজকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হইতেছি। অথচ ইহাঁরাই দেশনেতা, সমাজপতি, বিধি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাদাতা, সমাজের সর্ব্বে সর্ব্বা। চরিত্রবান্ ব্যক্তি যে সমাজে একেবারেই নাই, ইহা বলা অবশ্য আমার উদ্দেশ্য নহে। যাঁহারা আছেন তাঁহারা দেবতা-স্থানীয়, তাঁহাদের জন্যই সমাজ জীবিত আছে। কিন্তু হায়! সংখ্যায় ইহারা কত সামান্য কত অল্প! সাধে কি হিন্দুসমাজের এই দুর্দ্দশা? উপরে একজন আছেন, তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া চলিবার উপায় নাই। তুমি বড় লোক, তোমার ধন আছে, ঐশ্বর্য্য আছে, সুতরাং তোমার আর ভয় কি? ব্যবস্থাপক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তোমার অখণ্ড মণ্ডলাকারং রজত খণ্ডের দাস; মনু স্মৃতি তোমার অর্থের লালসায় তটস্থ। আর আমি দীনহীন, যত বিধি ব্যবস্থা সব আমার জন্য, পান থেকে চুন টুকু খসিয়া গেলে আর আমার নিস্তার নাই, সকলে মিলিয়া আমাকে এক ঘরিয়া করিয়া রাখিবে। দুর্ব্বলের প্রতি যে জাতির প্রাধান্য বিস্তারে চেষ্টা ও বলবানের কুক্কুরবৎ পদলেহনে যে জাতির আগ্রহ, সে জাতির পতন হইবে না ত কোন্ জাতির পতন হইবে? দেশের জন্য, জাতির জন্য, সমাজের জন্য যাহারা কর্ত্তব্যের গুরুভার ও মনুষ্যত্ব লাভাশার বিজয় মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া উত্তাল-তরঙ্গমালা-বিক্ষুব্ধ সাগরাম্বু রাশির গভীর গর্জ্জনের মধ্য দিয়া বিদেশে অজানিত রাজ্যে উপনীত হইয়া বিদ্যা:জ্ঞান

অর্জ্জনপূর্ব্বক মাতৃভূমিকে গৌরবান্বিত করিয়া দেশে ফিরিয়া আইসেন, তাঁহাদিগকে আমরা কোল পাতিয়া বাহু প্রসারণ করিয়া সাদরে সমাজে টানিয়া লইবার পরিবর্ত্তে দূর দূর করিয়া সরাইয়া দিতেছি আর যাহারা ইন্দ্রিয় পরবশ হইয়া বারবণিতালয়ে মদ্যপান ব্যভিচারে অস্পর্শীয়াগণের স্পৃষ্ট খাদ্য আহারে সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে—সমাজের আদর্শ ধ্বংস করিতেছে, কুদৃষ্টান্ত দেখাইয়া পরবর্ত্তী বংশধরগণের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, তাহাদিগকে আমরা পরম সমাদরে সমাজপতি বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। পুণ্যকে তাড়াইয়া দিয়া পাপকে ডাকিয়া আনিতেছি, ধর্ম্মকে বিদায় দিয়া অধর্ম্মকে গৃহে তুলিতেছি, দেবতাকে ত্যাগ করিয়া দানবকে পূজা করিতেছি। এ সমাজের পতন হইবে না ত কোন্ সমাজের পতন হইবে। কিন্তু ভগবান্‌কে ধন্যবাদ, দেশের জলবায়ু ফিরিয়াছে, ভগবান্ বহুকষ্ট দিয়া—বহুশিক্ষা দান করিয়াছেন। দেশের সৌভাগ্য, দেশবাসী এখন তাহাদের কল্যাণ অকল্যাণ ভালরূপেই বুঝিতে পারিতেছে। দিন দিন নূতন নূতন সম্প্রদায় সৃষ্ট হইতেছে, রঘুনন্দনকে রম্ভা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রতি বৎসর দলে দলে যুবকগণ বিদেশ গমন করিতেছেন ও যাঁহারা প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন দেশের আশাস্থল যুবকগণ তাঁহাদিগকে আদরে হৃদয়মন্দিরে গৃহে গৃহে টানিয়া লইতেছে। এ মতের পরিবর্ত্তনে বৃথা শক্তি ক্ষয় করিয়া লাভ নাই, হিমালয় হইতে যে নদী সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে অর্দ্ধপথে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করা মূর্খের কার্য্য ভিন্ন কিছুই নহে। হিন্দুসমাজপতিগণ! আপনাদিগকে করযোড়ে বিনীতভাবে বলিতেছি আর বিলম্ব করিবেন না—দ্রুতবেগে ভগবৎআদিষ্ট পথে রওনা হইয়া আসুন—পুষ্প চন্দন লইয়া বিদেশ প্রত্যাগমনকারিগণকে গৃহে তুলিয়া লউন, নচেৎ দেশের সম্মান হইতে বঞ্চিত হইবেন। ভগবানের আদেশ লঙ্ঘনরূপ মহাপাপে পাতকগ্রস্ত হইবেন, প্রতি পদে অপমান লাঞ্ছনা

ভোগ করিতে হইবে, যতই বিলম্ব করিবেন মুখ দেখান ততই ভার হইয়া উঠিবে। মনে হয় শুধু আহার বিষয়ক বিধি ব্যবস্থাই হিন্দুজাতির উন্নতি মার্গের অর্গলস্বরূপ হইয়াছিল। খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিতে করিতেই দেশটা অধঃপাতে গেল। শাস্ত্রে কত উদার মত আছে কিন্তু সমাজ শাস্ত্রানু-মোদিত পথে পরিচালিত হইতেছে না বলিয়াই সমাজের এ দুরবস্থা। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ দেশাচার ও লোকাচারের দাস হইয়া পড়িয়াছে। শাস্ত্রের দোহাই দেওয়াও বৃথা। লোকাচারের অনুকূল মত যে কোন সংস্কৃত ছন্দেও কবিতায় আছে—উহাই শাস্ত্র উহাই বেদ উহাই ধর্ম্ম উহাই পালনীয়। যিনি উহার প্রতিবাদ করিবেন, তিনিই ধর্ম্মভ্রষ্ট নাস্তিক পাষণ্ড সমাজ বিপ্লবকারী বলিয়া অভিহিত হইবে। মনুসংহিতায় চতুর্থ অধ্যায়ে আছে :—

আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপাল দাস নাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥
২৫৩ শ্লোক, মনু।

"যে যাহার কৃষিকর্ম্ম করে, যে পুরুষানুক্রমে আপন বংশের মিত্র, যে যাহার গো পালন করে, যে যাহার দাস্যকর্ম্ম করে ও যে যাহার ক্ষৌরকর্ম্ম করে,—শূদ্রের মধ্যে ইঁহাদিগের অন্ন ভোজন করা যায় এবং যে যাহার নিকট আত্ম সমর্পণ বা নিবেদন করিয়াছে, তাহারও অন্ন ভোজন করা যায়।

বিষ্ণু এবং যাজ্ঞবল্ক্যও ঐ কথাই বলিতেছেন :—

শূদ্রেষু—দাস গোপাল কুলমিত্রার্দ্ধ সীরিণঃ।
ভোজ্যান্না নাপিত স্তৈব যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥ ১৬৮। যাজ্ঞবল্ক্য।

পরাশর এবং যমসংহিতাও সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছেন :—

"দাস নাপিত গোপাল কুলমিত্রার্দ্ধ সীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥
২০ শ্লোক যমসংহিতা। পরাশরসংহিতা ২০ শ্লোক।

এইত শাস্ত্রের মত উদ্ধৃত করিলাম। এক্ষণে হিন্দুসমাজ কি এই বিধি মানিতে প্রস্তুত আছেন? ইহাদ্বারা বেশ অনুমিত হয় হিন্দুসমাজ আর শাস্ত্র কথিত পথে চলিতেছে না—লোকাচার স্ত্রীআচার দেশাচার তাহাকে যেমন চালাইতেছে—যেমন নাচাইতেছে সে তেমনি চলিতেছে, তেমনি নাচিতেছে। শাস্ত্রীয় মত অধিক প্রদর্শন করা বাহুল্য মাত্র। অধিক দিনের কথা নহে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে মহাত্মা নিত্যানন্দ দেব সপ্তগ্রামে সুবর্ণবণিক বংশীয় উদ্ধারণ দত্তের গৃহে তৎকর্ত্তৃক প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন ও সকলে মিলিয়া মহোৎসব করিয়াছেন। এসম্বন্ধে ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবনদাস গোস্বামী তৎকৃত শ্রীচৈতন্যভাগবতে এইরূপ লিখিয়াছেন—"উদ্ধারণ দত্তকে সঙ্গে লইয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অম্বিকানগরে উপনীত হইয়াছেন। তথায় সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা বসুধাদেবীকে বিবাহ করার প্রস্তাব উথাপন করিলে কুলাচার্য্যগণ তাঁহার পরিচয়—আহারাদি কিরূপে সম্পাদিত হয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রশ্ন :—"শ্রীপাদের নিতি নিতি ভিক্ষা আয়োজন।
স্বপাক করহ কিম্বা আছয়ে ব্রাহ্মণ?

উত্তর :—প্রভু কহে কখন বা আমি পাক করি।
না পারিলে উদ্ধারণ রাখয়ে উতারি॥
এই মত পরিবর্ত্ত রূপে পাক হয়।
শুনিয়া সবার মনে লাগিল বিস্ময়॥

প্রশ্ন :—তারা কহে এ বৈষ্ণব, হয় কোন জাতি।
পূর্ব্বাশ্রমে কোন্ নাম, কোথায় বসতি॥

উত্তর :—প্রভু কহে ত্রিবেণীতে বসতি উহার।
সুবর্ণ বণিক দেখি, করিনু স্বীকার॥

বৈশ্য কুলেতে জন্ম, হয় সদাচারী।
এজন্য উহার অন্ন, ঘৃণা নাহি করি॥
* * *
সেই দিন হইতে নিত্য নিত্য মহোৎসব
আসিয়া মিলয়ে যত আত্ম বন্ধু সব॥
প্রভু আজ্ঞামতে দত্ত করয়ে রন্ধন।
নিত্য নিত্য শত শত ভুঞ্জয়ে ব্রাহ্মণ॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

পুরাণ সংহিতা মহাভারত ও ইতিহাস হইতে আমরা এইরূপ প্রমাণ আরও প্রদর্শন করিতে পারিতাম কিন্তু বাহুল্যভয়ে নিবৃত্ত থাকিলাম। আপনাদের মধ্যে সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন যে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য ত্রৈলিঙ্গস্বামী বিশুদ্ধানন্দস্বামী ভাস্করানন্দস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষগণ নিম্ন-শ্রেণীস্থ হিন্দুজাতীর অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন। আধুনিক কালের দয়ানন্দ সরস্বতী, পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী, রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইউরোপ ও আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারক স্বামী রামতীর্থ, স্বামী বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীমৎ প্রেমানন্দভারতী প্রভৃতি ভারতের উজ্জ্বল মণি স্বরূপ মহাপুরুষগণ খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে সঙ্কীর্ণমত পরিত্যাগপূর্ব্বক উদার মতই পোষণ করিয়া গিয়াছেন। জগতের কোন মহাপুরুষই বলেন নাই যে, "অমুকে নীচ জাতীয়—অমুকের হাতে অন্ন পানীয় গ্রহণ করিলে আমার জাত যাইবে ও স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ হইয়া আসিবে।"

ফলতঃ বর্ত্তমান কালের ন্যায় বিবাহ আহারাদি ও খাদ্যাদি গ্রহণ বিষয়ে এরূপ আঁটাআঁটি ও গোঁড়ামি ভাব এবং সঙ্কীর্ণ নীতি প্রাচীন আর্য্যদিগের

সময়ে কখন ছিল না। ইতঃপূর্ব্বে আমরা তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি। পরবর্ত্তী যুগে যখন ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রগণকে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিল, যখন পরস্পরের মন হিংসার হলাহলে জর্জ্জরীত হইয়া উঠিল, বিদ্বেষের ভীষণ বহ্নি যখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মনে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল তখন হইতেই চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে বিবাহাদি ও আহারাদির নিয়ম উঠিয়া গেল। (১) বর্ত্তমান সময়ে আমরা কি দেখিতে পাই? নিতান্ত শত্রুতাভাব দ্বেষাদ্বেষী হিংসা-হিংসি না থাকিলে পরস্পরের মধ্যে আহার ও বিবাহ সম্বন্ধ রচিত হয় না! দুই বা ততোধিক দলের মধ্যে যখন মনান্তর উপস্থিত হয়, যখন কোন কারণে প্রবল বৈরভাব জন্মিয়া উঠে তখন তাহারা পরস্পরের মধ্যে আহারাদি ও বিবাহ সম্বন্ধ বন্ধ করিয়া দেয়। পরস্পরের মধ্যে খাওয়া দাওয়া ও বিবাহ সম্বন্ধ বিশেষ প্রণয় ও সদ্ভাবের চিহ্ন। যেখানে সদ্ভাব নাই ভালবাসা নাই প্রণয় প্রীতি নাই বন্ধুত্ব অনুরাগ নাই, সেখানে কেহ আহারাদি ও বিবাহাদি করে না। আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, দুইখানি গ্রামের মধ্যে বিরোধ—দলাদলি বা অসদ্ভাব উপস্থিত হইলে, তাহাদের মধ্যে খাওয়া দাওয়া ও বিবাহ সম্বন্ধ উঠিয়া যায়। প্রাচীনকালে অর্থাৎ আর্য্যদিগের পরবর্ত্তী সময়ে বা সংহিতাদিযুগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণের মধ্যেও এই কারণেই আহার বিহার ও বিবাহাদি আদান প্রদান রহিত হইয়া গিয়াছিল। এই চারি শ্রেণীর মধ্যে পরস্পরের মধ্যে কেমন করিয়া ধীরে ধীরে ঘৃণা অসূয়া বিদ্বেষ অসদ্ভাব বিরোধ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, পরে আমরা তাহা বিষদরূপে আলোচনা করিয়াছি। পাঠকগণ সপ্তম অধ্যায়ে তাহা দেখিতে পাইবেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন,—"এমন কি খুব আধুনিক শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহেও বিভিন্ন জাতির একত্র

(১) বিস্তৃত বিবরণ মল্লিখিত "জলচল ও খাদ্যাখাদ্য বিচার" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

ভোজন নিষিদ্ধ হয় নাই, আর প্রাচীনতর গ্রন্থসমূহের কোথাও বিভিন্ন জাতিতে বিবাহ নিষিদ্ধ হয় নাই।” (১)

যাঁহারা শুচি-ধর্ম্মের নামে স্বীয় পরিণীতা অর্দ্ধাঙ্গিনী সহধর্ম্মিণীর হাতে পর্য্যন্ত খান না—তাঁহাদিগকে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। তাঁহারা সংসারের বাহির, সমাজের বাহির। তাঁহারা মনে করেন, খাদ্যদ্রব্য অন্যকে ছুঁইতে না দেওয়ার মত ধর্ম্ম নাই। ইঁহারা ছুঁৎরোগগ্রস্ত। কিন্তু যাঁহাদিগকে জীবনসংগ্রামে কর্ম্মের তাড়নায় সারা ভারতবর্ষ বা সমগ্র বিশ্ব পর্য্যটন করিতে হয়—তাঁহাদিগকে ত ছোঁয়া-ছুঁয়ির বাড়াবাড়ি করিলে চলে না। ছোঁয়া-ছুঁয়ির ধর্ম্ম বাড়ীতে বসিয়া থাকিলে চলিতে পারে। সমাজপতিনামক শাস্ত্রব্যবসায়ীগণের কর্ত্তব্য—খাদ্যাদি গ্রহণ সম্বন্ধে উদার মত পোষণ করা। অনুদার ব্যবস্থাদাতাকে এ যুগে আর কেহ মানিবে না। যাঁহারা বিদেশে যাইতেছেন—তাঁহারা কেহই পাঁতি লইবার জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের দুয়ারে ধন্না দিতেছেন না। দেখিতে হইবে—খাদ্যবস্তুগুলি যেন হিন্দুর জাতীয় বৈশিষ্ট্য ধ্বংস না করে; অখাদ্য যেন কোন হিন্দু না খান। সব জাতিই যেমন খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে নিজ নিজ জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলে, হিন্দুকেও তাহার জাতীয় বিশিষ্টতা ত্যাগ করিলে চলিবে কেন? ভারতে মুক্তির হিল্লোল বহিয়াছে। এ সময় কোন প্রকার অনুদার বিধি নিষেধের দোহাই দিলে কেহ তাহা মানিবে না। ভারত তর তর বেগে উন্নতির পথে ছুটিয়াছে—এ সময় পশ্চাৎ দিক হইতে ছোঁয়া-ছুঁয়ির বিধি নিষেধ দিলে কেহই তাহা শুনিবে না—লাভের মধ্যে শাস্ত্র ও শাস্ত্রব্যবসায়ীগণের প্রতি অশ্রদ্ধা বাড়িবে মাত্র।

(১) উদ্বোধন; ১১শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

জাতিভেদোৎপত্তির কারণ।

জাতিবিভাগের কারণ সম্বন্ধে বিশ্বকোষসম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস"এ এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

"সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় মানবগণ সংখ্যায় অতি অল্প ছিল, যখন জীবিকার চিন্তা ছিল না, সুজলা সফলা শস্য-শ্যামলা মেদিনী প্রচুর আহার সামগ্রী যোগাইতেন, হিংসা দ্বেষ লোভ যখন মানবকে স্পর্শ করিতে পারে নাই যখন সত্যভাষী সরল মানব কেবল স্বভাবজাত ফল-মূলাহারে পরিতৃপ্ত হইত, মানবের সেই সুখ শান্তির যুগে সমাজবন্ধনের কোনও প্রয়োজন হয় নাই।

সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে উচ্চনীচ ক্রমে শ্রেণী বা বর্ণ বিভাগেরও আবশ্যকতা ছিল না। এই কারণে একদিন মহর্ষি ভরদ্বাজ এইভাবে ভৃগুকে বলিয়াছিলেন—"বর্ণ সকলের ইতর বিশেষ নাই। পূর্ব্বে যখন ব্রহ্মা সৃষ্টি করিলেন তখন সমস্তই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। সৃষ্টির প্রথম যুগই পুরাণেতিহাসে সত্যযুগ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সত্যযুগের যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই আর্য্যজাতির আদিম অবস্থার পরিচয়।"

"যখন মহাভারত ও রামায়ণে ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি স্থিরীকৃত হইয়াছে, তখন উভয় গ্রন্থেই স্বীকার করিতে হইবে সত্যযুগে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি হয় নাই, কেবল ব্রাহ্মণই ছিলেন। বেদোচ্চারণ রূপ মুখের কার্য্যই ব্রাহ্মণের মুখ্য ধর্ম্ম, তাই ব্রাহ্মণ বিরাট পুরুষের মুখ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিলেন।"

"যখন পূজ্যপাদ আর্য্যগণ, হিমালয়ের তুষার শিখর পরিত্যাগ করিয়া ভারতের সমতল ভূমিতে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা রাজসোদ্রিক্ত হইয়া রাজ্য বিস্তার, বলবীর্য্য সঞ্চার ও সাত্বিক বেদস্তোতাগণের রক্ষা বিধানে অগ্রসর হইলেন তাঁহারাই শেষে "ক্ষত্রিয়" উপাধি লাভ করিলেন। পুরাণেতিহাসে সেই সময়ই ত্রেতাযুগ নামে বর্ণিত হইয়াছে। ওজঃ বা বীর্য্য রজোগুণের পরিচায়ক। তাই পুরাণে ক্ষত্রিয়ের রক্তবর্ণতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাহুর কার্য্যই ক্ষত্রিয়ের মুখ্য, তাই ক্ষত্রিয় বা রাজন্য বিরাট পুরুষের বাহু বা বাহুজ বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন।

"ঋক্‌সংহিতার অনেক মন্ত্রেই বিশ্‌ বা বৈশ্যের উল্লেখ আছে। কিন্তু ঐ সকল স্থানে বিশ্‌ শব্দের অর্থ প্রজা সাধারণ;—উহা জাতিবাচক অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। বাস্তবিকই বেদ সংহিতার পুরুষসূক্ত ব্যতীত আর কোথাও জাতিবাচক বৈশ্য শব্দের উল্লেখ নাই। এতদ্দ্বারা অনুমিত হয়, যে সময়ে সেই মন্ত্রসমূহ ঋষিগণের হৃদয়াকাশে সমুদিত হইয়াছিল তখনও বৈশ্য নামক এক বিভিন্ন জাতি সমাজবদ্ধ হয় নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ পাঠে স্পষ্ট বোধ হইবে, যাহারা কৃষি গোরক্ষা সুজল ধন ও ধান্যের উপায় সর্ব্বদা চিন্তা করিত তাহারাই বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হইল। বেদস্মৃতি ও পুরাণের বর্ণোৎপত্তি প্রকরণ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে মনে হইবে, মন্ত্র ও স্তোত্র পাঠ এবং যাগ ও যজ্ঞাদিতে যাঁহারা নিরত থাকিতেন তাঁহারা বা তাঁহাদের সন্তানেরা ব্রাহ্মণ। যাঁহারা যাগ যজ্ঞাদির উৎসাহদাতা, ব্রাহ্মণের রক্ষাকর্ত্তা, রাজ্য ও জনপদের অধিকারী ও বলবীর্য্যশালী, তাঁহারাই ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের সুখ শান্তির জন্য যাঁহারা কৃষি দ্বারা শস্যাদি উৎপন্ন করিতেন, পশ্বাদি পালন করিতেন ও ধন দ্বারা রাজার অভাব পূরণে চেষ্টা করিতেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ

বৈশ্য নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের পূর্ব্বভাগে ৮ম অধ্যায়ে বৈশ্যবর্ণের স্বরূপ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"যাঁহারা ক্ষত্রিয়গণের আশ্রয়ে নির্ভরশীল হইয়া কেবল মাত্র সর্ব্বভূতেই ব্রহ্ম বিদ্যমান, এইরূপ চিন্তায় দিনপাত করিতেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ; তাঁহাদের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, বৈশস কর্ম্মে নিযুক্ত কৃষকরূপে যাহারা অনিষ্ট উৎপাদন (?) করিত এবং ভূমি সম্বন্ধে যাহারা কার্য্যকারী হইয়াছিল, তাহারাই বৃত্তিসাধক কৃষক বৈশ্য। বৈশ্যে রজঃ ও তমোগুণের একত্র সংযোগ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও শূদ্র উভয়ের ভাব বিদ্যমান। বৈশ্যের প্রধান অবলম্বন কৃষি। শস্য পরিপক্ক হইলেই তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি ও কামনা পূর্ণ হয়। এই জন্য পরিপক্ক শস্যের রূপ পীতবর্ণই হিন্দুশাস্ত্রে বৈশ্যের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।"

"ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে পাওয়া যাইতেছে, গুণ কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণের মধ্য হইতেই বৈশ্য জাতি উৎপন্ন হয়। পুরাণাদি পাঠে বোধ হয় ত্রেতাযুগের শেষ ভাগে ও দ্বাপর যুগের প্রথমে বৈশ্যসমাজ গঠিত হইয়াছিল। ব্রহ্মাণ্ড বিষ্ণু প্রভৃতি মহাপুরণে দ্বাপর যুগের যে সকল লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে বৈশ্য সমাজের ছবিই প্রকটিত হইয়াছে। কৃষ্যাদি লোক—জীবিকার হেতু বৈশ্য (বৈশ্যের লোক জীবিকার হেতু কৃষি আদি), উরুই তাহাদের প্রধান অবলম্বন, সেই জন্যই বৈশ্য বিরাট পুরুষের উরুদেশজাত এইরূপ কল্পিত হইয়াছিল।"

"পুরাণে ইতিহাসে বৈশ্যসমাজ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই শূদ্রোৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ নির্দ্দেশ করিতেছেন"—

"পূর্ব্বে যে সকল ব্রহ্মোৎপন্ন সিদ্ধাত্মা মানবগণের বিষয় কথিত হইয়াছে, তাঁহারাই ত্রেতাযুগে পূর্ব্বজন্মের শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগের জন্য যথাক্রমে শান্তচিত্ত, তেজস্বী-কর্ম্মী ও দুঃখী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও

শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম পুত্রগণ চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত হইলেন।"

"দ্বিজাতির পদসেবাই শূদ্রের মুখ্য ধর্ম্ম—তাই শূদ্র বিরাট পুরুষের পাদজ বলিয়া কল্পিত হইলেন।"

চতুর্ব্বর্ণের বিভাগ সম্বন্ধে আগ্রার নিম্ন আদালতের বিচারপতি শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর লালা বৈজিনাথ বি, এ, তাঁহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত সুবিখ্যাত গ্রন্থ "Fusion of subcastes in India"য় লিখিয়াছেন :—

The Vedas and the Epics carry us back to the good old days of India, when there were no castes and the whole world consisted of Brahmans only. Created equally by Brahma, men have in consequence of their acts, become fond of indulging their desires and were addicted to pleasure and were of a severe and wrathful disposition, endowed with courage and unmindful of piety and worship * * * * * those Brahmans possessing the attribute of Rajas (passion) became possessed of the attributes of goodness (satwa) and passion and took to the practice of rearing of cattle and agriculture, became Vaisyas. Those Brahman again, who were addicted to untruth and injuring others and engaged in impure acts and had fallen from purity of behaviour on account of possessing the attribute of darkness (tamas) became Sudras. Separated by occupation, Brahmans became members of the other three orders (Mahabharata, Mokha Dharma, Chap. 118). "Neither birth, nor study nor learning constitutes Brahmanhood, character alone constitutes it. (Mahabharata,—Van Parva—Chap. 313 Vers 103.)

জাতিভেদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের একটা সিদ্ধান্ত মনে ধারণা হইয়াছে—আমরা নিম্নে তাহা যথাযথ লিপিবদ্ধ করিতেছি। পূর্ব্বে আর্য্যগণ একবর্ণ ও এক জাতীয় ছিলেন। আদিম অধিবাসী অনার্য্যগণের সহিত তাঁহাদিগের বহুবর্ষব্যাপি সংগ্রাম চলিয়াছিল। তাঁহাদের প্রায় সকলেই অনার্য্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া দিবাবসানে ক্লান্তশ্রান্ত অবসন্ন দেহে যুদ্ধ সমাধা করণান্তর গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইতেন।

গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেও ক্লান্তি অপনোদনকারী কোনও দাস দাসী বা চাকর বাকর তখন ছিল না— কেননা পূর্ব্বেই বলিয়াছি তখন জাতিভেদ হয় নাই সকলেই একজাতীয় ছিলেন। কেবা হস্তপদ প্রক্ষালনের জল, বসিবার আসনাদি প্রদান করিবে, কেবা তাল বৃন্তে ব্যজন করিয়া ক্লান্তি আপনোদন করিবে, কেবা খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিবে, রন্ধনের উপাদানাদিই বা কে প্রস্তুত করিয়া দিবে, বহুবর্ষব্যাপি যুদ্ধের খরচ পত্রই বা কিরূপে নির্ব্বাহিত করিবে, বিজিত ভূমিখণ্ড চাষ আবাদ করিয়া কেই বা শস্য উৎপাদন করিবে, যুদ্ধের ও দৈনন্দিন জীবনের অস্ত্রশস্ত্র আসবাব আদিই বা কে প্রস্তুত করিবে—অধিকৃত জনপদই বা কিরূপে শাসিত হইবে—ইত্যাদি বিষয় আলোচনা ও ইতি কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের জন্য তাঁহারা সকলে একত্র সমবেত হন। তখন সর্ব্বসম্মতিক্রমে গুণ, কর্ম্ম ও শক্তি অনুযায়ী তাঁহারা নিজেরাই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। আর্য্যগণের মধ্যে যাঁহারা ধীশক্তিসম্পন্ন মেধাবী মন্ত্রণাকুশল তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন অথচ শারীরিক শক্তিতে দুর্ব্বল ও যুদ্ধকার্য্যে অপটু ছিলেন তাঁহারা এক শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন, এই শ্রেণীর নাম হইল ব্রাহ্মণ।

ইঁহারা যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি কর্ম্মে ব্যাপৃত ও অন্য তিন বর্ণের পরামর্শদাতা হইলেন। অবশিষ্ট আর্য্যগণের মধ্যে যাঁহারা যুদ্ধ বিদ্যাবিশারদ মহাবলশালী কষ্টসহিষ্ণু অনলস মহাবীর্য্য সম্পন্ন তাঁহারা

পৃথক এক শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। অনার্য্যদিগের সহিত সংগ্রাম করা, অধিকৃত জনপদ শাসন করা, অপর তিন শ্রেণীকে রক্ষা করা ইহাঁদের কার্য্য হইল ইহাঁরা ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হইলেন। অবশিষ্ট আর্য্যদিগের মধ্যে যাঁহারা তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন বা প্রচুর বলশালী নহেন, যুদ্ধে ভীত অথচ শিল্পকার্য্যে ও ব্যবসা-বুদ্ধিতে সুনিপুণ, কৃষিকার্য্যে দক্ষ, বাণিজ্যপটু তাঁহারা এক শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন—ইঁহাদের নাম হইল বৈশ্য। কৃষিকার্য্য দ্বারা শস্য উৎপাদন, ধন সম্পদ যুদ্ধোপকরণ টাকাকড়ি দ্বারা তিন শ্রেণীকে প্রতিপালন, গোরক্ষা, নানাবিধ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করা ইঁহাদের কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। অবশিষ্ট যাঁহারা রহিলেন তাঁহারা স্বভাবতঃই ধীসম্পদে দরিদ্র, শক্তি সামর্থ্যহীন, যুদ্ধে অসমর্থ ও অনভিজ্ঞ, অর্থ উপার্জ্জনে ব্যবসা-বাণিজ্যে শিল্পদ্রব্যাদি প্রস্তুতকরণে অক্ষম তাঁহারা আর কি করিবেন,—উল্লিখিত তিন শ্রেণীর পরিচর্য্যা ও সেবা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া শূদ্র বলিয়া কথিত হইলেন।

এইরূপ ভাবে সর্ব্ব জাতির সুখ সুবিধা শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী জাতি বিভাগ করিয়া আর্য্যগণ অত্যল্পকাল মধ্যেই এক অমিত পরাক্রমশালী জাতিরূপে পরিগণিত হইলেন। ব্রাহ্মণ সর্ব্ববিষয়ে উক্ত তিন শ্রেণীর পরামর্শদাতা হইলেন। তাঁহাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধন উদ্দেশ্যে ঈশ্বর আরাধনা নানা প্রকার যাগযজ্ঞ ক্রিয়া-কলাপ সম্পাদন করিতে লাগিলেন, যুদ্ধ বিষয়ে ক্ষত্রিয়গণকে সদুপদেশ দিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়-গণ আবার অপর পক্ষে নিশ্চিন্তচিত্তে অনার্য্যগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে পরাজয়পূর্ব্বক দিন দিন নব নব রাজ্য স্থাপন এবং ব্রাহ্মণ বৈশ্য ও শূদ্রগণকে সর্ব্বপ্রকার বহিঃ শত্রু হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। রক্তদান ও জীবনদান করিয়া তিন শ্রেণীকে রক্ষা এবং সাম্রাজ্যবৃদ্ধির ভার তাঁহারাই গ্রহণ করিলেন। বৈশ্য শ্রেণীও খাদ্য, ধনৈশ্বর্য্য, যুদ্ধোপকরণ,

অস্ত্র, শস্ত্রাদি নানাবিধ শিল্পদ্রব্য বাণিজ্যাদি দ্বারা তিন শ্রেণীকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও শূদ্রগণের যাবতীয় অভাব অভিযোগ পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন। ইঁহারা তিন শ্রেণী দ্বিজবর্ণান্তর্গত হইলেন। পরবর্ত্তী শূদ্র সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের সেবা কার্য্যে নিযুক্ত হইলে তাহাদিগের রক্ষার ভার আহারাদি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভার প্রতি-পালনের ভার ভরণ-পোষণের ভার উল্লিখিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শ্রেণী গ্রহণ করিলেন। ইঁহারা কোনও শ্রেণী কোনও শ্রেণীকে ঘৃণা বা বিদ্বেষের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন না। কেননা ইঁহারা নিজেরাই এমন ভাবে বিভক্ত হইয়াছিলেন যে ইঁহাদের কোনও শ্রেণীর সাহায্য ব্যতীত কোনও শ্রেণীর চলিবার উপায় ছিল না।

ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণকে বাদ দিয়া ব্রাহ্মণের জীবন বা জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় ছিল না, ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণ বৈশ্য বা শূদ্র শ্রেণীর সহায়তা ব্যতীত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা অসম্ভব ছিল, বৈশ্যেরও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং শূদ্রগণের সাহায্য ভিন্ন জীবন অতিবাহিত করিবার উপায় ছিল না এবং শূদ্রগণেরও উল্লিখিত তিন শ্রেণীর সাহায্য ব্যতিরেকে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার উপায় ছিল না। ইঁহারা প্রত্যেক শ্রেণী অপর তিন শ্রেণীর দ্বারা উপকৃত হইতেন এবং তজ্জন্য পরস্পর পরস্পরের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। বর্ত্তমান কালের ন্যায় জাতিভেদ তৎকালে ছিল না ও কেহ তাহা কল্পনাও করিতে পারিতেন না। গুণ ও কর্ম্মানুযায়ী ইঁহাদের মধ্যে অনেকে নানা শ্রেণীতে গমনাগমন করিতে পারিতেন। ব্রাহ্মণের পুত্র ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রকর্ম্মা হইলে ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র শ্রেণীভূত হইয়া যাইতেন। এইরূপ ক্ষত্রিয় সন্তান ব্রাহ্মণ বৈশ্য ও শূদ্র, বৈশ্য সন্তান ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও শূদ্র এবং শূদ্র সন্তান যথাক্রমে বৈশ্য ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ শ্রেণী ভুক্ত হইয়া যাইতেন। ইহার প্রমাণ পূর্ব্বে অনেক উদ্ধৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান

কালের ন্যায় ব্রাহ্মণের পুত্র—যে ব্রাহ্মণ হইবেন তা তিনি বৈশ্যকর্ম্মাই হউন বা শূদ্রকর্ম্মাই হউন,—এরূপ অদ্ভুত যুক্তি বা শাস্ত্র তৎকালে ছিল না।

মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের রৈবতক কাব্যে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাস দেবকে বলিতেছেন :—

"পবিত্র উত্তর কুরু হইতে যখন
উচ্চারি পবিত্রঋক, গাই সামগান,
আসিল ভারতে সেই পিতৃদেবগণ,
আছিল কি চারি জাতি? লইল যখন
কেহ শস্ত্র, কেহ শাস্ত্র, বাণিজ্য বা কেহ;
সমাজের হিতব্রতে হইল যখন—
কেহ হস্ত কেহ পদ কেহ বা মস্তক;
আছিল কি জাতিভেদ? কাটিয়া যাহারা
সুন্দর সমাজদেহ—মূরতি প্রীতির,
করিতেছে চারিখণ্ড প্রতিরোধি বলে
অঙ্গ হইতে অঙ্গান্তরে শোণিত প্রবাহ,—
মহর্ষি বিপ্লবকারী আমি কি তাহারা?
নাহি দিবে যারা প্রভো, ভবিষ্যৎব্যাসে
ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব কর্ণতুল্য শূদ্রে,
নাহি দিবে জ্ঞানালোক ক্ষত্রিয়ে কখন,
বৈশ্যে বাহুবল, আদি জাতি ভারতের
করিয়া দাসত্বজীবি রাখিবে যাহারা
মহর্ষি বিপ্লবকারী আমি কি তাহারা?"

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি পরলোকগত সারদাচরণ মিত্র এম, এ,

বি, এল; পি, আর, এস্; মহোদয় জাতিভেদ সম্বন্ধে এইরূপ ভাবে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন :—

"ব্রহ্মার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হইতে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উৎপত্তির কথা কবিকপোল কল্পিত উপমাত্মক মাত্র। দোষগুণ অনুসারে ব্যবহার ও আচার ব্যবহারের পার্থক্য অনুসারে পুরাকালে বর্ণ নির্ণয় হইয়াছিল।" (১)

"ব্রাহ্মণোঽস্যমুখমাসীৎ" শ্লোকটীর একটী সুন্দর ও সুযুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা কাব্যসুন্দরী দেবসুন্দরী সাহিত্যচিন্তা কাব্যচিন্তা সমাজচিন্তা সমাজতত্ত্ব হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক ৺পূর্ণচন্দ্র বসু মহাশয় করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন :—"যাহা বিরাটের মুখ তাহাই ব্রাহ্মণ, যাহা বাহু তাহাই ক্ষত্রিয়, যাহা উরু বা মধ্যভাগ তাহাই বৈশ্য, যাহা পাদ তাহাই শূদ্র। এস্থলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র বলিতে একজন ব্যক্তি মাত্র নহে, সকলই সমষ্টি অর্থে বুঝিতে হইবে। ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব এবং শূদ্রত্ব যুক্ত লোক সমষ্টিই ব্রহ্মার কায়া। যাহা ব্রহ্মার কায়া, তাহা শুধু আর্য্য জাতিতে নহে, শুধু অনার্য্য জাতিতে নহে, সমস্ত লোক-মণ্ডলীতে যাহা আছে, তাহাই ব্রহ্মার কায়া। ব্রহ্মা শুদ্ধ জাতি বিশেষে আবদ্ধ নহেন; সর্ব্বজাতিতে তিনি বিদ্যমান।"

শ্রীমৎ নির্ম্মলানন্দ ভারতী মহোদয় উক্ত শ্লোকের ঐরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন—তবে তাঁহার ব্যাখ্যা আরও বিষদ আরও সংস্কৃত আরও যুক্তিপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, সুধীবৃন্দের বিচারের জন্য তাহাও এস্থলে লিখিত হইল।

তিনি বলিতেছেন :— * * * * "পুরুষ সূক্ত রূপকে পরিপূর্ণ। "ব্রাহ্মণোঽস্য" ইত্যাদি মন্ত্রটী নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিলে বুঝা যায়, উহা বিরাট পুরুষের বর্ণনাও নহে, প্রজাপতির বর্ণনাও নহে, রাষ্ট্র পুরুষের বর্ণনা মাত্র। সমাজের বর্ণনাই এই ঋকের অর্থ।

(১) নমঃশূদ্র সমস্যা—বসুমতী।

ব্রাহ্মণ তখনকার সমাজে মুখ, ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য উরু এবং শূদ্র পদ। জ্ঞান প্রকাশ ব্রাহ্মণে, সুতরাং তদভাবে সমাজ নীরব; বল ক্ষত্রিয়ে তাহা না হইলে সমাজের কার্য্য করিবার শক্তি লোপ পায়। কৃষি-বাণিজ্য বৈশ্য বল, তাহা না থাকিলে সমাজ ভগ্ন-উরু, দাঁড়াইতে পারে না। পরিচর্য্যা শূদ্র কার্য্য, তাহা না থাকিলে, সমাজের হস্ত পদ মস্তিষ্ক সবই অপরিষ্কৃত রুগ্ন ভগ্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। যাহার দ্বারা কাজ পাইতে হইবে, তাহার সেবা শুশ্রূষা চাই। এইত গেল ঋকের প্রকৃত অর্থ, এখন টীকাকার ভাষ্যকার যাহাই কেন বলুন না, এ ঋক্ আধুনিক। সকলেই ব্যাখ্যা করিতে গোঁজামিল দিয়াছেন। বেদের বর্ণিত বিরাট পুরুষ জিনিষটা কি, এ বিষয় যাঁহার কিছু মাত্র জ্ঞানও আছে, তিনি অবশ্যই বলিবেন, ব্রাহ্মণ জাতি বিরাট পুরুষের মুখ হইতে পারে না। কেবল ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি মানবের দ্বারা যদি বিরাট মূর্ত্তি কল্পিত হয় তবে স্থাবর জঙ্গম গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্য নদ নদী পাহাড় পর্ব্বত কাহার বাটী যাইবে? অতএব ব্রাহ্মণ মুখরূপে কল্পিত হইয়াছিলেন, এরূপ অর্থও দর্শন শাস্ত্র বিরুদ্ধ। বিরাট পুরুষের বর্ণনা বহু পুরাণে আছে, বেদান্তাদি দর্শনেও সমর্থিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ বিশিষ্ট ভারতীয় সমাজ হইতে বড় বিভিন্ন। ঐ মন্ত্র—পুরুষ সূক্তের অন্তর্গত নয়, উহা কোনও মতে জাতিভেদের প্রমাণ রূপে পুরুষ সূক্তে প্রক্ষিপ্ত। বিরাটের সহিত উহার সম্বন্ধ বলিতে গেলে বিরাট বহুবিধ হইয়া দাঁড়াইবে। ঐ মন্ত্রের অর্থ যদি টীকাকারদিগের মতানুযায়ী হয়, তাহা হইলেও উহা অর্থাৎ মুখ দিয়া, হাত দিয়া, অপূর্ব্ব জীবোৎপত্তি প্রক্রিয়া প্রচার করা বেদের অনধিকার চর্চ্চা ব্যতীত আর কিছুই নহে। জীব-শরীর-নির্ব্বাণ-প্রণালী ও জগতের পূর্ব্বতন অবস্থা বিষয়ে ভারতীয় আর্য্যজাতির জ্ঞান এত তিরস্কৃত, এরূপ বিশ্বাস করিতে কষ্ট হয়।" শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার ঘোষ এম, এ, মহাশয় বলেন—

"আমাদের বেদে আছে যে বিরাট পুরুষ ব্রহ্মার মুখ বাহু উরু ও পাদ হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ যখন ভারতবর্ষের বাহিরে নাই এবং বিরাট পুরুষের মুখ হইতে পাদ পর্য্যন্ত যখন ভারতবর্ষেই শেষ হইল, তখন আর পৃথিবীর অপরাপর জাতির জন্য অন্য কোন অঙ্গ বাকী রহিল না। এ যুক্তি নিতান্ত অসার নিতান্ত ভ্রমাত্মক।" মেদিনীপুরের অত্যুজ্জ্বল রত্ন কটক র‍্যাভেন্সা কলেজের অধ্যক্ষ "রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার" স্বর্গীয় নীলকণ্ঠ মজুমদার এম, এ; জাতিভেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন ঃ—

"কৃষ্ণ বলিতেছেন—"আমিই জাতিভেদের কর্ত্তা, কিন্তু আমাকে জাতিভেদের কর্ত্তা বলিয়া মনে করিও না"। * * * * * * * * "আমি কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদের প্রথা প্রবর্ত্তিত করি নাই। অর্থাৎ এমন কোন সময় নাই, যখন আমি সমস্ত হিন্দুদিগকে একত্রিত করিয়া কতকগুলিকে ব্রাহ্মণ, কতকগুলিকে ক্ষত্রিয় প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলাম, তবে আমি হিন্দুসমাজে যে শক্তি নিহিত করিয়াছিলাম সেই শক্তি প্রভাবেই কাল সহকারে সমাজ মধ্যে চারিটি বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল। অতএব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমি জাতিভেদের কর্ত্তা।" * * * * * কাল সহকারে হিন্দু সমাজের কলেবর ও আয়তন বর্দ্ধিত হইলে হিন্দুগণ স্বাভাবিক নিয়ম বলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ সমস্ত ব্যবসার মধ্যে যেগুলি অর্থকর অনেকেই সেই পথে যাইতে লাগিলেন। এইরূপে সমাজস্থ ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা অবলম্বন করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ যত দিন কৃষি কার্য্যে আর্য্যগণের সুবিধা থাকে, তত দিন সকলেই কৃষক হয়, আবার অধিক লোকে কৃষক হইলে উহাতে লাভ অধিক থাকে না। তখন

আবার কৃষকদের মধ্যে কতকগুলি লোক বাণিজ্য ব্যবসা অবলম্বন করে। এইরূপে যুদ্ধ বা বিগ্রহের সময় কৃষকদের বিনাশ হইয়া গেলে কে কৃষিকার্য্য করিবে তাহার নির্ণয় হয় না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা শ্রেণীবদ্ধ না থাকাতে এইরূপ নানাবিধ অসুবিধা ঘটে। অন্য অন্য দেশেও এইরূপ অসুবিধা হইয়া থাকে। সর্ব্ব দেশেই এ অসুবিধার সময়ে এক শ্রেণীর লোক বলবান্ হইয়া অন্য অন্য শ্রেণীকে পরাজিত করিয়া রাখে। যখন যুদ্ধজীবিগণ বলবান্ হয়, তখন শ্রমজীবিদের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। হিন্দু সমাজেও বোধ হয়, অনেক বার এইরূপ এক শ্রে র উন্নতি ও অন্য শ্রেণীর অবনতি হইয়াছিল। বহুবার এরূপে বহু প্রকার অসুবিধা ভোগ করিয়া হিন্দু সমাজ দেখিল শ্রেণী বা জাতির স্পষ্ট নির্দ্দেশ ও সীমা না থাকিলে, সকল শ্রেণীরই অবনতি ও অসুবিধা হয়। এজন্য সকলের সম্মতি ক্রমে সর্ব্বপ্রকার শ্রেণীর মধ্যে সুবিধা ও অসুবিধার অংশ সমান রূপে বণ্টন করিয়া দিয়া সমাজ মধ্যে চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রচার করা হইয়াছিল।

প্রথমে ব্রাহ্মণ। ইহার সুবিধা কি কি? শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, সকলের নিকট পূজা ও সম্মাননা গ্রহণ; শাস্ত্র পাঠে অধিকার। ইহার অসুবিধা কি কি? অহোরাত্রঃ মানসিক পরিশ্রম, দারিদ্র্য, সাংসারিক ও শারীরিক সকল প্রকার সুখে বিতৃষ্ণা; এক বেলা ভোজন; পঞ্চাশের পর অরণ্য বাস। তাহার পর ক্ষত্রিয়;—ক্ষত্রিয়ের সুবিধা কি কি? রাজ্য ভোগ, ঐশ্বর্য্য, বিলাস, শাস্ত্রে অধিকার। ক্ষত্রিয়ের অসুবিধা কি কি? সর্ব্বদা প্রাণহানির আশঙ্কা, রাজকার্য্যের জন্য সর্ব্বদা মস্তিষ্ক সঞ্চালনা ও চিন্তা, পঞ্চাশের পর অরণ্য বাস।

তাহার পর বৈশ্য, বৈশ্যের সুবিধা কি কি? ঐশ্বর্য্য, বিলাস, শাস্ত্রে অধিকার। ইহার অসুবিধা কি কি? পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ হইতে সর্ব্বদা দূরে অবস্থান, পঞ্চাশের পর অরণ্য বাস।

তাহার পর শূদ্র। শূদ্রের সুবিধা কি কি? নির্ভাবনা, গ্রাসাচ্ছাদন সম্বন্ধে ভাবনারাহিত্য; চিরকাল গৃহস্থাশ্রমের অধিকার, মানসিক স্বচ্ছন্দতা। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জীবনে নানাবিধ দুর্ঘটনা সম্ভবপর। ক্ষত্রিয় যুদ্ধে পরাজিত হইতে পারেন। বৈশ্য বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন। কিন্তু শূদ্রের জীবনে এরূপ দুর্ব্বিপাক একবারেই অসম্ভব। শূদ্র চিরকাল পরিবারবর্গের মধ্যে অবস্থান করিতে পারেন। শূদ্রের অসুবিধা কি কি? দারিদ্র্য, অন্যের সেবা, শারীরিক পরিশ্রম। একটি তালিকা এই চারি বর্ণের সুবিধা অসুবিধা দেখাইতেছি।

বর্ণ	শারীরিক সুখ	মানসিক সুখ	সুখের সমষ্টি
ব্রাহ্মণ	০	২	২
ক্ষত্রিয়	১	১	২
বৈশ্য	১	১	২
শূদ্র	২	০	২

ইহাদের মধ্যে শূদ্র সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ ভ্রম হইয়া থাকিতে পারিবে। কিন্তু শূদ্র ভিন্ন অন্য তিন বর্ণের সুবিধা ও অসুবিধা যে সমান অংশে বণ্টিত হইয়াছিল ইহা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। * * * * * * এক্ষণে কৃষ্ণ জাতিভেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন তাহা শ্রবণ কর। কৃষ্ণ বলিতেছেন—"মনুষ্যেরা স্বভাবতঃ ত্রিগুণাত্মক। সেই তিনটী গুণের নাম সত্ব, রজঃ ও তম। দয়া, মমতা, পরোপকার প্রভৃতি কার্য্য সত্বগুণের ফল। পরদ্রোহ, পরোপকার প্রভৃতি দ্বারা উদ্দেশ্য সাধন, রজোগুণের ফল। হিংসা ক্রোধ লোভ প্রভৃতি কার্য্য তমোগুণের ফল। সত্বগুণে লোক সকল পরোপকারের জন্য সর্ব্বদা স্বার্থ বিসর্জ্জন করেন। রজোগুণে লোক সকল সদুপায় বা অসদুপায় দ্বারা আত্মোন্নতির প্রয়াস

পান। তমোগুণে লোক সকল অসদুপায় দ্বারা আত্মোন্নতির প্রয়াস পাইয়া থাকেন। সত্ত্বগুণের কার্য্যমালা পুণ্যময়।

রজোগুণের কার্য্যমালা কখনও বা পুণ্যময় কখনও বা পাপদ্বারা কলঙ্কিত। তমোগুণের কার্য্যমালা পাপদ্বারা কলঙ্কিত। এই তিন গুণের মধ্যে সত্ত্ব গুণ ও তমোগুণ একত্র অবস্থান করিতে পারে না। আলোক ও অন্ধকার, পাপ ও পুণ্য, পরোপকার ও পরাপকার একত্র থাকিতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত তিনটি স্বাভাবিক গুণ সম্বন্ধে মনুষ্যদিগের প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ যাঁহাদের মধ্যে সত্ত্ব গুণ প্রধান ইঁহাদের রজঃ ও তমঃ গুণ থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ যাঁহাদের মধ্যে রজো গুণ প্রধান। ইঁহাদের মধ্যে আবার দুইটী শ্রেণী থাকিতে পারে যাঁহাদের মনে রজোগুণ অধিক পরিমাণে ও সত্ত্বগুণ অল্প পরিমাণে কার্য্য করে, এবং যাঁহাদের মনে রজোগুণ অধিক পরিমাণে ও তমোগুণ অল্প পরিমাণে কার্য্য করে। এতদ্ভিন্ন অন্য কতকগুলি লোক আছেন যাঁহাদের মনে তমোগুণ প্রধান। ইঁহাদের মনে সত্ত্বগুণ ও রজোগুণ থাকিতে পারে না। এইরূপে মনুষ্যদিগের (শুধু হিন্দু জাতিকে নহে) চারিটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা সত্ত্ব প্রধান, সত্ত্বরজোময়, রজস্তমোময় ও তমঃপ্রধান। এই চারি প্রকারের লোকে স্বভাবতঃ চারি প্রকারের কার্য্য বা ব্যবসা অবলম্বন করিবে। সত্ত্ব প্রধান ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃ শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা প্রভৃতি গুণে বিমণ্ডিত হইয়া যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্যে আপনাদিগকে ব্যাপৃত করিবে। যাহারা সত্ত্ব রজঃ প্রধান তাহারা শৌর্য্য বীর্য্যাদি গুণে বিভূষিত হইয়া প্রজারক্ষা, যজন, দান, অধ্যয়ন, প্রভৃতি কার্য্যে আপনাদিগকে নিযুক্ত রাখিবে। যাহারা রজস্তমঃ প্রধান, তাহারা বুদ্ধি, বিবেচনা, অধ্যবসায়, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি গুণে বিমণ্ডিত হইয়া কৃষি বাণিজ্যাদি কার্য্য অবলম্বন করিবে।

আর যাহারা তমোগুণ প্রধান, তাহারা ক্রোধ, হিংসা, লোভ প্রভৃতি স্বভাবের হীনতাবশতঃ অন্য সকল ব্যবসায় অবলম্বনে অসমর্থ হইয়া অন্যের প্রভুত্বে থাকিবে। এইরূপে মনুষ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন গুণ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম অবলম্বন করিবে। এবং ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হইবে। যাঁহারা সত্বগুণ প্রধান, তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত হইবেন, যাঁহারা সত্বরজোগুণ প্রধান তাঁহারা ক্ষত্রিয়, যাঁহারা রজস্তমোগুণ প্রধান তাঁহারা বৈশ্য এবং যাঁহারা তমঃপ্রধান তাহারা শূদ্র হইবেন।" (১)

এতৎ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্, এ; মহাশয় বলেন :—* * * * "এখন একবার কল্পনাতে তৎকালীন আর্য্য সমাজের অবস্থা চিত্রিত করিবার চেষ্টা করুন। একদিকে দেখুন, একদল দীর্ঘাকৃতি, গৌরবর্ণ উন্নত নাসিকা বিশিষ্ট বিদেশী লোক আসিয়া পঞ্চনদের উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্ব বাহুবলে পরাজিত দেশকে স্বদেশ করিয়া আপনাদের গ্রাম জনপদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতেছেন, কৃষি বাণিজ্যের আয়োজন করিতেছেন, অরণ্য সকল নিঃশেষ করিয়া মনোহর কৃষিক্ষেত্র সকল বিস্তার করিতেছেন; উপনিবেশের প্রান্তবর্ত্তী অরণ্য ভূমি সকলে মৃগয়ার্থ পর্য্যটন করিতেছেন; এবং আপনাদের যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। আর এক দিকে দেখুন পরাজিত আদিম অধিবাসিগণ পর্ব্বতাদিতে আশ্রয় লইয়া নিরন্তর তাঁহাদের উপর উপদ্রব করিতেছে। আর্য্যেরা যাহাতে বিরক্ত হইতেন এই সকল অসভ্য দস্যুগণ তাহাই করিতেছে। আর্য্যেরা ইহাদিগকে আমমাংস ভোজী বলিয়া ঘৃণা করেন সুতরাং ইহারা দুষ্টামি করিয়া তাঁহাদের যজ্ঞ ভূমিতে আমমাংস প্রভৃতি বর্ষণ করিতেছে; হঠাৎ বনাভ্যন্তর হইতে নির্গত হইয়া তাঁহাদের রমণীদিগকে পথে পাইলে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। আপনারা প্রাচীন যে সকল পৌরাণিক

(১) গীতারহস্য।

কথাতে ঋষিদিগের উপর রাক্ষসদিগের উপদ্রবের বিবরণ শুনিতে পান, তাহাতে এই সকল উপদ্রবেরই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা হউক যখন প্রতিনিয়ত দস্যুগণের উপদ্রব চলিতে লাগিল এবং তাহাদের ভয়ে সুখশান্তিতে শ্রমের অন্ন ভোগ করা আর্য্যদিগের পক্ষে দুষ্কর হইয়া পড়িল, তখন আর্য্যগণের আত্মরক্ষার বিশেষ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হইল। তাঁহারা লোক বাছিয়া আপনাদের গ্রাম ও জনপদ সকলের প্রান্তভাগে স্থাপন করিলেন। ইঁহারা সশস্ত্র হইয়া দলে দলে স্বীয় অধিকার মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহারাই ক্রমে ক্ষত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ক্ষত্র শব্দের অর্থ—যাহারা ক্ষয় হইতে রক্ষা করে। এই অর্থের সহিত বর্ণিত ঘটনার চমৎকার সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে। এই ক্ষত্রগণ আদিতে অবিভক্ত আর্য্য সমাজের অঙ্গীভূত ছিলেন; তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্র প্রভৃতি প্রভেদ ছিল না, কর্ম্মভেদ বশতঃ এই সকল প্রভেদ উৎপন্ন হইল। পূর্ব্বে একমাত্র জাতি ছিল, তাহা হইতে ক্ষত্র প্রভৃতি উৎপন্ন হইল ইহার একটী প্রমাণ মহাভারত হইতে দেওয়া হইয়াছে। আর একটী প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্রে আসিৎ একমেব, তদেকং সৎ নব্যভবৎ। তচ্ছ্রেয়ো রূপং অত্যসৃজত ক্ষত্রং।

অর্থ—"অগ্রে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিল। ঐ জাতি একাকী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল না—সুতরাং সেই শ্রেষ্ঠবর্ণ (ব্রাহ্মণ) ক্ষত্রকে সৃষ্টি করিলেন।" যাঁহারা বেদ বা স্মৃতি কিছুমাত্র পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে ব্রহ্ম শব্দ ব্রাহ্মণ অর্থে ভূরি ভূরি স্থলে প্রয়োগ হইয়াছে; এখানে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ। উপনিষদ অতি প্রাচীন গ্রন্থ, এতদ্দেশে উহা বেদ বলিয়া আদৃত, সুতরাং দেখুন আমি জাতিভেদের যে বিবরণ দিতেছি তাহার প্রমাণ বেদের মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

দেখুন তবে কেমন করিয়া প্রাচীন আর্য্য সমাজের শূদ্র ও ক্ষত্র জাতির সূত্রপাত হইল। এখন প্রশ্ন হইতে পারে অবশিষ্ট আর্য্যগণ কি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কিয়দংশ লোককে একটী গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইল। সে কার্য্যটী কি? আপনারা স্মরণ রাখিবেন যে, যে সময় বেদের প্রাচীন মন্ত্র সকল রচিত হইয়াছিল, সে সময় ঐ সকল মন্ত্র কণ্ঠস্থ রাখিতে হইত। আর্য্যেরা যখন ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন তাহার পূর্ব্বাবধিই তাঁহাদের মধ্যে সোম যজ্ঞ ও অগ্নির উপাসনা প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান পারসীকদিগের প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রে এইগুলির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পণ্ডিতেরা প্রভূত গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে বর্ত্তমান হিন্দুগণের ও বর্ত্তমান পারসীকদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ ভারতবর্ষে প্রবেশের পূর্ব্বে একত্রে বাস করিতেন। সুতরাং অগ্নির উপাসনাদি সেই সময়কার ধর্ম্মানুষ্ঠান হইবে। যাহা হউক অতি প্রাচীনতম কাল হইতে অগ্নির উপাসনাদি ও তদর্থ রচিত মন্ত্র সকল দৃষ্টিগোচর হয়। আর্য্যেরা যখন অত্যুন্নত গিরিমণ্ডিত, বহুনদ পরিধৌত ও শস্যশ্যামলক্ষেত্র-পূর্ণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন, তখন এখানকার প্রকৃতির গম্ভীর ও মনোহর ভাব সকল সন্দর্শন করিয়া তাঁহাদের চিত্তে কবিত্ব শক্তির সমধিক আবির্ভাব হইতে লাগিল। যখন তাঁহারা উষাকালে নবোদিত সূর্য্যের তরল কিরণচ্ছটা দ্বারা অনুরঞ্জিত নীলাকাশ দেখিতে লাগিলেন, যখন নিদাঘের প্রখর তাপের পর প্রাবৃট কালের নব মেঘমালার ঘন নীলিমা প্রত্যক্ষ করিলেন, যখন গিরিপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ বন্যাসমূহের কল্লোলিত জলরাশি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের হৃদয়সাগরে অপূর্ব্ব ভাবতরঙ্গ সকল উত্থিত হইতে লাগিল এবং মন্ত্রের পর মন্ত্র সকল রচিত হইতে লাগিল।

ঋগ্বেদ এই সকল কবিত্ব-রসপূর্ণ সঙ্গীত লহরীর সমষ্টি মাত্র। ইহার স্থানে স্থানে কবিত্ব কি সুন্দর! কি আশ্চর্য্য প্রকৃতির সৌন্দর্য্য গ্রহণের

শক্তি! কি হৃদয় মুগ্ধকর মানব প্রাণের স্বাভাবিক ছবি! বেদমন্ত্রকার কবিগণ বর্ষাকালের ভেকের ক্রো কা ধ্বনির মধ্যেও এক প্রকার অপূর্ব্ব মাধুরী অনুভব করিয়াছিলেন। এই সকল বেদমন্ত্রকে কবির কবিত্ব বল, বিহঙ্গমের স্বাধীন কণ্ঠের সঙ্গীতধ্বনি বল, সৌন্দর্য্য-মোহিত মানবহৃদয়ের উচ্ছলিত ভাবরাশি বল, তবে ঠিক বলা হইল; কিন্তু শাস্ত্র বল, ধর্ম্মোপদেশ বল, লৌকিক কি আধ্যাত্মিক বিধি ব্যবস্থা বল, ঠিক বলা হইল না। যাহা হউক আর্য্যগণ পুণ্যারণ্য ভারতক্ষেত্রে যখন তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন—তখন তাঁহাদের মন্ত্র সকলের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই সময় বর্ণমালার সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং এক শ্রেণীর লোককে যত্নসহকারে এই সকল মন্ত্র অভ্যাস করিয়া রাখিতে হইত। ইঁহারা বালককাল হইতে ঐ সকল মন্ত্র কণ্ঠস্থ করিতেন। যজ্ঞস্থলে ঐ সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হোমকার্য্যের সহায়তা করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে আপনার পল্লীগ্রামে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান দেখিয়া থাকিবেন, ইঁহারা বর্ণজ্ঞান বিহীন, সংস্কৃত ভাষা বিন্দুবিসর্গ জানেন না—অথচ ইঁহারা দশকর্ম্মান্বিত, অর্থাৎ গৃহস্থের গৃহে যে সকল নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়—তাহার সমুদয় প্রকরণ ইঁহারা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করুন পিতৃশ্রাদ্ধ কিরূপে করিতে হয়? অমনি ইঁহারা শ্রাদ্ধের মন্ত্র সকল অনর্গল বলিয়া যাইবেন। 'মধুবাতা ঋতায়তে' প্রভৃতি মন্ত্র সকল পাঠ করিতে আরম্ভ করিবেন। শুদ্ধ হউক অশুদ্ধ হউক যেরূপ শিখিয়াছেন অবিকল আবৃত্তি করিতে পারিবেন। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের ধর্ম্মানুষ্ঠানের সাহায্যের জন্য যেমন এক শ্রেণীর দশকর্ম্মান্বিত লোক দৃষ্ট হয়, প্রাচীন আর্য্য সমাজের বেদমন্ত্র সকলের রক্ষা ও শিক্ষার নিমিত্ত এক শ্রেণীর লোক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারাই উত্তরকালে ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ব্রাহ্মণ শব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ যিনি ব্রহ্মকে জানেন—বা ধারণ করেন।

প্রাচীন সংস্কৃতে ব্রহ্ম শব্দের অনেক অর্থ—এক অর্থ ঈশ্বর, দ্বিতীয় অর্থ ব্রাহ্মণ জাতি, তৃতীয় অর্থ বেদমন্ত্র। এখানে ব্রহ্ম অর্থে বেদমন্ত্র। বেদমন্ত্র যাঁহারা ধারণ করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ।

মনু বলিয়াছেন—

উত্তমাঙ্গোদ্ভবাৎ জ্যৈষ্ঠাৎ ব্রহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ।
সর্ব্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্ম্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ॥

মনু, ১ম অধ্যায়।

"উত্তমাঙ্গ হইতে উৎপন্ন হওয়াতে, জ্যেষ্ঠতা নিবন্ধন এবং বেদমন্ত্রের ধারণ নিবন্ধন ব্রাহ্মণ এই সমুদয় সৃষ্টির প্রভু।"

এইরূপে যখন প্রাচীন আর্য্যসমাজের একাঙ্গ সশস্ত্র হইয়া সমাজ রক্ষা ব্রতে ব্রতী হইলেন—এবং অপরাঙ্গ বেদমন্ত্র সকল শিক্ষা ও শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, তখন সমাজের অপর সকল লোক——ইঁহাদেরই সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল,——কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতিতে নিযুক্ত হইয়া অর্থোৎপাদনে রত হইলেন। বেদে ইঁহারা "বিশ" শব্দে উক্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষাতে "সাধারণ" এই শব্দ ব্যবহার করিলে যেরূপ অর্থ বোধ হয়, বেদমন্ত্র সকলে "বিশ" শব্দে সেই প্রকার অর্থ। বিশ অর্থাৎ প্রজাবর্গ। এই কারণে "বিশাম্পতিঃ" শব্দের অর্থ রাজা, যিনি প্রজাদিগের প্রভু।

দেখুন তবে কেমন অপরিহার্য্য কারণে আদিম আর্য্যসমাজ মধ্যে চারি প্রকার জাতির সূত্রপাত হয়। প্রথম যখন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন, তখন জাতিভেদের বর্ত্তমান চিহ্ন সকল কিছুই বিদ্যমান ছিল না। অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে জাতিভেদের যে তিনটী প্রধান চিহ্ন দৃষ্ট হয়। (১ম) নিম্ন জাতীয়দিগের অন্নপান গ্রহণ নিষেধ, (২য়) ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ নিষেধ, (৩য়) জাতির প্রভেদ

অনুসারে ব্যবসায়ের বিভিন্নতা। আদিম আর্য্য-সমাজে এই সকল চিহ্নের কোনটীই লক্ষিত হয় না। এগুলি প্রবল দলাদলি ও বৈর ভাবের ফল-স্বরূপ, সুতরাং এগুলি সামাজিক নিয়মরূপে পরিগণিত হইতে অনেক শতাব্দী লাগিয়াছিল। বরং শাস্ত্রে এমন ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, বর্ত্তমান সময়ে জাতি যেমন জন্মগত, গুণগত নয়, পূর্ব্বে তাহা ছিল না। উৎকৃষ্ট বর্ণের হীন বর্ণত্ব প্রাপ্তি, এবং হীন বর্ণের উত্তম বর্ণত্ব প্রাপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়। * * *

এখন একটী কথা আপনারা স্মরণ রাখিবেন। বর্ত্তমান সময়ে সভ্য-সমাজে সাধারণ শিক্ষার যেমন রীতি দৃষ্ট হয়, আদিম আর্য্য সমাজে তাহা কখনই ছিল না। অর্থাৎ এখন যেমন একটী বিদ্যালয়ে তুমি আমি দশ জন আপনাপন অবস্থা ও শক্তি অনুসারে আমাদের সন্তানদিগকে প্রেরণ করিতে পারি, দশ দিক হইতে দশ শত বালক বালিকা আসিয়া প্রতিদিন শিক্ষা করিতে পারে, প্রাচীন ভারত-সমাজে এরূপ বিদ্যালয় ছিল না। তখন বিদ্যার্থীদিগকে গুরুকুলে বাস করিতে হইত এবং গুরুদিগের প্রতি কঠোর শাসন ছিল, তাঁহারা ভৃতি বা বেতন গ্রহণ করিতে পারিতেন না, পরন্তু শিষ্যগণকে অন্ন দিয়া পুষিতে হইত। শিষ্যগণ গুরুগৃহে বাস ও গুরুগৃহের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া দিনাতিপাত করিতেন। বিশেষ তখন বর্ত্তমান সময়ের মত গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় ছিল না; মুদ্রাযন্ত্র না থাকাতে অতি কষ্টে অনেক পরিশ্রম সহকারে বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যাভ্যাস করিতে হইত সুতরাং ব্যুৎপন্ন গুরুর সংখ্যা অধিক হইত না। যে সকল ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি শাস্ত্রবিশারদ বলিয়া প্রতিষ্ঠাবান্ হইতেন, বহুদূর হইতে শিষ্যগণ আকৃষ্ট হইয়া সেখানে আসিয়া বাস করিত। এইরূপ অবস্থায় যাঁহার যে বিদ্যা ছিল তাঁহার নিজ বংশীয় বালকদিগকে শৈশব অবস্থা হইতেই শিক্ষা দেওয়াই স্বাভাবিক। মানুষ যে বিষয়ে প্রতিষ্ঠা বা গৌরব লাভ করে

তাহা নিজ বংশে রক্ষা করিবার ইচ্ছা স্বতঃই উদিত হয়। এই সকল কারণেই দেখিতে পাই এ দেশে সকল প্রকার বিদ্যাই কৌলিক হইয়া যায়। এখানে নৈয়ায়িকের ছেলে নৈয়ায়িক, স্মার্ত্তের ছেলে স্মার্ত্ত, দেওয়ানের ছেলে দেওয়ান, বৈদ্যের ছেলে বৈদ্য। যিনি যখন যে বিষয়ে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন, তিনিই তাহা নিজ বংশধরদিগকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

আপনারা এই বিষয়টী স্মরণ রাখিলেই কিরূপে বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হইল তাহা বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা সশস্ত্র হইয়া দেশ রক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলেন, তাঁহারা যুদ্ধ বিদ্যাতে যে নিপুণতা লাভ করিলেন, তাহা তাঁহাদের বংশ পরম্পরাতে থাকিল,—যাঁহারা বেদমন্ত্র সকল রক্ষা ও শিক্ষা করিতে লাগিলেন সেই কার্য্য তাঁহাদের কৌলিক কার্য্য হইল,—যাঁহারা কৃষি ও বাণিজ্যাদিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহারা আপন আপন সন্তানদিগকে উক্ত বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এমন কি আপনাদিগকে দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, যে বিদ্যা এ প্রকার কৌলিক হয়, লোকে সর্ব্বদাই যত্নপূর্ব্বক তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকে ও তদুপরি অপরকে সহজে অধিকার স্থাপন করিতে দেয় না? আপনারা সমাজ মধ্যে প্রতিদিন হাজার হাজার প্রকার প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছেন, সুতরাং এই কথার প্রমাণ দিবার জন্য আর ব্যগ্র হইবার প্রয়োজন নাই। যখন বেদমন্ত্র রক্ষকগণ আপনাদের কর্ম্মের জন্য গৌরব ও স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন এবং দেশ রক্ষক ক্ষত্রগণ স্বীয় কার্য্যের গৌরব ঘোষণা করিতে লাগিলেন তখন অল্পে অল্পে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিদ্বেষ ভাবের সৃষ্টি হইল, এবং ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান কঠিন নিয়ম সকল দেখা দিল।”

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ, বলেন:—“আদিম কালে কৃষি যাজন যুদ্ধাদি জীবিকা-ভেদজনক বর্ণ বিচার বা বংশানুক্রমে পুরোহিত বা

রাজার প্রথা তখন ছিল না। শ্যামল শস্য ভরা প্রভৃত ক্ষেত্রের অধিস্বামী যেমন স্বহস্তে ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেন আবার তেমনি বাহুবলে স্বগ্রাম, আত্ম-জীবন ও অর্থ প্রভৃতি রক্ষা করিতেন। যুদ্ধান্তে গৃহে ফিরিয়া তাঁহারাই আবার সুন্দর ভাষায় মন্ত্ররচনা করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসনা করিতেন। তখন দেব মূর্ত্তিও ছিল না, দেব গৃহও ছিল না, পূজা বিধির নানাবিধ আড়ম্বরও ছিল না।”

তারপর আর্য্যগণ শক্তি ও সুবিধা অনুযায়ী চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। এক এক শ্রেণী এক এক কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে এই কার্য্য বা ব্যবসায় বংশগত হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। ব্রাহ্মণের পুত্রগণ সাধারণতঃ যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি; ক্ষত্রিয় পুত্রগণ যুদ্ধ বিগ্রহাদি; বৈশ্য পুত্রগণ কৃষিকর্ম্ম বাণিজ্যাদি ও শূদ্র পুত্রগণ তিন বর্ণের সেবাদি কার্য্যে আপনাদিগকে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে বহুদিন অতিবাহিত হইবার পর সাধারণ লোক অর্থাৎ বৈশ্য শূদ্রগণ পুরোহিতদিগের চরণে বিবেক বুদ্ধি অর্পণ করিয়া জ্ঞানালোচনা, বিদ্যাচর্চ্চা এবং ধর্ম্মচিন্তার হস্ত ও কষ্ট হইতে মুক্তিলাভ করিল। আবার দেহ ধন ঐশ্বর্য্যাদির ভার ক্ষত্রিয়ের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। কাজেই সময় ও সুযোগ বুঝিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ঈদৃশলোকের সঙ্গে রক্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিলেন। পুরোহিতেরা সাধারণ লোকদিগকে মূর্খ ও অশুদ্ধ বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিলেন, আর ক্ষত্রিয়েরা নিস্তেজ কাপুরুষ বণিক ও কৃষকদিগের রক্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিলেন। পুরোহিত ও ক্ষত্রিয়ের এইরূপ ব্যবহার বৈশ্য ও শূদ্র সাধারণ দ্বিরুক্তি না করিয়া সহ্য করিতে লাগিলেন।

এই সময়ের অবস্থা আলোচনা করিয়া ও ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের ক্রমবিকাশ কারণ নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীযুক্ত পি, এন, বসু মহাশয় তাঁহার বিখ্যাত Hindu civilisation under British Rule গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—

"Blind followers are always the most thorough going and the most zealous, outside the narrow and secret precincts of an interested group of Brahmans, there was no one now to dispute or even question their authority ....Whatever the Brahmans now uttered or wrote was accepted as an infallible truth. If any Brahman wanted to countenance a particular tribe, he had only to declare that it was sanctioned by the Sastras. But whether he was right or wrong, whether he had mis-interpreted or not, very few were in a position to judge..........Thus sprang up an infinity of caste rules and regulations, chiefly local, some universal, but mainly something more than merely conventional or customary."

দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য সমাজে বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। আধ্যাত্মিক শক্তি প্রভাবে সমাজ চলিবে, রাজ্য শাসিত হইবে, সেই শক্তি তখন ব্রাহ্মণের হস্তে; তাই ক্ষত্রিয় যখন রাজা হইলেন ব্রাহ্মণ তাঁহার পরামর্শ দাতা হইলেন। ক্ষত্রিয় বাহু, ব্রাহ্মণ মস্তক; ক্ষত্রিয় শক্তি ব্রাহ্মণ বুদ্ধি। সুতরাং ব্রাহ্মণের প্রাধান্য যে দিন দিন নিরঙ্কুশ হইবে তাহার আর সন্দেহ কি?

অতঃপর ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধির সহিত ধীরে ধীরে ক্ষত্রিয় প্রভৃতিরও উন্নতি হইতে লাগিল। তাই তাঁহারা তখন ব্রাহ্মণের ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য লোলুপ হইলেন।

শ্রীযুক্ত পি, এন, বসু মহাশয় বলেন:—But the extravagant

pretensions of the Brahmanic priesthood were, as we also saw shortly after disputed by the other members of the Aryan community, especially the Kshatriyas."

পরে বহুদিন পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণে একটা সংঘর্ষের পরিচয় ইতিহাস সাক্ষ্যদান করিয়াছেন। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র, পরশুরাম শ্রীরাম, বেন নহুষ নিমি প্রভৃতির উপাখ্যান তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোত্তম পদে বৃত হইয়াছিলেন—এবং পরে সময় সময় বৈশ্য শূদ্রও কখন কখন শক্তি ও সাধনা বলে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের সম্মাননীয় হইয়াছেন। কিন্তু তাহা সমুদ্রে বারিবিন্দু প্রায় নিতান্তই সামান্য! নৈমিষারণ্যে ষষ্টি সহস্র ঋষি পরিবৃত পরিষদে শূদ্র সুত পুরাণ বক্তার পদ অলঙ্কৃত করিয়া ঋষিগণকে ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ ও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণাধিকার বিস্তৃত ও ব্রাহ্মণ প্রাধান্য রক্ষার নিমিত্ত পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণগণ সাম্যভাব জলাঞ্জলী দিয়া—নিরপেক্ষ সমদর্শন ডুবাইয়া দিয়া—মনু আদি সংহিতা পুস্তকে ব্রাহ্মণেতর জাতি সম্বন্ধে সুকঠোর অনুশাসন চালাইতে লাগিলেন। শূদ্রদিগের সম্বন্ধে ত কথাই নাই।

সপ্তম অধ্যায়।

সঙ্কর বর্ণ।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, আদিযুগে একমাত্র বর্ণ ছিল। 'এক বর্ণ আসীৎ পুরা'। পরে গুণ ও কর্ম্ম অনুযায়ী তাঁহারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন; এই চারি বর্ণ ব্যতীত অন্য কোন বর্ণ বা সঙ্করজাতি সম্বন্ধে শাস্ত্র ও ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থে তেমন কোনও উল্লেখ নাই। মনু বলিতেছেন ঃ—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্ত্রয়োবর্ণাঃ দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ এক জাতিস্তু শূদ্র নাস্তিতু পঞ্চমঃ॥

অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি, চতুর্থ বর্ণ শূদ্র একজাতি। ইহা ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই।" সুতরাং বর্ণ-সঙ্করের কথা যাহা বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ মনুসংহিতাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে উহা অতি আধুনিক। আধুনিক না হইলে ইহাদের বৃত্তান্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচিত হইত। মনুসংহিতা যে অত্যন্ত আধুনিক, ইহা সুধী মাত্রেই বিদিত আছেন। এই মনুসংহিতায় যাহাদিগকে সঙ্করজাতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহারা বাস্তবিকই সঙ্করজাতীয় কি না সে সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ বিদ্যমান। এ সম্বন্ধে আমরা যথাশক্তি বিস্তারিতরূপে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। "শুক্ল যজুর্ব্বেদ ঋগ্বেদের অনেক পরে রচিত হইলেও, ইহা যে আদিম কালেরই অন্যতম গ্রন্থ, ইহা বোধ হয় বলাই বাহুল্য। ঋগ্বেদের অনেক সূক্তও ইহাতে পরিদৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থ যে সময়ে রচিত হইয়াছিল সেই সময়কার সামাজিক অবস্থা ইহা হইতে অনেকটা জানা যায়। ইহার শত রুদ্রীয় নামক ষোড়শ অধ্যায়ে অনেক ব্যবসায়ের উল্লেখ আছে, কিন্তু

কোনও জাতিবিভাগের উল্লেখ নাই। আদিম অধিবাসী নিষাদদিগেরও ইহাতে উল্লেখ আছে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পরবর্ত্তীকালে এই নিষাদেরাই ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রানীর গর্ভজাত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

"পুরুষ মেধ" নামক ত্রিংশৎ অধ্যায়ে আমরা ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য, শূদ্র এবং অন্যান্য কতকগুলি ব্যবসায় এবং আদিম অধিবাসীর নামোল্লেখ দেখিতে পাই। পৌরাণিক সময়ে তাহাদিগকেই কতকগুলি বিভিন্নজাতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ত্রয়োদশ ও ষোড়শ অধ্যায়ে আমরা নিম্নলিখিত ব্যবসায় ও আদিম অধিবাসীর নাম দেখিতে পাই ঃ—স্থপতি, স্তেন, তায়ুঃ, তস্কর, মুষ্ণঃ, কুলঞ্চঃ (বিভিন্ন প্রকারের চোর ডাকাইতের নাম), সারথি, তক্ষার (সূত্রধর), রথকার, কুলাল, কর্ম্মকার, নিষাদ। এই সমুদয় ব্যবসায়ীরা স্মৃতি এবং পুরাণাদিতে সঙ্করবর্ণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সুত বা সারথিকে ক্ষত্রিয় পিতা ও ব্রাহ্মণী মাতা হইতে, তক্ষার বা সূত্রধরকে করণ পিতা বৈশ্যা মাতা হইতে, কর্ম্মকারকে শূদ্র পিতা ও অব্যক্ত মাতা হইতে উৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আর্য্য সমাজে কি বিভিন্ন শ্রেণীর স্ত্রী পুরুষ অবৈধ প্রণয় করিবার পূর্ব্বে কুলাল, কর্ম্মকার, সূত্রধর প্রভৃতি ব্যবসায় আদৌ ছিল না?

"পুঞ্জিষ্ঠের (আদিম অধিবাসী), শ্বনিন (অনার্য্য জাতি বিশেষ), মাগধ (অনার্য্য জাতি বিশেষ) পুরাণে এই জাতি বৈশ্য পিতা ও ক্ষত্রিয় মাতা হইতে সম্ভূত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সুতও সঙ্কর বর্ণ বলিয়া উল্লিখিত আছে, কোন স্থানে ক্ষত্রিয় পিতা ব্রাহ্মণী মাতা ও কোন স্থানে বৈশ্য পিতা ক্ষত্রিয় মাতা হইতে সম্ভূত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অযোগ (খনিতে কার্য্যকারী), পুংশ্চলু (পরদার অভিমর্ষকা), শৈলুষ (নট), খনিকার, বপ (কৃষক);* ইষুকার, ধনুষ্কার, ভিষক, জাতি প্রথা প্রচলিত হওয়ার পরেও ব্রাহ্মণেরাই চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু এখন চিকিৎসক

ব্যবসায়ীকে ব্রাহ্মণ পিতা বৈশ্যা মাতা হইতে সম্ভূত বলিয়া বলা হইয়া থাকে)। নক্ষত্রদর্শ, হস্তিপ, (মাহুত), অশ্বপ (সহিস), গোপাল, সুরাকার, গৃহপ (দ্বারবান), বিত্তধ (খাজাঞ্চী), অমুক্ষত্তা (চাকর), দার্ব্বাহার (কাঠুরিয়া), অগ্নেধ (আলোওয়ালা), অভিষেক্তা (পাচক), পরিবেশনকর্ত্তা, পেশিত (চিত্রকর), প্রকরিতা (খোদাইকর), উপসেক্তা (স্নানকারক), উপমন্থিতা (তৈল মর্দ্দনকারী), বাসপুলালী (রজক), রজায় স্ত্রী (রঙ্গদার), স্তেনহৃদয় (নরসুন্দর), ক্ষত্তা (সারথী), চর্ম্মম্ন (চর্ম্মকার), ধৈবর, কৈবর্ত্ত (ইহাদিগকেও পুরাণে বর্ণসঙ্কর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে)। কিরাত (অনার্য্য জাতি বিশেষ) পৌল্‌কস (অনার্য্য জাতি বিশেষ), দুর্মদ, ভিমল (অনার্য্য জাতি বিশেষ)। আভির বা গোপাল, রজক, নরসুন্দর, সারথী, চর্ম্মকার, ধীবর, কৈবর্ত্ত ইত্যাদিদিগকেও পুরাণে ও সংহিতায় বর্ণসঙ্কর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। উপরিউক্ত ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে আভিরকে গোপ পিতা ও বৈশ্য মাতা হইতে, চর্ম্মকারকে আভির পিতা বৈশ্য মাতা হইতে, ধীবরকে গোপ পিতা ও শূদ্র মাতা হইতে, নটকে মালাকার পিতা ও শূদ্র মাতা হইতে সম্ভূত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

উপরের লিখিত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, কতকগুলি অনার্য্য জাতি এবং কতকগুলি ব্যবসায়ের নামমাত্র ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে গায়ক, কবি, বিভিন্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোক, বোবা, অন্ধ, কালা এবং কতকগুলি অন্যান্য নানারকম নামোল্লেখও আছে। মাগধ, নিষাদ, ভীমল, মৃগয়ু, এবং শ্বনিন্ প্রভৃতিরা অনার্য্য জাতি। যজুর্ব্বেদের ঐ দুই অধ্যায়ে যে সমস্ত ব্যবসায়ের উল্লেখ আছে, তাহা হইতে আর্য্যজাতির ঐ সময়ে সভ্যতার কতদূর উন্নতি হইয়াছিল, আমরা তাহাই অবগত হই। কিন্তু সঙ্করজাতি-বিভাগের সহিত উল্লিখিত জাতিদিগের কোনও সংস্রব

নাই। সঙ্করজাতি উৎপত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আর্য্যদিগের মধ্যে কর্ম্মকার কুম্ভকার সূত্রধর সারথি রত্নাকর চিত্রকর চর্ম্মকার প্রভৃতি ব্যবসায়ী লোক ছিল না, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত ও অন্যায়। বৈদিক সময়ে যে কেবল কোন জাতি-বিভাগ ছিল না তাহা নহে, কিন্তু সে সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ও ছিল। পরবর্ত্তী সময়ে যদিও ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়েরা বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন তথাপি তখনও বিভিন্ন ব্যবসায়াবলম্বী আর্য্যেরা একই জাতি ছিলেন। স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক সময়ে বিভিন্ন ব্যবসায়াবলম্বী আর্য্যগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতিরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। প্রাচীন সময়ে পৌরহিত্য ও যুদ্ধ ব্যবসায়িগণ অবশ্য বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন কিন্তু জাতি শব্দে বর্ত্তমান সময়ে আমরা যাহা বুঝি, প্রাচীন ভারতে সেরূপ কোন জাতি-প্রথা প্রচলিত ছিল না; অনেক ব্যবসা বংশগত হইয়া উঠিলেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকে জানিত যে, তাহারা একই জাতি। তাহারা একত্র পানাহার করিত, পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি কার্য্য হইত, একই ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইত; তাহারা একই জাতীয় ইতিহাসে ও একই পূর্ব্বপুরুষের গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিত"। (১)

"বর্ণসঙ্কর সম্বন্ধে মনুসংহিতাই প্রধান পুস্তক। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ইহা একখানি আধুনিক পুস্তক। পণ্ডিতগণ বলেন যে, ইহা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে। মনুসংহিতাই ভারতের প্রাচীনতম ব্যবহার শাস্ত্র নহে, আপস্তম্ব, বৌদ্ধায়ন, আশ্বলায়ন প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ খৃষ্টীয় অব্দের ২০০ হইতে ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। পদ্য মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক। মনুসংহিতা অনুষ্টুপ্ছন্দে রচিত। কিন্তু সূত্রশাস্ত্র রচনাকালে,

(১) হিন্দু পত্রিকা।

অনুষ্টুপ্‌ছন্দে, বিস্তৃত গ্রন্থ রচনাকালে ব্যবহৃত হইত না। এই পদ্যময় স্মৃতিগুলি প্রাচীন সূত্রশাস্ত্রের পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আধুনিক সংস্করণ মাত্র। মনুসংহিতা কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদান্তর্গত মৈত্রায়ণ শাখার উপরিভাগ মানব সূত্রচারণের ধর্ম্মসূত্র হইতে পদ্যে রচিত হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমানে মনু-সংহিতা বলিয়া যে গ্রন্থ দেখিতে পাই, তাহা ভৃগুর রচিত; কিন্তু তাহা মনুর রচিত বলিয়া উল্লিখিত আছে।”

আমরা এক্ষণে মনুসংহিতা ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণসম্মত কতিপয় প্রধান প্রধান বর্ণসঙ্কর জাতির উল্লেখ করিয়া তদালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

পিতার বর্ণ	মাতার বর্ণ	উৎপন্ন বর্ণ	পিতার বর্ণ	মাতার বর্ণ	উৎপন্ন বর্ণ
ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	অম্বষ্ঠ	করণ	বৈশ্য	তক্ষা বা সূত্রধর এবং রজক।
ঐ	শূদ্র	নিষাদ বা পারশব।	ব্রাহ্মণ	অম্বষ্ঠ	আভির।
ঐ	ঐ	বারুজীবী।	গোপ	শূদ্র	ধীবর ও শুড়ি
ক্ষত্রিয়	ঐ	উগ্র।	মাগধ	ঐ	শেখর, জালিক।
ঐ	ব্রাহ্মণ	সূত।			
বৈশ্য	ক্ষত্রিয়	মাগধ, গোপ।	আভীর …	বৈশ্য …	তক্ষ বা চর্ম্মকার।
ঐ	ব্রাহ্মণ	বৈদেহ।			
শূদ্র	বৈশ্য	অযোগব।	রজক …	ঐ …	ঘটজীবী।
বৈশ্য	শূদ্র	করণ।	তেলকার …	ঐ …	দোলাবাহী।
শূদ্র	ব্রাহ্মণ	চণ্ডাল।	নিষাদ …	শূদ্র …	পুক্কস।
শূদ্র	ক্ষত্রিয়	কুম্ভকার ও তন্তুবায়।	ব্রাহ্মণ …	অযোগব …	ধীগ্‌বান।
			শূদ্র …	ক্ষত্রিয় …	ক্ষেত্রি।
অম্বষ্ঠ	বৈশ্য	স্বর্ণকার ও সুবর্ণবণিক।	ক্ষত্রিয় …	শূদ্র …	নাপিত, মোদক।

পিতার বর্ণ	মাতার বর্ণ	উৎপন্ন বর্ণ	পিতার বর্ণ	মাতার বর্ণ	উৎপন্ন বর্ণ
ঐ	ব্রাহ্মণ	মালাকার।	দেবল	··· বৈশ্য ···	গণক।
বৈশ্য	ব্রাহ্মণ	তাম্বুলি ও তৈলিক।	বৈদেহিকা	করবর ···	অন্ধ্র।
			ঐ	··· নিষাদ ···	মেদ।
মালাকার···	ঐ ···	নট, শাবক	বিপ্র	··· ক্ষত্রিয় ···	মূর্দ্ধাভিষিক্ত
দস্যু	··· অযোগব···	সৈরিন্ধ্র।			(যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা)।
স্বর্ণকার ···	অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য	মলগ্রাহী (মেথর)	ক্ষত্রিয়	··· বৈশ্য ···	মাহিষ্য। (যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা)

"সংস্কার সমস্ত ত্যাগ করিয়া প্রথম তিন জাতি ব্রাত্য হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ব্রাত্য হইতে ভূর্জ্জকণ্টক, অবন্ত্য, বাতধান, পুষ্পথ এবং শৈখ জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। ক্ষত্রিয় ব্রাত্য হইতে ঝল্ল মল্ল, লিচ্ছিভী, নট, করণ, পাশ এবং দ্রাবিড় জাতি হইয়াছে। এবং বৈশ্য ব্রাত্য হইতে শুধন্বান, আচার্য্য, কুরুশ, বিজানমান মৈত্র জাতি হইয়াছে।

"নীচ ক্ষত্রিয় জাতি—পৌণ্ড্রক, উড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শাক, পারদ, প্লভ, চীন, কিরাত, দরদ। মনু বলেন, ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু এবং পাদ হইতে জাত জাতিদিগের মধ্যে যে সমস্ত জাতিকে গণ্য করা হয় নাই তাহারা ম্লেচ্ছভাষীই হউক, কি আর্য্যভাষীই হউক, দস্যু নামে পরিচিত।

"মনুতে ইহার কোন কোন জাতির ব্যবসায়ের উল্লেখও আছে। সুতগণের প্রতি গাড়ী ঘোড়ার তত্ত্বাবধানের ভার থাকিত। অম্বষ্ঠের প্রতি চিকিৎসার ভার থাকিত। বৈদেহিকগণ স্ত্রীলোকের পরিচর্য্যা করিত। মাগধেরা ব্যবসায়ী ছিলেন। নিষাদেরা মৎস্য ধরিত। অযোগবেরা সূত্রধরের কার্য্য করিত। মেদ, কুঞ্চু, অন্ধ, মদ্‌গুগণ বন্যজন্তু ধরিত। ক্ষত্রী, উগ্র, পুক্কশগণ গর্ত্তস্থ জন্তু ধরিত। ধীগ্‌বানেরা চর্ম্মব্যবসায়ী ছিল; বিনুরা

ঢাক বাজাইত। চণ্ডাল ও স্বপচদের ধন সম্পত্তি স্বরূপ কুকুর ও গর্দ্দভ ছিল; শ্মশানে শবের কার্য্যাদি করিত। উপরি উদ্ধৃত তালিকার মধ্যে আমরা বৈদ্য ও কায়স্থের কোনও উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু অনেকে করণ ও কায়স্থ এবং অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যকে একই সংজ্ঞায় নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অনেকে আবার তাহা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে করেন না। কায়স্থ জাতির উল্লেখ বিষ্ণুপুরাণে ও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাতে আছে। কায়স্থ সম্বন্ধে Hindu Civilisation under British Rule এ এইরূপ আছে —"Towards the close of the Buddhist Hindu period, the term Kayastha was applied not to a distinct caste but to men who were employed as scribes and taxgatherers men who in all likelihood, belonged partly to the Vaisya and partly to the Kshatriya caste." বৈদ্যগণের সম্বন্ধেও প্রাচীন সংহিতাদি গ্রন্থে তেমন উল্লেখ নাই। মনু মাংসবিক্রেতা সুরাবিক্রেতা প্রভৃতির সহিত বৈদ্য (চিকিৎসক) সম্প্রদায়কে শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন।

"The Modern Vaidya or physician caste does not also appear in the more ancient Sanhitas such as those of Manu and Yanjnavalka. Physicians are mentioned in those books but nowhere as distinct caste, ... Manu mentions Physicians in the same category as meat-sellers and liquor-vendors."

(Hindu Civilisation under British Rule)

"নিষাধ জাতি—ভারতের আদিম অধিবাসী ছিল। মৎস্য ও মৃগাদি শিকার দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিত। মনু তাহাদিগকে সঙ্কর জাতির তালিকা-ভুক্ত করিয়াছেন। নিষধ নামে একটী দেশ ও একটী জাতিও ছিল।

নৈষধ চরিতের নলই তাহার রাজা ছিলেন। নিষাধ ও নিষধ একই জাতির বিভিন্ন নাম বলিয়া বোধ হয়।

"উগ্র বঙ্গদেশের আগুরীরা এই উগ্র বলিয়া পরিচয় দেয়। কেবল অর্থাৎ অধুনিক মালাবার দেশের নাম উগ্র। মনু বলেন যে উগ্রেরা উগ্র-স্বভাবান্বিত ও নির্দ্দয়। যে দেশের লোকেরা উগ্রস্বভাববিশিষ্ট তাহাদিগকে আর্য্যেরা এই উগ্র নাম দিয়া থাকিতে পারেন। গহ্বরস্থ জন্তুদিগকে 'বধ করাই তাহাদিগের ব্যবসায় ছিল, কিন্তু আগুরীদের অবশ্য সেইরূপ কোন ব্যবসায় নাই।

"সুত—জাতি হয়ত গাড়ী চালাইতে সুদক্ষ থাকায় জাতি বিভাগে ঐরূপ আখ্যা পাইয়াছে। ইহা বাস্তবিক আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় এক মুহূর্ত্তের জন্যও একবার চিন্তা করিয়া দেখেন না, যে এই সমস্ত ব্যবসায় কখনই মিশ্র বিবাহের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল না। কোন ক্ষত্রিয় কোন ব্রাহ্মণীর সহিত মিলিত হওয়ার পূর্ব্বে আর্য্যদিগের রথচালক কেহই ছিল না এরূপ অনুমান করা কি মূর্খতা নয়?

"অযোগব—যজুর্ব্বেদে অযোগের উল্লেখ আছে। তাহারা খনিতে লৌহখননকারী অনার্য্যজাতি বিশেষ ছিল। কিন্তু মনুর অযোগবেরা সূত্রধর।

"ক্ষেত্রী—আমাদিগের বিশেষ সন্দেহ হয় যে, রাজপুতেরা যখন প্রাচীন ক্ষত্রিয়দিগের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন গোড়া হিন্দুধর্ম্ম হইতে পৃথক ভাবে থাকায়, ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদিগের বিরাগভাজন হওয়ায় তাঁহা-দিগকে সমাজে নীচ অবস্থাপন্ন করিয়া সেইরূপ একটী নামও দিয়াছিলেন। পঞ্জাবে বহুতর ক্ষেত্রী আছে। বীর শিখজাতিদিগের গুরুকুলও ক্ষেত্রী। গুরু নানক ও তৎপরবর্ত্তী অন্যতম নয়জন গুরু এবং তাহাদের বংশধরগণ

যদিও সাধারণতঃ ক্ষেত্রী বলিয়া পরিচিত, তাহা হইলেও তাঁহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত বলিয়া পরিচয় দেন।

"চণ্ডাল—অনার্য্য জাতি বিশেষ—বড়ই পরিতাপের বিষয়—সরল শান্ত ধর্ম্মশীল নমঃশূদ্রগণকে তাহাদিগের স্বজাতীয় অজ্ঞ হিন্দুভ্রাতৃগণ অযথা অন্যায়রূপে চণ্ডাল আখ্যায় অভিহিত করিয়া—তাহাদের প্রাণে গভীর বেদনা দিয়া থাকেন। কাজেই ভিন্ন ধর্ম্মী গভর্ণমেণ্টও তাঁহাদিগকে চণ্ডাল সংজ্ঞাতেই গণনা করিয়া থাকেন। ১৮৯১ সালের আদমসুমারী বিবরণীতে তাহাদের সংখ্যা ১৭৬১৩৬৪ ছিল এবং তাহারা যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ এবং ঢাকা এই কয় জেলাতেই অধিকাংশ বাস করে। তাহারা কঠিন পরিশ্রমী। এ প্রদেশে জমি, তাহারাই চাষ করে। মনু বলেন, শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে চণ্ডালের উৎপত্তি।

অধ্যাপক রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার 'Ancient India' নামক গ্রন্থে এই জাতি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—"(শববহন ও দাহনকারী) চণ্ডালদিগের পরস্পরের মধ্যে এরূপ একটী শারীরিক ও মানসিক সাদৃশ্য আছে যে, তদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে তাহারা একটী স্বতন্ত্র জাতি। এই জাতি কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে? মনু বলেন, শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে তাহাদের জন্ম। প্রাচীন কালে দক্ষিণ পূর্ব্ববঙ্গে কোন সময়েও ব্রাহ্মণের সংখ্যা বেশী ছিল না, এবং বর্ত্তমান সময়েও উপরোক্ত পাঁচ জেলাতে ২৫ লক্ষ ব্রাহ্মণও হইবে না; এরূপ অবস্থায় ঐ সব জেলাতে ১৭ লক্ষাধিক চণ্ডাল কিরূপে জন্মিল? মনুর মতে এই প্রশ্নের কি সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া যাইতে পারে? (১) আমরা কি অনুমান করিব যে সুন্দরী

(১) কর্ণেল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "ধ্বংসোন্মুখ জাতি"তে যুক্তবঙ্গে ব্রাহ্মণ সংখ্যা প্রায় ১১ লক্ষ এবং নমঃশূদ্রের সংখ্যা প্রায় ১৮ লক্ষ বলিয়া উক্ত ও সংগৃহীত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণগণ অনবরত কৃষ্ণকায় শূদ্র সাধারণের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইয়া আসিয়াছেন? আমরা কি অনুমান করিব যে স্ফূর্ত্তিবান্ শূদ্রেরা একটী নূতন জাতি সৃষ্টি করার অভিপ্রায়ে, সহস্র সহস্র সুন্দরী অথচ দুর্ব্বলচিত্ত ব্রাহ্মণ-কন্যাকে কুপথে আনয়ন করিয়াছে? অথবা আমরা কি ইহাই অনুমান করিব যে, রাজানুগৃহীত ও পৌরহিত্য ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-সন্তান অপেক্ষা এই চণ্ডালদিগের বংশধরগণ মৎস্যবহুল জলাভূমি ও গণ্ডগ্রামে নানাবিধ দুঃখকষ্টের মধ্যে থাকিয়াও বেশী হইয়া পড়িয়াছিল? ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই অনুমানগুলিও যেরূপ অসম্ভব, মনুর প্রচারিত সঙ্করজাতির বিবরণও সেইরূপ অস্বাভাবিক।"

'আমরা পুরাণে দেখিতে পাই যে, দেবী চণ্ড ও মুণ্ড নামক দুইটী অসুর সেনাপতিকে বধ করিয়াছিলেন, তাহারা হয়ত এই চণ্ডাল ও ছোটনাগপুরের মুণ্ডাদিগের দলপতি ছিল।"

"হিন্দুদিগের মধ্যে 'চণ্ডাল' এই শব্দটী বড়ই ঘৃণাব্যঞ্জক। আজকাল নমঃশূদ্রগণের মধ্যে অনেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া উচ্চ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। শিক্ষা সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইয়াছেন। ইহাদিগের প্রতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শন না করিয়া বরং নানারূপে উৎপীড়ন করিয়া আসিতেছেন। বলা বাহুল্য ইহার ফল ও পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয়।"

শাস্ত্র ও কলমের খোঁচা হইতেই যত অনর্থের উৎপত্তি। শাস্ত্রকার যদি মানব সাধারণকে হীন ভাবে চিত্রিত না করিতেন তবে কি সমাজে উচ্চ নীচ আর্য্য ম্লেচ্ছ ব্রাহ্মণ চণ্ডালের বৈষম্য উপস্থিত হইত? সে শাস্ত্রেও আবার কত গোলযোগ ও গরমিল। এই চণ্ডাল সম্বন্ধে ব্যাস সংহিতায় লিখিত আছে :—

* * * *

কুমারী সম্ভবস্তেকঃ সগোত্রাং দ্বিতীয়কঃ ॥৯

ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজনিতশ্চাণ্ডালস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।

"চণ্ডাল তিন প্রকার (১ম) অবিবাহিতা কন্যাতে উৎপন্ন সন্তান; (২য়) সগোত্রা পত্নীর গর্ভজাত; (৩য়) ব্রাহ্মণীতে শূদ্রজনিত।"

পরাশরনন্দন ব্যাস পুনরায় বলিতেছেন ঃ—

* * * * *

বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ ॥১০

বণিক-কিরাত-কায়স্থ-মালাকার-কুটুম্বিনঃ।

বরটো মেদ-চণ্ডাল-দাস-শ্বপচ-কোলকাঃ ॥১১

এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ।

এষাং সম্ভাষণাৎ স্নানং দর্শনাদর্কবীক্ষণম্ ॥১২

ব্যাস সংহিতা।

বর্দ্ধকী, নাপিত, গোপ, আশাপ, কুম্ভকার, বণিক, কিরাত, কায়স্থ, মালী, বরট, মেদ, চণ্ডাল, কৈবর্ত্ত, শ্বপচ, কোলজাতি, আর যাহারা গো· মাংস ভক্ষণ করে তাহারা সকলেই অন্ত্যজ। ঐ সকল অন্ত্যজ জাতীয় শূদ্রের সহিত আলাপ করিলে স্নান করিতে হয়, উহাদিগকে দেখিলে সূর্য্য দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়।"

আপনাদের সাধের সংহিতাকারগণ নাপিত, গোপ, কুম্ভকার, বণিক, ব্যাধ, মালী, চণ্ডাল, কৈবর্ত্ত, শ্বপচ প্রভৃতিকে অন্ত্যজ জাতীয় গণ্য করিয়া বঙ্গের উচ্চ শ্রেণীর কায়স্থগণকেও উহারই অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। শুধু এই পর্য্যন্ত লিখিয়া শাস্ত্রকার অব্যাহতি দিলেও ক্ষতি ছিল না, ইহার উপর ইহাদিগকে গোখাদক জাতির জ্ঞাতি গোত্র মধ্যে পরিগণিত করিয়া ন্যায়ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিতে ত্রুটি করেন নাই। অন্ত্যজ জাতির সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া অত্রি বলিতেছেন ঃ—

রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।
কৈবর্ত্ত-মেদ-ভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ ॥১৯৫

অত্রি সংহিতা।

"রজক, চর্ম্মকার, নট (নাটক যাত্রা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহকারী) বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ ও ভিল্ল এই সাতটী জাতিকে অন্ত্যজ কহে।"

"কৈবর্ত্ত—উহারা সঙ্কর জাতি নহে। যজুর্ব্বেদে কৈবর্ত্ত জাতির উল্লেখ আছে। বঙ্গ দেশের কৈবর্ত্তগণের সংখ্যা দুই নিযুত অর্থাৎ বঙ্গের হিন্দু-দিগের অষ্টমাংশেরও অধিক হইবে। মেদিনীপুর, হুগলি এবং হাবড়ায় তাহাদের অধিকাংশের বাস। এই জাতি সম্বন্ধে অধ্যাপক রমেশ্চন্দ্র দত্ত বলিয়াছেন যে, "মনুর মতে একই আকৃতি ও প্রকৃতি বিশিষ্ট এবং একই নির্দ্দিষ্ট অংশের অধিবাসী এই অসংখ্য লোক, সহস্র সহস্র অযোগব স্ত্রীলোক স্বীয় স্বীয় স্বামী পরিত্যাগ করিয়া নিষাদ পুরুষের সহিত মিলিত হওয়ায় যে সব সন্ততি হয়, তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। একথা কি কোন বিজ্ঞ পাঠক বিশ্বাস করিবেন?"

এইরূপে আরও কতকগুলি জাতিকে অযথা সঙ্কর জাতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশে বাস করা নিবন্ধন সেই দেই দেশের নামানুসারে ইহাদের নাম হইয়া যায়। অভিরা দেশের লোককে আভির, উত্তর বঙ্গের আদিম অধিবাসীদিগকে পুণ্ডরক, উড়িষ্যা দেশবাসীকে উড়, দক্ষিণ ভারতের লোককে দ্রাবিড়, কাবুলবাসীকে কাম্বোজ, ব্যাকট্রীয়ান গ্রীকদিগকে যবন, টিউরেনিয়াবাসীকে শাক, পারস্তবাসীকে প্লভ, চীনবাসীকে চীন, আদিম পার্ব্বত্য জাতিকে কিরাত, উত্তর ভারতীয় পর্ব্বতবাসীকে খস জাতি বলা হইয়াছে। কাশ্মীরের নিকট বর্ত্তমান দার্দিস্থানবাসীকে দারদ, পশ্চিম মালববাসীকে অবন্ত্য, দক্ষিণ নেপালবাসীকে লিচ্ছিভি এবং

নেপালবাসীকে মাল্ল বলা হইত। বর্ত্তমান তেলাঙ্গনাই প্রাচীন অন্ধ্র দেশ। অন্ধ্রগণ ঐ দেশবাসী ছিলেন।”

চারি বর্ণ ব্যতীত যে সকল সঙ্কর জাতির উল্লেখ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, তাহা প্রদর্শিত হইল এবং ঐ সকল শঙ্কর জাতির উদ্ভব সম্বন্ধে শাস্ত্রে যেখানে যাহা আছে, তাহা যে যুক্তিসিদ্ধ তাহাও প্রদর্শিত হইল। উহার সকল অংশই প্রক্ষিপ্ত এবং পরবর্ত্তী লেখকগণের চতুরতার নিদর্শন, ইহা বেশ অনুমান করা যায়। শাস্ত্রে আছে, ব্রাহ্মণ বৈশ্য-কন্যা বিবাহ করিলে সেই সঙ্গজাত সন্তান অম্বষ্ঠ জাতি। অসবর্ণ বিবাহ তৎকালে সমাজে যে প্রচলিত ছিল তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রমাণ সহ প্রদর্শন করিয়াছি এবং মনুসংহিতারও অনুকূল মত দেখাইয়াছি সুতরাং যখন অসবর্ণ বিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল, তখন পিতা ও মাতার বর্ণ—পৃথকই থাকিত, কিন্তু সন্তান অন্য জাতি হইবে কেন? অম্বষ্ঠ জাতি ব্রাহ্মণের ঔরসোৎপন্ন এবং অসবর্ণা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়াও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইবে না, ব্রাহ্মণ-কন্যা বিবাহ করিতে বা ব্রাহ্মণকে কন্যা দান করিতে পারিবে না ইহা অসম্ভব। ব্রাহ্মণ শূদ্র-কন্যাকে বিবাহ করিলে, সন্তান হইবে—নিষাদ ও বারুজীবী বা বারুই; ক্ষত্রিয় কন্যাকে বিবাহ করিলে তৎসঙ্গজাত সন্তান হইবে সুত বা মালাকার; ক্ষত্রিয় শূদ্র কন্যাকে বিবাহ করিলে সন্তান হইবে উগ্র, নাপিত, মোদক ইত্যাদি। অর্থাৎ মনু স্পষ্টতঃ বলিতে চাহেন যে অসবর্ণ বিবাহোৎপন্ন সন্তান—পিতার বর্ণও প্রাপ্ত হইবে না, মাতার বর্ণও প্রাপ্ত হইবে না; সে ভিন্ন এক বর্ণ প্রাপ্ত হইবে।

কিন্তু আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রে ও ইতিহাসগ্রন্থে তো এরূপ বিধান কুত্রাপি দেখিতে পাই নাই। এ যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন মত ও সম্পূর্ণ নূতন কথা।

মহাভারতে কথিত আছে, মহর্ষিগণ-নিষেবিতা জহ্নুতনয়া বরবর্ণিনী

দিব্যরূপা ত্রিপথ-গামিনী গঙ্গাদেবী ক্ষত্রিয়বংশাবতংশ মহারাজ শান্তনুর ঔরসে অমিতপরাক্রমশালী ক্ষত্রিয়-বংশোজ্জ্বল দেবব্রত ভীষ্মকে প্রসব করিয়াছিলেন। এটী অসবর্ণোৎপন্ন সন্তান, মনুর মতে পিতৃ ও মাতৃ বর্ণ না হইয়া তৃতীয় কোন পিশাচ বা ব্রহ্মদৈত্য হওয়া উচিত ছিল। পিতৃ সম্বন্ধে ক্ষত্রিয় পুত্র ক্ষত্রিয় হইলেন। ধীবর-কন্যা সত্যবতীর গর্ভে পরাশর ঋষি যাঁহাকে জন্মদান করেন তিনিও পিতৃ সম্পর্কে ভারত-বিখ্যাত ঋষি—মহর্ষি বেদব্যাস। এটিও অসবর্ণ-উৎপন্ন সন্তান। . মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ভারতবংশের রক্ষার নিমিত্ত বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে বধূ অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু এবং অপ্সরোপমা এক দাসীর গর্ভে ধর্ম্মাত্মা বিদুরকে জন্ম প্রদান করেন। এগুলিও অসবর্ণোৎপন্ন ও মাতৃ সম্বন্ধে ইহারা সকলেই ক্ষত্রিয় ও শূদ্র হইয়াছিলেন। যুধিষ্টিরাদি পঞ্চ পাণ্ডবের জন্মও অসবর্ণ সম্পর্কিত, মাতৃ বর্ণে সকলেই ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন। ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যা গর্ভজাত যুযুৎসু নামক এক মহারথ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। চন্দ্রবংশীয় দেবমীঢ় রাজ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-কন্যা বিবাহ করেন। ক্ষত্রিয় কন্যার গর্ভে বসুদেব পিতা শূর সেন ও বৈশ্য-কন্যার গর্ভে (শ্রীকৃষ্ণ পিতা) নন্দগোপ জনক পর্জ্জন্য জন্মগ্রহণ করেন। পর্জ্জন্য মাতৃবর্ণানুসারে ক্ষত্রিয় পুত্র হইয়াও বৈশ্য হন। মাহিষ্য হন নাই। কাহারও কাহারও মতে দশরথ রাজমহিষী সুমিত্রা বৈশ্য-কন্যা। এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমকর্ম্মা বৃকোদর অরণ্যমধ্যে রাক্ষসী হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন, ইহাদের উভয়েই অসবর্ণোৎপন্ন, ও পিতৃ সম্বন্ধে ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন। মনুর মতানুযায়ী ইহারা সকলে অসবর্ণোৎপন্ন বিধায় পিতৃ মাতৃ বর্ণ-ভুক্ত না হইয়া এক একটি স্বতন্ত্র বর্ণান্তর্গত হওয়া উচিত ছিল। মনুর মতে বিদুরকে নিষাদ বা বারুই বলা সঙ্গত ছিল।

ভৃগুর পুত্র ঋচিক, ক্ষত্রিয় গাধিরাজার কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ

করেন। জমদগ্নি সেই সত্যবতীর গর্ভসম্ভূত। জমদগ্নি, প্রসেনজিৎ রাজার কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন। রেণুকার গর্ভে, জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম উৎপন্ন হয়েন। অতএব ক্ষত্রিয় সত্যবতীর গর্ভজাত জমদগ্নি এবং ক্ষত্রিয় কন্যা রেণুকার গর্ভজাত পরশুরাম অসবর্ণ বিবাহোৎপন্ন সত্বেও উভয়ে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন—পিতৃ সম্বন্ধে; এবং সেই পরশুরাম পৃথিবীকে বহুবার নিঃক্ষত্রিয়া করেন। পূর্ব্বে অনেক রাজকন্যার সহিত মহামুনিদিগের বিবাহ হইত ও ঐ রাজপুত্রীদিগের গর্ভে সেই সকল মহামুনির সন্তানগণ বীর্য্য প্রভাবে প্রায়শঃই ব্রাহ্মণ হইতেন, ইহা অতি প্রসিদ্ধ। ভৃগু মুনির পুত্র চ্যবনের সঙ্গে রাজকন্যা সুকন্যার বিবাহ হয়। পুত্র প্রমতি ক্ষত্রিয় হন। প্রজাপতি পুলস্ত্য ঋষি তৃণ বিন্দু রাজকন্যাকে বিবাহ করেন—পুত্র বিশ্রবা মুনিই হন। গৌতম ঋষির সঙ্গে ভর্ম্ম্যাশ্ব রাজকন্যা অহল্যার বিবাহ হয়,—পুত্র শতানন্দ ব্রাহ্মণ হন। অপুত্রক বলি রাজার স্ত্রীর ক্ষেত্রে দীর্ঘতমা ঋষি—ভারত বিখ্যাত অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, কলিঙ্গ ও পুণ্ড্র এই পাঁচ পুত্র জন্ম দান করেন। ইঁহারা ক্ষত্রিয় হন। মহাবল কর্ণ সূর্য্যদেবের ঔরসে ক্ষত্রিয়া মাতা কুন্তির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া অসবর্ণোৎপন্ন সত্বেও মাতৃ সম্পর্কে ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন, কিন্তু সুত কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হওয়ায় সুত পুত্র বলিয়া অভিহিত ছিলেন। অন্য দৃষ্টান্তের প্রয়োজন কি, মনুর তপস্যালব্ধ তৃতীয় পুত্র অঙ্গিরার ক্ষত্রিয় রথীতরের ভার্য্যাতে উৎপন্ন পুত্রগণ, সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। মনু স্বকৃত পুত্রকেই অসবর্ণ ক্ষেত্রে নিবৃত্ত করিয়া সঙ্কর বর্ণ উৎপাদনে বাধা প্রদান করিতে পারেন নাই, তা আবার ব্যবস্থা লিখিয়া গিয়াছেন।

জরৎকারু ঋষি অনার্য্য রাজা বাসুকির ভগিনীকে বিবাহ করেন এবং এই দম্পতির পুত্র আস্তিক ঋষিই আর্য্য অনার্য্যের বিবাহ বিগ্রহে সন্ধি ও শান্তি সংস্থাপন করেন।

"রামায়ণের আদি কাণ্ডে বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রানীর গর্ভজাত সন্তান সিন্ধু-মুনিকে হত্যা করিয়া দশরথের ব্রহ্মহত্যা হইয়াছিল। "শূদ্রায়ামস্মি বৈশ্যেন শৃণু জানপদাধিপ।" (রামায়ণ)। পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন বিশ্রবা মুনি রাক্ষস-কন্যা নিকষা সুন্দরীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ নামে তিনটি রাক্ষস পুত্র উৎপন্ন করেন। ইহাও অসবর্ণোৎপন্ন এবং মাতৃ সম্পর্কে সম্পর্কিত।

মহারাজ যযাতি অসবর্ণ বিবাহের ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রতিলোম বিবাহ অনুযায়ী দৈত্যগুরু ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করিয়া সমাজে পতিত হন নাই অথবা তৎপুত্রগণ পিতৃ মাতৃ বর্ণ ব্যতীত অন্য এক পৃথক বর্ণান্তর্গত হইয়াছিলেন বলিয়াও কেহ শ্রবণ করেন নাই বরং 'ইন্দ্র ও উপেন্দ্র', সদৃশ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ যদু ও তুর্ব্বসু নামধেয় দুইটী পুত্র উৎপাদন করিয়া মহারাজ যযাতি বিখ্যাতই হইয়াছিলেন। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ মতে ইঁহারা দুই ভাই অসবর্ণেরও নিকৃষ্ট প্রতিলোম বিবাহানুযায়ী ক্ষত্রিয় পিতা ও ব্রাহ্মণী মাতা হইতে সমুৎপন্ন নিবন্ধন সঙ্কর বর্ণভুক্ত সুত বা মালাকার জাতীয় হইয়া যান নাই। এ সম্বন্ধে অধিক প্রমাণ প্রয়োগ বাহুল্য মাত্র। মনু নিজেই বীজোৎকর্ষ স্বীকার করিতেছেন আবার তিনিই উহা অস্বীকার করিতেছেন। বীজোৎকর্ষ দেখাইয়া প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন যে, উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র হইলে 'ক হইবে, বীজের অপকর্ষতার জন্যই শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণ-কন্যার গর্ভজাত সন্তান অতি অধম চণ্ডালের জন্ম। তিনি বলিতে চাহেন, ভূমিতে সরিষার বীজ বপন করিলে—সরিষাই জন্মিবে—তিল বা তিসি, আম বা কাঁঠাল হইবে না। যদি তাহাই হয়, তবে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত বৈশ্য কন্যা, শূদ্র কন্যা, অযোগব কন্যা বা অম্বষ্ঠ কন্যার গর্ভ সম্ভূত সন্তান কেন অম্বষ্ঠ নিষাদ বারুই ধীগ্বান বা আভির হইতে যাইবে? এবং ক্ষত্রিয়ের ঔরসজাত ব্রাহ্মণীর গর্ভে বা শূদ্রার গর্ভে

উৎপন্ন সন্তানই বা কেন সূত, মালাকার, উগ্র, নাপিত বা মোদক এবং বৈশ্য-ঔরস জাত—ব্রাহ্মণ কন্যা ক্ষত্রিয় কন্যা বা শূদ্র কন্যার গর্ভজাত সন্তান কেনই বা বৈদেহ, তাম্বুলি, গোপল, করণ হইতে যাইবে? শূদ্রের ঔরসজাত ব্রাহ্মণীর সন্তান অতি নীচ চণ্ডাল হইল, কিন্তু শূদ্রের ঔরস জাত ক্ষত্রিয় কন্যার বা বৈশ্য কন্যার গর্ভজাত সন্তান জলাচরণীয় ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভূক্ত ক্ষেত্রী এবং নবশাখভুক্ত কুম্ভকার ও তন্তুবায় জাতি হইল কিরূপে? এসব ক্ষেত্রে বীজ মাহাত্ম্য গেল কোথায়?

সঙ্কর জাতির বৈজ্ঞানিকত্ব এইত প্রদর্শিত হইল। তবুও যাঁহারা ভাষ্য টীকা টিপ্পনীর দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে চাহেন, বুঝিব তাঁহাদিগকে কথা দ্বারা বুঝাইবার আর উপায় নাই। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মুখে অসবর্ণজাত সঙ্করজাতীয় বলিয়া অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যগণকে জারজ বলিতে শুনিয়াছি।

তাঁহারা শাস্ত্র উদ্ধৃত করিয়া বলেন ঃ—"ব্যভিচারেণ জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ" যদি তাহাই ধরা যায়, তবে বলা বাহুল্য ব্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুকে লইয়া ভারতগৌরব পঞ্চপাণ্ডব, বশিষ্ঠ নারদ শুকদেব ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষ সত্যকাম, দাসীগর্ভ সম্ভূত চন্দ্রগুপ্ত ও গ্রীক রাজকন্যা হেলেনায় জাত ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোক প্রভৃতি এবং বঙ্গের ব্রাহ্মণেতর সমুদয় ছত্রিশজাতি তাঁহাদের এ জারজ সংজ্ঞা হইতে নিস্তার পান নাই। অর্থাৎ তাঁহারা কলমের জোরে স্পষ্টতঃ বলিতেছেন ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর সকলেই জারজ সন্তান। বাপ পিতামহগণও ইঁহাদের হাতে নিস্তার পান না। ইঁহাদের পিতৃ পিতামহ শাস্ত্রকার আর্য্যঋষিগণ যদি সশরীরে বঙ্গদেশে আগমন করিতেন— তাঁহাদের উপযুক্ত বংশধরগণের শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ও ব্যবস্থা দর্শনে নিরতিশয় লজ্জিত হইতেন না কি? ধীবরকন্যা সত্যবতী নন্দন বেদব্যাসের বর্ত্তমানশুচিবাইগ্রস্ত হিন্দুসমাজে কি নিগ্রহ ও লাঞ্ছনাভোগই না হইত, ভাবিতে কষ্ট হয়।

আমরা জিজ্ঞাসা করি এই ব্রাহ্মণেতর সমুদয় সঙ্করবর্ণ কি বিবাহিত দম্পতির সন্তান? যদি বিবাহিতা বনিতা না হইয়া উপপত্নী হয় তবে ঐ গর্ভজাত সন্তান সমাজে স্থান লাভ করিবে কেন? যে সময়ে ব্যভিচার ভয়াবহ দোষজনক, যাহার দণ্ড ক্ষত্রিয় রাজবিধানে প্রাণদণ্ড ছিল, সে সময় ব্যভিচারজাত কোটী কোটী সন্তান জীবিত থাকা কি সম্ভব? শুধু জীবিত থাকা নহে, প্রতিপত্তির সহিত সমাজের অঙ্গীয়রূপে প্রাচীন কাল হইতে অবস্থান করিয়া আসিতেছে। সমাজে কি এখনও ব্যভিচার নাই? সে সকল সন্তান কি কালের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতেছে? বিবাহিত পত্নীর গর্ভজাত পুত্র যদি পিতা বা মাতার জাতীয় না হইল তবে অসবর্ণ বিবাহ কি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠনের উদ্দেশ্যেই আরব্ধ হইয়াছিল?

সঙ্কর বর্ণ প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ঊনবিংশ সংহিতার অনুবাদ স্থানে—সঙ্করবর্ণকে বিবাহিতা ভার্য্যা হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। (ঊনবিংশ সংহিতা ১৪২ পৃষ্ঠা) পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে—অনেক রাজা ব্রাহ্মণ কন্যা ও অনেক ব্রাহ্মণ রাজকন্যা বিবাহ করিয়াছেন—তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ কিন্তু নূতন কিছুই হন নাই। পিতৃ বা মাতৃ বর্ণই প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীহট্ট জেলায় শুনিয়াছি বৈদ্য কায়স্থে বিবাহ প্রচলিত আছে—তাঁহাদের উৎপন্ন সন্তান পিতার বর্ণই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিবাহ প্রথাই যদি শাস্ত্রসম্মত, দেশাচারগত ও সমাজ প্রচলিত থাকে তবে সে বিবাহ-উৎপন্ন সন্তান কেন অন্য এক পৃথক বর্ণভুক্ত হইতে যাইবে? ব্রাহ্মণগণের মধ্যে তিন সমাজ—রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক, ইহাঁদের মধ্যে বিবাহ প্রথা নাই। কিন্তু যদি কাল ধর্ম্মে বিবাহ প্রথা আরম্ভ হয় তবে কি রাঢ়ী বারেন্দ্র উৎপন্ন সন্তান মালাকার কি কুম্ভকার হইবে? সুধিগণ, একটু চিন্তা করিলেই শাস্ত্রকারের প্রহেলিকা ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন। সবর্ণ বিবাহই হউক আর অসবর্ণ বিবাহই হউক

উৎপন্ন সন্তান যে অধিকাংশ স্থানেই (কোন কোন ক্ষেত্রে মাতৃবর্ণও প্রাপ্ত হয়) পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হয়—তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। অত্রি সংহিতায় আছে ঃ—

* * * * * * * * *

কামতস্তু প্রসূতো বা তৎসমো নাত্র সংশয়ঃ।

স এব পুরুষ স্তত্র গর্ভোভূত্বা প্রজায়তে ॥ ১৮৪

"যদি জ্ঞানপূর্ব্বক ঐ সকল স্ত্রী (চণ্ডাল ম্লেচ্ছ শ্বপচ প্রভৃতির স্ত্রী) গমন বা গমন দ্বারা সন্তান উৎপাদন করে, তাহা হইলে ঐ উপভোক্তা পুরুষ, ঐ স্ত্রীর সমজাতি হইবে ; সেই পুরুষই সেই স্ত্রীর সন্তান হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।"

এখন জিজ্ঞাস্য, যদি নীচ বর্ণীয়া অবিবাহিতা স্ত্রী গমন করিলে জনক ও তজ্জাত সন্তান মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হয়, তবে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন কালের অসবর্ণোৎপন্ন সন্তান কেন পিতৃ বা মাতৃবর্ণভুক্ত না হইয়া স্বতন্ত্র আর এক বর্ণীয় (সঙ্কর বর্ণীয়) হইবে ?

"ব্রাহ্মণাদি চারি জাতির সবর্ণ বিবাহজাত অসংখ্য সন্তান কি দেশের পক্ষে পর্য্যাপ্ত ছিল না। শোণিত-সম্মিশ্রণ সংঘটিত নূতন জাতি না গড়াইলে বুঝি আর পারা যাইত না। * * * * * হিন্দু সমাজের বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক বোধে অনার্য্য সংসর্গ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল ; সেই সকল অনার্য্য কুটুম্ব ও তৎসংসর্গজাত আর্য্য সন্তানেরা যাহাতে জাতিভেদের মধ্যে স্থান পান, তাহাই করিতে গিয়া এই সকল গোঁজামিল দিতে হইয়াছে। ম্লেচ্ছ যবন খশ প্রভৃতিকেও হিন্দু সন্তান করা হইয়াছে। ম্লেচ্ছ যবন প্রভৃতির অদ্ভুত উৎপত্তি বলিলেই উহারা আর্য্য সন্তান হইবে, তাহার অর্থ কি ? যেখানে আর স্ত্রী পুরুষ দুটী মিলান যায় নাই, সেখানে পুরুষের হস্ত পদাদি হইতেই কত জাতির উৎপত্তি বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের

বেনের বৃত্তান্তগুলি নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিলে ইহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের বচনেও বেণাঙ্গ হইতে ম্লেচ্ছাদির উৎপত্তি বর্ণিত যইয়াছে। ক্রিয়া লোপ হেতু শূদ্রত্ব প্রতিপাদন করিতে গিয়া মনু বলিতেছেন :—

শনকৈস্তু ক্রিয়া লোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রহ্মণা দর্শনে ন চ ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্র দ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদা পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতাঃ খরদাঃ খশাঃ ॥

ক্রিয়ালোপের জন্য এই সকল ক্ষত্রিয় জাতি বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। পৌণ্ড্র, ঔড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, চীন, কিরাত ইত্যাদি কি সত্যই আর্য্য জাতি? চীন কি আচারভ্রষ্ট ক্ষত্রিয় জাতি? হিন্দুর গণ্ডিতে যবন, ম্লেচ্ছ, চীনকে স্থান দিতে হইয়াছে,—গোঁজামিল আর কাহাকে বলে! কতকগুলি জাতির সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ বোধ হয় তাঁহাদের ব্যবসায় অনুযায়ী করা হইয়াছিল। গোপ অর্থ গোপালক। ঐ কার্য্যটী বৈশ্যের, কিন্তু লক্ষপতি বৈশ্য কি আপনি গোপালন করিবে? কাজেই গোপালনের লোক চাই; যিনি তাহা করিয়াছিলেন, তিনি যে বর্ণেরই হউন না কেন, নাম গোপ। সহদেবকে ত বিরাট পুরে "গোপাল" বলা হইত। এখনকার গোয়ালের নূতন জন্ম না হইলে শাস্ত্রের মহিমা থাকে কি? শঙ্খকার তাম্বুলি, তিলি ইত্যাদির মূলও ঐরূপ। এই সকল জাতির বিদ্যাবুদ্ধি ও শিক্ষা দীক্ষা ব্যবসায় বাদ দিলে, অনেকাংশে একরূপ হইয়া যায়। এদেশের অনেক জাতি ব্যবসায়ে বদ্ধ থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষাদি না করায় স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে, নচেৎ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ইত্যাদি জাতির অপেক্ষা তাহারা—সুশিক্ষা দিলে, বিশেষ কোনও অংশে ন্যূন না থাকিতে পারে। এই সকল ব্যবসায় দ্বারা পৃথগ্‌ভূত জাতির জন্মতত্ত্ব শাস্ত্রানুরূপ হইবার বিশেষ কারণ দেখা যায় না।

ফলতঃ ব্যভিচার দ্বারা এই সমাজ সংবর্দ্ধিত হইয়াছে, ইহা অযৌক্তিক। আর্য্য এবং অনার্য্য শোণিতের সংমিশ্রণে অধিকাংশ জাতি উৎপন্ন, উহা আর্য্যদের একরূপ অপরিহার্য্য বলিয়াই করিতে হইয়াছিল। অনার্য্যদেশে আসিয়া অধিকাংশ আর্য্য তাহাদের সহিত কুটুম্বিতা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" (১)

যখন আর্য্যজাতির জীবনীশক্তি ছিল তখন এইরূপ কত কত জাতিকে যে সে স্বীয় কুক্ষিগত করিয়া লইয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। "পারসীক গ্রীক হুন তক্ষক শক পারদ তুরস্ক জাঠ প্রভৃতি নানাজাতীয় লোক নানা সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। তাহারা দু' একটী আসে নাই, পঙ্গপালের মত ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়াছিল। তাহারা কোথায়? যদি গায়ের জোরে বলিতে চাও যে, তাহারা সকলেই লোপ পাইয়াছে, তবে আর কথা নাই। কিন্তু এতগুলি জাতি এবং যে জাতিগণের মধ্যে কোন কোন জাতি কালে ভারতের অদৃষ্ট-নেমির বিধাতা হইয়াছিল, যে জাতিগণের মধ্যে কণিষ্ক, শালিবাহন এবং সম্ভবতঃ শিলাদিত্য প্রভৃতি রাজচক্রবর্ত্তিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; সেই সব জাতি সংখ্যায় বা শক্তিতে নিতান্ত অল্প ও হীন ছিল না। তাহারা কি সকলেই লোপ পাইয়াছে না তদানীন্তন জীবিত হিন্দুসমাজের মধ্যেই লীন হইয়া হিন্দুসমাজের অস্থিমজ্জার সহিত মিলিয়া গিয়াছে? আবার বৌদ্ধ যুগের কথা স্মরণ করুন। বৌদ্ধ সময়ে—দুই এক বৎসর নয়, সহস্র বৎসরেরও অধিককাল যখন ভারতের অধিকাংশ লোক জাতিভেদ মানিত না, তখন সকলের সঙ্গেই সকলের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারিত। শঙ্করাচার্য্যের পর যখন হিন্দুধর্ম্ম বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ভারতময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল তখন বৌদ্ধদেরই বংশধরেরা আবার হিন্দু হইয়া গেল।

(১) শ্রীমৎ নির্ম্মলানন্দ ভারতী লিখিত—"বর্ণভেদতত্ত্ব।" হিন্দুপত্রিকা ১০ম বর্ষ, আষাঢ় ৩য় সংখ্যা।

সমুদয় বৌদ্ধগণকে সমূলে আগুনে পোড়াইয়া কি জলে ডুবাইয়া কিম্বা তরবারি সাহায্যে নিপাত করা হয় নাই—অথবা তাহাদিগকে ভারত হইতে নির্ব্বাসিত করা হয় নাই। সেই সব বৌদ্ধদের বংশধরেরা এক্ষণে কোথায়? তাহারা নির্ব্বংশ হয় নাই—সকলেই আমাদের মধ্যেই আছে। ভারতের তখন জীবনীশক্তি ছিল—পরিপাক শক্তি ছিল—তাই এতগুলি জাতিকে তাহারা হজম করিয়া ফেলিয়াছিল। ভারতের জীবনীশক্তি বৃদ্ধির জন্য এইরূপে বহুবিধ বিভিন্ন জাতিকে সে তাহার কুক্ষিগত করিয়া লইয়াছিল।"(১)

পাছে এ সম্বন্ধে সমাজে কোনরূপ গোলযোগ, উচ্চবাচ্য উপস্থিত হয় বা পরবর্ত্তীগণের মধ্যে কোনও কথা উপস্থিত হয় এই আশঙ্কা করিয়াই সম্ভবতঃ মনু ঐরূপ সমগ্র বর্ণের নবাবিষ্কার সাধন করিয়া গিয়াছেন।

(১) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কুমার ঘোষ এম, এ, লিখিত—নব্যভারতে 'ডুবিতেছি না ভাসিতেছি'।

অষ্টম অধ্যায়।

শূদ্রের প্রতি ঘোর অবিচার।

কলিকালের কর্ণধার মহর্ষি মনু শূদ্রের প্রতি কিরূপ বিধি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন এ অধ্যায়ে আমরা তাহাই আলোচনা করিব।

শূদ্রের জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বলা হইতেছে ঃ—

মঙ্গল্য ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্।
বৈশ্যস্য ধন সংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্॥ ৩১
শর্ম্মবদ্ ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্রাজ্ঞো রক্ষা সমন্বিতম্।
বৈশ্যস্য পুষ্টি সংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্যসংযুতম॥ ৩২। মনু, ২য়, অঃ।

"ব্রাহ্মণের মঙ্গলবাচক নাম রাখিবে; ক্ষত্রিয়ের বলবাচক, বৈশ্যের ধনবাচক এবং শূদ্রের হীনতাবাচক নাম রাখিবে। ৩১। ব্রাহ্মণের নামের শেষে শর্ম্ম উপপদ, ক্ষত্রিয়ের নামে বর্ম্মাদি কোনও রক্ষাবাচক উপপদ, বৈশ্যের নামে ভূতি প্রভৃতি কোন পুষ্টিবাচক উপপদ এবং শূদ্রের নামের শেষে দাসাদি কোন প্রেষ্যবাচক উপপদ যুক্ত করিবে। যেমন শুভশর্ম্মা, বলবর্ম্মা, বসুভূতি এবং দীনদাস ইত্যাদি॥ ৩২॥"

বিপ্রাণাং জ্ঞানতোজ্যৈষ্ঠং ক্ষত্রিয়াণাস্ত বীর্য্যতঃ।
বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রানামেব জন্মতঃ॥ ১৫৫
২য় অধ্যায়, মনু।

"জ্ঞানের উপর ব্রাহ্মণদিগের জ্যেষ্ঠত্ব নির্ভর করে; অধিক বীর্য্যশালী হইলে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হয়; যিনি ধনধান্যে বড় বৈশ্যদিগের মধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠ; আর অগ্র পশ্চাৎ জন্ম বিবেচনায় যে জ্যেষ্ঠত্ব, সে কেবল শূদ্রদিগের মধ্যে।" ১৫৫।

যে অতিথিকে পূজ্যপাদ আর্য্যগণ সর্ব্বদেব স্বরূপ বলিয়া মনে করিতেন, অতিথিকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া জ্ঞান করিতেন, অতিথি সেবায় যাঁহারা ধনপ্রাণ তুচ্ছ মনে করিতেন—যে অতিথিকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আর্য্য পিতামাতা স্বহস্তে অম্লান বদনে পুত্রের শিরচ্ছেদ করিতে পারিতেন, অতিথির ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাওয়া ও গৃহস্থাশ্রমের সমুদয় পুণ্য ধ্বংস হওয়া যে আর্য্যগণ একই মনে করিতেন—সেই অতিথির কথায় মনু কি বলিতেছেন শুনুন্।

বৈশ্যশূদ্রাবপি প্রাপ্তৌ কুটম্বেঽতিথি ধর্ম্মিণৌ।
ভোজয়েৎ সহ ভৃত্যৈ স্তাবানৃশংস্যং প্রযোজয়ন্॥ ১১২

তৃতীয় অধ্যায়, মনু।

"ব্রাহ্মণের গৃহে বৈশ্যশূদ্রও যদি অতিথি-ধর্ম্মী হইয়া আগত হয়, তাহা হইলে দয়ার অনুরোধে তাহাদিগকেও ভৃত্যবর্গের সহিত ভোজন করাইবে।"

চণ্ডালাদি শূদ্রজাতিকে শূকর কুক্কুট কুক্কুর প্রভৃতির সহিত গণনা করা হইয়াছে। যথা :—তৃতীয় অধ্যায়ে—

চণ্ডালশ্চ বরাহশ্চ কুক্কুটঃ শ্বা তথৈব চ।
রজস্বলা চ ষণ্ডশ্চ নেক্ষেরন্নশ্নতো দ্বিজান্॥ ২৩৯

"ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিতেছেন—এমন সময় চণ্ডাল, শূকর, কুক্কুট, কুক্কুর, রজস্বলা স্ত্রীলোক এবং ক্লীব যেন তাঁহাদিগকে দেখিতে না পায় এমন উপায় করিবে।" ৩২৯। পরাশরও বলিয়াছেন :—

"শুনা চাণ্ডালদৃষ্টো বা ভোজনং পরিবর্জ্জয়েৎ"॥ ৬৪॥

কুকুর বা চণ্ডাল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ভোজন পরিত্যাগ করিবে।"

লোকে আহারের পর কুকুর বিড়ালকে উচ্ছিষ্টান্ন দিয়া থাকে—কিন্তু মনু শূদ্রকে কুকুর বিড়াল অপেক্ষাও নিকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া উচ্ছিষ্টান্ন দিতে পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রাদ্ধং ভুক্ত্বা য উচ্ছিষ্টং বৃষলায় প্রযচ্ছতি।
স মূঢ়ো নরকং যাতি কালসূত্রমবাক্‌শিরাঃ ॥ ২৪৯

তৃতীয় অধ্যায়, মনু।

"শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া যে ব্যক্তি অবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট অন্ন শূদ্রকে দেয়, সেই মূর্খ কালসূত্র নামক নরকে অধোমুখে পতিত হয়।"

হায়! অভুক্তকে অন্ন, অন্ন নয়, উচ্ছিষ্টান্নটুকু দিলে পরকাল নষ্ট হয় এমন কথা জগতের কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রে কোনও নীতিশাস্ত্রে বোধ হয় এযাবৎ লিখিত হয় নাই—মনু তাহাও লিখিয়াছেন। এইত গেল শ্রাদ্ধের ভুক্তাবশিষ্ট অন্নদানের কথা।

এখন নিতান্তই যদি কেহ চারিটী খাইতে দিতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি—

অন্নমেষাং পরাধীনং দেয়ং স্যাদ্ভিন্ন ভাজনে।
রাত্রৌ ন বিচরেয়ুস্তে গ্রামেষু নগরেষু চ ॥ ৪৫

দশম অধ্যায়; মনুসংহিতা।

"ইহাদিগকে অর্থাৎ চণ্ডাল, শ্বপচদিগকে (যাহাদিগের বাসস্থান গ্রাম বহির্ভাগে দেয়, কুক্কুর এবং গর্দ্দভ যাহাদিগের একমাত্র ধন, মৃতের বস্ত্র পরিধেয়, ভগ্নপাত্রে ভোজন, লৌহ নির্ম্মিত অলঙ্কার আভরণ, সাধুদিগের বৈধ কর্ম্মানুষ্ঠানের সময় যাহাদিগের দর্শন নিষেধ।—৫১-৫২ শ্লোক) অন্নপ্রদান করিতে হইলে ভদ্রলোকেরা ভৃত্যদ্বারা ভগ্নপাত্রে অন্ন প্রেরণ করিবেন এবং গ্রাম বা নগরে রাত্রিকালে ইহাদের যাতায়াত একেবারে নিষেধ।"

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন :—অন্নংভূমৌ শ্বচাণ্ডাল বায়সেভ্যশ্চ নিক্ষিপেৎ ॥ ১০৩ অর্থাৎ "গৃহস্থ বৈশ্বদেবের হোম করিয়া অবশিষ্ট অন্নদ্বারা সর্ব্বভূতোদ্দেশে

বলি প্রদানপূর্ব্বক—'অনন্তর কুক্কুর চণ্ডাল বায়স ও পতিতদিগকে ভূমিতে অন্ন দিবে।"

শূদ্রকে বেদে বঞ্চিত করা হইয়াছে। মহর্ষি বেদব্যাস বলিতেছেন ঃ—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
শ্রুতিস্মৃতি পুরাণোক্ত ধর্ম্মযোগ্যাস্তনেতরে॥ ৫
শূদ্রোবর্ণশ্চতুর্থোঽপি বর্ণত্বাদ্ধর্ম্মমর্হতি।
বেদমন্ত্রস্বধা স্বাহা বষট্‌কারাদিভির্বিনা॥ ৬

ব্যাস সংহিতা।

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতি—দ্বিজশব্দ প্রতিপাদ্য; এই তিন বর্ণই শ্রুতিস্মৃতি ও পুরাণোক্ত ধর্ম্মের অধিকারী; অপরজাতি (শূদ্রাদি) অধিকারী নহে। শূদ্র জাতি চতুর্থ বর্ণ, এই জন্যই ধর্ম্মের অধিকারী কিন্তু বেদমন্ত্র ও স্বাহা, স্বধা, বষট্‌কারাদি শব্দের উচ্চারণে অধিকারী নহে।"

শূদ্রকে শাস্ত্রশিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে ঋষি অত্রি বলিতেছেন ঃ—

অকুলীনে হ্যসদ্‌বৃত্তে জড়ে শূদ্রে শঠেদ্বিজে।
এতে স্বেব ন দাতব্যমিদং শাস্ত্রং দ্বিজোত্তমৈঃ॥

৮ অত্রি সংহিতা।

"দ্বিজোত্তমগণ,—অসদ্‌বংশীয়, অসচ্চরিত্র, মূর্খ, শূদ্র এবং খল-স্বভাব দ্বিজ এই পঞ্চবিধ ব্যক্তিকে শাস্ত্রশিক্ষা দিবেন না।"

শুধু কি বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়াই নিষেধ? বেদ শ্রবণ করাও তাহাদের পক্ষে নিষেধ।

উশনঃসংহিতায় উক্ত হইয়াছে ঃ—

অন্ত্যানাং সঙ্গতেগ্রামে বৃষলস্য চ সন্নিধৌ।
অনধ্যায়ো রুদ্যমানে সমবায়ে জনস্য চ॥ ৬৫

"যে গ্রামে অন্ত্যজজাতি (নাপিত, গোপ, কুম্ভকার, বণিক, ব্যাধ,

কায়স্থ, মালাকার, চণ্ডাল, কৈবর্ত্ত, শ্বপচ ইহারা সকলেই অন্ত্যজ। ব্যাস-সংহিতা ১০।১১।১২।) বাস করে সেই গ্রামে, বহুলোক সমাগম স্থলে বেদ অধ্যয়ন নিষিদ্ধ।"

শূদ্রকে কোনও প্রকার উপদেশ—তাহা লৌকিকই হউক আর পারমার্থিকই হউক দেওয়া হইবে না। মনু চতুর্থ অধ্যায়ে বলিতেছেন :—

ন শূদ্রায়মতিং দদ্যান্নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতম্।
ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ॥ ৮০

"শূদ্রকে লৌকিক বিষয়ে কোন উপদেশ দিবে না, অদাস শূদ্রকে উচ্ছিষ্ট দিবে না, হুতশেষ দিবে না,—কোন ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবে না, কিম্বা কোনরূপ ব্রত করিতে আদেশ দিবে না॥ ৮০।"

যদি দাও তবে :—যো হ্যস্য ধর্ম্মমাচষ্টে যশ্চৈবাদিশতিব্রতম্।
সো ঽসংবৃতং নামতমঃ সহতেনৈব মজ্জতি॥ ৮১

"যে ব্রাহ্মণ ইহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, অথবা ব্রতানুষ্ঠানের আদেশ করেন, তিনি সেই শূদ্রের সহিত অসংবৃত নামক নরকে নিমগ্ন হন।"

শূদ্র দূরে থাকুক আজকাল কোল ভিল সাঁওতাল নাগা প্রভৃতি অসভ্য নরনারীকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া তাহাদিগকে যথার্থ মানুষ করিবার জন্য কত মহাপ্রাণ নরনারী যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—তাহার ইয়ত্তা নাই। আর্য্যসমাজের পূতহৃদয় মহাপ্রাণ প্রচারকগণ, খৃষ্টীয় নরনারীগণ, ব্রাহ্ম-সমাজের উদারহৃদয় প্রচারকগণ দলে দলে নিম্নজাতিকে শিক্ষাদানের জন্য, পার্ব্বত্য-অসভ্য জাতিগণের হৃদয় মন্দিরে ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ ফুটাইয়া দিবার জন্য, এক কথায় তাহাদিগকে মানুষ করিবার জন্য সমুদয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়া প্রাণপণে খাটিতেছেন, আর আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকার মনু

কিনা—তাহাদিগকে অন্ধকারে কাদার মধ্যে ডুবাইয়া মারিবার উপদেশ দিতেছেন। হায় রে শাস্ত্রকার। হায় রে ধর্ম্ম !

আবার বলিতেছেন :—ন সংবসেচ্চ পতিতৈর্ন চাণ্ডালৈর্ন পুক্কশৈঃ।

ন মূর্খৈর্নাবলিপ্তৈশ্চ নান্ত্যৈর্নান্ত্যাবসায়িভিঃ॥ ৭৯

"পতিত, চণ্ডাল, পুক্কশ, মূর্খ. ধনাদিমদে গর্ব্বিত ব্যক্তি, রজকাদি নীচ জাতি এবং অন্ত্যাবসায়ী ইহাদের সহিত কিয়ৎক্ষণের জন্যও এক ছায়াতে বাস করিবে না।"

(ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রা হইতে জাত পুত্রের নাম নিষাদ। নিষাদ হইতে শূদ্রাতে জাত যে পুত্র তাহাকে পুক্কশ বলে এবং নিষাদ পত্নীতে চণ্ডালজাত পুত্রের নাম অন্ত্যাবসায়ী। মনু, পতিত চণ্ডাল মুর্খের সহিত এক ছায়াতে বসিতে নিষেধ করিতেছেন—কেননা পাছে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতড়িৎ যদি উহাদের সংস্পর্শে নষ্ট হইয়া যায় এই ভয় !

আমরা বলি কি—পতিত চণ্ডাল মুর্খ অধমের জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া না উঠিয়াছে, তাহাদিগের অশ্রুবারি মোচন করিবার জন্য যাহাদের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া না উঠিয়াছে, তাহাদিগকে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিবার জন্য যাহাদিগের বাহু আগ্রহের সহিত প্রসারিত না হইয়াছে—তাঁহারা আবার মানুষ ? তাঁহারা আবার ব্রাহ্মণ ? তাঁহারা আবার ধার্ম্মিক ? পতিত মূর্খকে ভালবাসার পরিবর্ত্তে যাঁহারা এমন করিয়া ঘৃণা করিতে পরামর্শ দেন—তাঁহারা কি ঋষি ? ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়নের যোগ্য ব্যক্তি ?

শূদ্রকে বেদ পাঠের অধিকার দেওয়া ত দূরের কথা বেদ শ্রবণের অধিকার হইতেও বঞ্চিত করা হইয়াছে :—যথা "ন শূদ্রজন সন্নিধৌ"। (৯৯ চতুর্থ অধ্যায়) অর্থাৎ শূদ্র ও জনতা সমীপে বেদ পড়িবে না।

শূদ্রকে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ও পাপহীনতার প্রমাণ প্রদর্শনের জন্য কিরূপ কঠোর কর্ম্ম করিতে হইত নিম্নে তাহা লিখিত হইতেছে।

মনু অষ্টম অধ্যায়ে বলিতেছেন :—

"সত্যেন শাপয়েদ্বিপ্রং ক্ষত্রিয়ং বাহনায়ুধৈঃ।
গো বীজ কাঞ্চনৈর্বৈশ্যং শূদ্রং সর্ব্বৈস্তু পাতকৈঃ॥ ১১৩
অগ্নিং বা হারয়েদেনমপ্সু চৈনং নিমজ্জয়েৎ।
পুত্রদারস্য বাপ্যেনং শিরাংসি স্পর্শয়েৎ পৃথক্॥ ১১৪
যমিদ্ধো ন দহত্যগ্নিরাপো নোন্মজ্জয়ন্তি চ।
ন চার্ত্তিমৃচ্ছতি ক্ষিপ্রং স জ্ঞেয়ঃ শপথে শুচিঃ॥ ১১৫

"ব্রাহ্মণকে সত্য দ্বারা শপথ করাইতে হয়। ক্ষত্রিয়কে তাহার হস্তাশ্ব বা আয়ুধ দ্বারা; বৈশ্যকে তাহার গো, বীজ বা কাঞ্চন দ্বারা এবং শূদ্রকে সমুদয় পাতক দ্বারা শপথ করাইতে হয়। ১১৩। অথবা শূদ্রকে অগ্নি-পরীক্ষা, জলপরীক্ষা কিংবা স্ত্রী পুত্রাদির শিরঃস্পর্শরূপ পরীক্ষা করাইবে। ১১৪। অগ্নি যাহাকে দগ্ধ না করে, জল যাহাকে শীঘ্র ভাসাইয়া না তোলে এবং স্ত্রী পুত্রাদির মস্তক স্পর্শে—উহাদিগের শীঘ্র যদি কোন পীড়া না জন্মে, তবে শপথ সম্বন্ধে যে ব্যক্তিকে শুচি বলিয়া জানিবে।" ১১৫।

অগ্নিতে দগ্ধ না হওয়া রূপ ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় যে কত লক্ষ লক্ষ শূদ্র ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া হিন্দু বিচারকের করাল কবল হইতে চিরমুক্ত হইয়াছেন—তাহা কে বলিতে পারে? কয়টী শূদ্র এ ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় পাপশূন্যতা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছে? হায়! শূদ্রজীবন বালির গৃহের ন্যায় না জানি কতই ভঙ্গপ্রবণ—কতই তুচ্ছ ছিল?

এক্ষণে শূদ্রের শারীরিক কঠোর দণ্ডের কথা লিখিত হইতেছে। অষ্টম অধ্যায়ে মনু বলিতেছেন :—

"শতং ব্রাহ্মণমাক্রুশ্য ক্ষত্রিয়ো দণ্ডমর্হতি।
বৈশ্যোঽপ্যর্দ্ধশতং দ্বে বা শূদ্রস্তু বধমর্হতি॥ ২৬৭
পঞ্চাশদ্‌ব্রাহ্মণো দণ্ড্যঃ ক্ষত্রিয়স্যাভিশংসনে।
বৈশ্যে স্যাদর্দ্ধপঞ্চাশচ্ছূদ্রে দ্বাদশকো দমঃ॥ ২৬৮

*   *   *   *   *

একজাতির্দ্বিজাতীংস্তু বাচা দারুণয়া ক্ষিপন্‌।
জিহ্বায়াঃ প্রাপ্নুয়াচ্ছেদং 'জঘন্য প্রভবোহি সঃ'॥ ২৭০
নামজাতিগ্রহংত্বেষামভিদ্রোহেণ কুর্ব্বতঃ।
নিক্ষেপ্যোঽয়োময়ঃ শঙ্কুর্জ্বলন্নাস্যে দশাঙ্গুলঃ॥ ২৭১

"ব্রাহ্মণকে গালাগালি দিলে ক্ষত্রিয়ের একশত পণ দণ্ড হইবে; বৈশ্যের দেড় শত বা দুই শত পণ দণ্ড হইবে; শূদ্রের তাড়নাদির শারীরিক দণ্ড হইবে। ২৬৭। ক্ষত্রিয়কে গালি দিলে ব্রাহ্মণের পঞ্চাশ পণ দণ্ড হইবে; বৈশ্যকে গালি দিলে পঁচিশ পণ আর শূদ্রকে গালি দিলে দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে। ২৬৮। একজাতি (অর্থাৎ শূদ্র সমষ্টিকে একজাতি বলা হইয়াছে) শূদ্র যদি দ্বিজাতিদিগের / প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করে, তবে ঐ শূদ্র জিহ্বাচ্ছেদনরূপ (দয়ালু!) দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। কারণ ইহার জন্ম 'জঘন্য স্থান হইতে হইয়াছে।' বিরাট পুরুষ ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম হইল জঘন্য স্থান! ২৭০। নাম এবং জাতি তুলিয়া শূদ্র যদি দ্বিজাতির উপর আক্রোশ করে, তবে একগাছা জ্বলন্ত দশাঙ্গুল লৌহময় শঙ্কু উহার মুখে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য।" ২৭১। পুনরায় বলিতেছেন।—

ধর্ম্মোপদেশং দর্পেণ বিপ্রাণামস্য কুর্ব্বতঃ।
তপ্তমাসেচয়েৎ তৈলং বক্ত্রে শ্রোত্রে চ পার্থিব॥ ২৭২

অষ্টম অধ্যায়, মনু।

"দর্পিতভাবে শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মোপদেশ করে, তবে রাজা উহার মুখে ও কর্ণে তপ্ত তৈল নিক্ষেপ করাইবেন। ২৭২।

মনু ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন, আবার বলিতেছেন :—

"যেন কেনচিদঙ্গেন হিংস্যাচ্চেচ্ছ্রেষ্ঠমন্ত্যজঃ।
ছেত্তব্যং তত্তদেবাস্য তন্মনোরনুশাসনম্॥ ২৭৯
পাণিমুদ্যম্য দণ্ডং বা পাণিচ্ছেদনমর্হতি।
পাদেন প্রহরন্ কোপাৎ পাদচ্ছেদনমর্হতি॥ ২৮০
সহাসনমভিপ্রেপ্সুরুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ স্ফিচং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ॥ ২৮১
অবনিষ্ঠীবতো দর্পাদ্দ্বাবোষ্ঠৌচ্ছেদয়েন্নৃপঃ।
অবমূত্রয়তো মেঢ্রমবশর্দ্ধয়তো গুদম্॥ ২৮২
কেশেষু গৃহ্ণতোহস্তৌচ্ছেদয়েদবিচারয়ন্।
পাদয়োর্দাঢ়িকায়াঞ্চ গ্রীবায়াং বৃষণেষু চ॥ ২৮৩

"অন্ত্যজ অর্থাৎ শূদ্র যে কোন অঙ্গের দ্বারা শ্রেষ্ঠ জাতিকে মারিবে, রাজা তাহার সেই অঙ্গছেদন করিয়া দিবেন—ইহা মনুর অনুশাসন। ২৭৯। শূদ্র যদি শ্রেষ্ঠ জাতিকে মারিবার জন্য হস্ত বা দণ্ড তোলে, তবে রাজা তাহার হস্তচ্ছেদন করিবেন, (অর্থাৎ শূদ্র যদি ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে নাও মারে কিন্তু মারিবার জন্য শুধু হস্ত উত্তোলন করে; তাহা হইলেই তাহার হস্ত রাজা ছেদন করিয়া দিবেন।) চমৎকার বিচার! এমন ন্যায় বিচার বর্ত্তমান সময়ে কোনও সভ্যদেশে আছে কিনা জানি না। স্বর্ণলতায় পড়িয়াছিলাম একদিন শ্যামাদাসী রাগের বশবর্ত্তিনী হইয়া 'গদাধর চন্দ্রকে' বটিদা লইয়া নাক্ কাটিতে গিয়াছিল, গদাধরচন্দ্র অমনি একদৌড়ে থানায় যাইয়া শ্যামার অত্যাচার কাহিনী বলিয়া দারোগাকে অনুরোধ করিয়াছিল যে তিনি অনুগ্রহ করিয়া শ্যামাকে গ্রেপ্তার ও তাহাকে শাস্তিপ্রদান

করেন। দারোগা বাবু ইহাতে হাসিয়া উত্তর করিয়াছিলেন "শুধু নাক কাটিতে চাহিলে বা উদ্যত হইলে ত মোকদ্দমা হয় না। নাক কাটিলে তবে মোকদ্দমা, অতএব তুমি আবার যাও, বিবাদ কর, নাক কাটিয়া দিলে, তবে আসিও তখন বিচার করিব।"

আমি আইনজ্ঞ নহি, সুতরাং জানিনা দারোগার উক্তি ঠিক হইয়াছিল কিনা। এই ত গেল সংহিতা যুগের বিচার পদ্ধতি। পরে বলিতেছেন, "আর পদদ্বারা প্রহার করিলে পাদচ্ছেদ হইবে। ২৮০। শূদ্র যদি দর্প বশতঃ ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে উপবেশন করে তবে রাজা উহার কটিদেশ লৌহময় তপ্ত শলাকায় অঙ্কিত করিয়া উহাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন; অথবা যেন না মরে, (কেন না, মরিয়া গেলে ত আপদ চুকিয়াই যায়—শাস্তি ভোগ করিতে হয় না) এইরূপে তাহার পাছা কাটিয়া দিবেন। ২৮১। দর্প করিয়া শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের গাত্রে নিষ্ঠীবন অর্থাৎ থুথু নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে রাজা তাহার ওষ্ঠাধর ছেদন করিবেন; প্রস্রাব করিয়া দিলে লিঙ্গছেদন করিবেন এবং অধোবায়ু ত্যাগ করিয়া দিলে অর্থাৎ বায়ু নিঃসরণ করিলে গুহ্যদেশ ছেদন করিয়া দিবেন। ২৮২। শূদ্র অহঙ্কার পূর্ব্বক যদি হস্তদ্বারা ব্রাহ্মণের কেশ ধারণ করে, বা হিংসা জন্য তাঁহার পাদদ্বয়, দাড়িকা, গলা কিংবা অণ্ডকোষ গ্রহণ করে, তবে রাজা বিচার না করিয়া উহার হস্তদ্বয় ছেদন করিবেন।" ২৮৩।

এখন আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি না কি যে, ইহা মানবধর্ম্ম শাস্ত্র না আর কিছু? টীকা টীপ্পনী ও ভাষ্যকার কি বলেন? ইহাকে ধর্ম্মশাস্ত্র নাম না দিয়া ব্রাহ্মণাধিপত্য নাম দেওয়াই কি সঙ্গত নহে? যদি বলেন ইহা ধর্ম্মশাস্ত্র নহে তৎকালিক হিন্দু আইন গ্রন্থ, তবেত কোন কথাই নাই। তৎকালের আইনগ্রন্থ তৎকালেই শোভা পাইত, এখন আর তাহার

কোনও প্রয়োজন নাই। সুতরাং এখন আর মনুস্মৃতি মনুসংহিতার দোহাই দিবার কি প্রয়োজন? মনু স্মৃতি বা ঐরূপ যে কোন স্মৃতিকে গঙ্গাজলে ডুবাইয়া দিলেই ত সব গোলযোগ চুকিয়া যায়। কিন্তু তাহা হইবার নহে। বরং যাহাতে মনুসংহিতার বিধানাদি সমাজে প্রচলিত হইয়া দেশ ধর্ম্মময় হইয়া যায় তাহার জন্যই সকলের প্রাণপণ চেষ্টা। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"মূর্খ ক্ষত্রিয় রাজা সহায় হইলে, ব্রাহ্মণেরা যে শূদ্রদের "জিহ্বাচ্ছেদ, শরীর ভেদাদি" পুনরায় করিবার চেষ্টা করিবেন না, কে বলিতে পারে"?

দাসত্ব করিবার জন্যই যে শূদ্রের জন্ম—তাহারই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়া মহর্ষি মনু বলিতেছেন :—

শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেব বা।

দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোঽসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা॥ ৪১৩ অষ্টম অধ্যায়, মনু।

"পরন্তু শূদ্র ক্রীত হউক আর অক্রীত হউক, শূদ্র দ্বারা তিনি (রাজা) দাস্যকর্ম্ম করাইয়া লইবেন। যেহেতু বিধাতা দাস্যকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।" মনুর ঈশ্বর ত তাহা হইলে ভারি দয়াময়—ভারি ন্যায়বান্। ব্রাহ্মণ আদি উচ্চ তিন বর্ণের সেবার জন্যই শূদ্রকে সৃষ্ট করিয়াছেন। আহা, অভিজাত সম্প্রদায়ের কষ্ট কি তিনি প্রাণে থাকিতে দেখিতে পারেন? আর শূদ্র! শূদ্রেরা ত সয়তান, তাহাদের আবার সুখ দুঃখ কষ্ট যাতনা কি? খাটিবার জন্যই ভগবান্ তাঁহাদিগকে সৃষ্ট করিয়াছেন। উচ্চ তিন বর্ণের সুখ সুবিধার জন্যই তাহাদের উৎপত্তির প্রয়োজন। এইত গেল ভগবানের দিক হইতে শূদ্রের প্রতি অপার করুণা! এখন মানবদিগের দিক হইতে করুণার পরিমাণ করা যাউক। পূর্ব্বে যে, ইউরোপ আমেরিকায় দাস ব্যবসায় ছিল—মনে হয় তাহাও ভারতের এ দাস ব্যবসায় অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল। কেন না

দাসদিগকে তাঁহাদের অর্থ দ্বারা ক্রয় করিতে হইত ; দাস, অতিরিক্ত খাটুনীতে মরিয়া গেলে কিম্বা কোন অঙ্গ নষ্ট হইলে তাঁহাদের মুদ্রা অর্থ সবই নষ্ট হইয়া যাইত। কিন্তু ভারতের শূদ্র দাস দ্বারা সেরূপ ক্ষতির কোনও আশঙ্কা নাই, কেন না—তাহাদিগকে টাকা দ্বারা ক্রয় করিতে হয় না। এ দাস অতি সুলভ—বিনামূল্যে লাভ—প্রকৃতিদত্ত দাস।

কেননা মনু বলিতেছেন :—

ন স্বামিনা নিসৃষ্টোঽপি শূদ্রোদাস্যাদ্বিমুচ্যতে।
নিসর্গজং হি তৎ তস্য কস্তস্মাৎ তদপোহতি॥ ৪১৪

"শূদ্র স্বামী কর্ত্তৃক বিমুক্ত হইলেও দাসত্ব হইতে বিমুক্ত হয় না। দাসত্ব কর্ম্ম তাহার স্বাভাবিক, অতএব কে তাহাকে উহা হইতে মুক্ত করিতে পারে ?"

দাসের দেহ মনঃ প্রাণই যখন ব্রাহ্মণাদির প্রকৃতিদত্ত সম্পত্তি তখন তাহার ধনাদির ত কথাই নাই।

মনু তাহাও বলিতেছেন :—

বিস্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাদ্‌দ্রব্যোপাদানমাচাদং।
নহি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্ত্তৃহার্য্য ধনোহি সঃ॥ ৪১৭

অষ্টম অধ্যায়।

"ব্রাহ্মণ বিস্রব্ধ চিত্তে দাস-শূদ্রের ধন আত্মসাৎ ক'রতে পারেন ; যে হেতু তাহার নিজস্ব কিছুই নহে, উহার সমুদয় ধনই ভর্ত্তৃহার্য্য।"

অন্যত্র বলিতেছেন :—

যজ্ঞশ্চেৎ প্রতিরুদ্ধঃ স্যাদেকেনাঙ্গেন যজ্বনঃ।
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ ধার্ম্মিকে সতি রাজনি॥ ১১
যো বৈশ্যঃ স্যাদ্বহুপশুর্হীনক্রতুরসোমপঃ।
কুটুম্বাৎ তস্য তদ্‌দ্রব্যমাহরেদ্‌যজ্ঞসিদ্ধয়ে॥ ১২

আহরেৎ ত্রীনি বা দ্বে বা কামং শূদ্রস্য বেশ্মনঃ।
নহি শূদ্রস্য যজ্ঞেষু কশ্চিদস্তি পরিগ্রহঃ॥১৩

"যাগকারী বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের যজ্ঞ, যদি দ্রব্যাভাবে একাঙ্গ আটকাইয়া থাকে, তবে ধার্ম্মিক রাজার রাজ্যে বাস করিলে, উক্ত ব্রাহ্মণ—যে বৈশ্যের বহু ধন আছে, কিন্তু যাগ যজ্ঞ হীন ও সোম পান করে না, তাহার নিকট হইতে যজ্ঞ সিদ্ধির জন্য ঐ দ্রব্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া বা অপহরণ করিয়া উক্তাঙ্গ পূরণ করিবেন। ১১।১২ বৈশ্যের অভাবে, শূদ্রগৃহ হইতে ইচ্ছামত দুই বা তিনটী যজ্ঞীয় দ্রব্য গ্রহণ করিবে, যেহেতু শূদ্রের কোনও যজ্ঞ সম্বন্ধ নাই। ১৩।"

ব্রাহ্মণ যজ্ঞকারীকে, অভাব হইলে ধনবান্ বৈশ্য ও শূদ্রদের বাটী হইতে ঐ সকল দ্রব্য বলপূর্ব্বক অথবা চুরি করিয়া লইয়া কার্য্য সমাধা করিবার জন্য ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের রাজত্বে—মনু এই শাসন রক্ষা করিতে গেলেই এই অনুশাসন বাক্যের দর কি পরিমাণ, তাহা ভালরূপেই অনুভব করিতে পারা যায়। একেই বলে 'গরু মেরে জুতা দান।' চুরি করিয়া ধর্ম্ম কার্য্য সমাধান!! হায় রে হিন্দুশাস্ত্র, হায় ঋষিবাক্য!

বর্ত্তমান কালের ন্যায় মনুর সময়ে যাহার যে ব্যবসা ইচ্ছা সে সেই ব্যবসা করিতে পারিবে এরূপ নিয়ম ছিল না। বৈশ্য শূদ্রকে তাহাদের নিজ নিজ ব্যবসাই করিতে হইত। বৈদিক সময়ের অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা।

মনু বলিতেছেন :—

বৈশ্য শূদ্রৌ প্রযত্নেন স্বানি কর্ম্মাণি কারয়েৎ।
তৌ হি চ্যুতৌ স্বকর্ম্মভ্যঃ ক্ষোভয়েতামিদং জগৎ॥ ৪১৮

"রাজা যত্নসহকারে বৈশ্য ও শূদ্রকে স্বস্ব কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবেন—যেহেতু ঐ উভয়ে স্ব স্ব কার্য্যচ্যুত হইলে জগতে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।" ৪১৮

শূদ্রের প্রতি অত্যাচার করিতে দয়ালু ব্রাহ্মণগণ বিন্দুমাত্রও ত্রুটী করেন নাই—তাহার পরিচয় পূর্ব্বে দান করিয়াছি; আরও কিঞ্চিৎ প্রদান করিব।

মনু নবম অধ্যায়ে বলিতেছেন :—

ব্রাহ্মণান্ বাধমানস্তু কামাদবরবর্ণজম্।
হন্যাচ্চিত্রৈর্ব্বধোপায়ৈরুদ্বেজনকরৈর্নৃপঃ ॥২৪৮

"শূদ্রবর্ণ যদি কামতঃ ব্রাহ্মণকে শারীরিক বা আর্থিক পীড়া দেয়, তবে রাজা উদ্বেগকর নাসিকা কর্ণচ্ছেদাদি বিবিধ বধোপায় দ্বারা তাহাকে বধ করিবেন।" চোর প্রায়ই শূদ্র হয়—বৈশ্যের মধ্যেও ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। রাজন্য ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণের পক্ষে চুরি করার প্রয়োজন মনুর সময়ে কিছুই ছিল না। সেই সমুদয় নিম্নশ্রেণীস্থ অজ্ঞান তস্করাদির প্রতি মনু কি কঠোর বিধানই না করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে কোনও সভ্যদেশে এইরূপ আইন প্রচলিত হইলে সমুদয় সভ্যজগৎ তাহাদিগকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে না দেখিয়া থাকিতে পারিত না।

মনু আরও বলিতেছেন :—

যে তত্র নোপ সর্পেয়ুর্ম্মূল প্রণিহিতাশ্চ যে।
তান্ প্রসহ্য নৃপো হন্যাৎ সমিত্রজ্ঞাতিবান্ধবান্ ॥২৬৯

নবম অধ্যায়, মনু।

"চার প্রেরিত হইয়াও শঙ্কা বশতঃ যাহারা (যে সমস্ত চোর) আগমন না করে, হঠাৎ রাজা স্বয়ং ঐ সকল ব্যক্তিকে স্ত্রীপুত্রাদির সহিত বধ করিবেন।" একজন অপরাধীর জীবনের সঙ্গে অন্য অবশিষ্ট

নিরপরাধা স্ত্রী পুত্রের জীবন নাশ করা যে কত দূর নৃশংসতার পরিচায়ক তাহা বলিবার নহে। পরের শ্লোকেই বলিতেছেন :—"ধার্ম্মিক রাজা" মাল না থাকায় চৌর নিশ্চয় না হইলে উহাকে বিনষ্ট করিবেন না; কিন্তু চৌরের উপকরণ ও হৃত দ্রব্য সমেত চৌর নিশ্চিত হইলে কিছু মাত্র বিচার না করিয়াই উহাকে বধ করিবেন।" ২৭০

শূদ্র চোরদিগের দণ্ড সম্বন্ধে অন্য এক শাস্ত্রকার কৃপাপূর্ব্বক বলিয়াছেন :—"রাজা অপহৃত বস্তু চৌরের নিকট হইতে তৎস্বামীকে দেওয়াইয়া শূলারোহণাদি বিবিধ উপায়ে তাহার বধ দণ্ড করিবেন।" বলা বাহুল্য এরূপ দণ্ড ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের জন্য নহে। শূদ্রদের প্রতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারের কি স্নেহ!

মনুসংহিতার ন্যায় বিষ্ণুসংহিতাতেও শূদ্রের প্রতি কঠোর দণ্ডের বিধান আছে যথা :—

অথ মহাপাতকিনো ব্রাহ্মণ বর্জ্জং সর্ব্বে বধ্যাঃ ॥ ১ ॥

ন শারীরো ব্রাহ্মণস্য দণ্ডঃ" ॥ ২ ॥

পঞ্চম অধ্যায়, বিষ্ণুসংহিতা।

"ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকল বর্ণের মহা পাতকীই বধ্য। ব্রাহ্মণের দৈহিক দণ্ড নাই।" গৌতম সংহিতাও ঐ একই সুরে তান ধরিয়া তাঁহার উদার ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছেন। এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। দ্বাদশ অধ্যায়ে গৌতম বলিতেছেন :—

শূদ্রো দ্বিজাতীনভিসন্ধায়াভিহত্য চ বাগ্দণ্ডপারুষ্যাভ্যামঙ্গং মোচ্যো যেনোপহন্যাদার্য্যস্ত্র্যভিগমনে লিঙ্গোদ্ধারঃ স্বহরণঞ্চ গোপ্তা চেদ্বধোঽধিকোঽথাহাস্য বেদমুপশৃণ্বতস্ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্রপ্রতিপূরণমুদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদো ধারণে শরীরভেদ আসন-শয়নবাক্‌পথিষু সমপ্রেপ্সুর্দণ্ড্যঃ শতম্।

"শূদ্র যদি কোন দ্বিজাতির প্রতি তিরস্কারসূচক বাক্য প্রয়োগ

করিয়া তাহাকে কঠোরভাবে আঘাত করে, তাহা হইলে যে অঙ্গ দ্বারা আঘাত করিবে রাজা তাহার সেই অঙ্গচ্ছেদ করিবেন। * * * * শূদ্র যদি দ্বিজাতির ধন হরণ করিয়া গোপন করে, তাহা হইলে তাহার জীবন অবধি দণ্ড হইতে পারে। শূদ্র যদি বেদ শ্রবণ করা রূপ "মহাপাপ কার্য্য" করে তাহা হইলে রাজা সীসা এবং জৌ গলাইয়া তাহার কর্ণরন্ধ্রে ঢালিয়া উহা বুজাইয়া দিবেন। বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলে তাহার জিহ্বা ছেদন করিবেন এবং বেদমন্ত্র ধারণ করিলে, যে অঙ্গে ধারণ করিবে, সেই অঙ্গ ভেদ করিবেন। আসন শয়ন বাক্য এবং পথে যদি কোন দ্বিজাতির সহিত সমান ব্যবহার (বরাবরি) করিতে ইচ্ছা করে—তাহা হইলে তাহার শতপণ দণ্ডবিধান করিবে। * * * * কিন্তু ব্রাহ্মণ শূদ্রের উপর কোনরূপ দুর্ব্যবহার করিলে একেবারে দণ্ডনীয় হইবে না।" চমৎকার ব্যবস্থা এরূপ না হইলে কি ধর্ম্মশাস্ত্র নাম দেওয়া যায়? ধর্ম্মরাজ যেন ব্রাহ্মণের দোস্থ, তাঁহাদের বেলায় কোনই দণ্ড বা প্রায়শ্চিত্ত নাই, যত দোষ যত অপরাধ যত দণ্ড যত বিধি নিষেধ আইন কানুন সব হতভাগ্য শূদ্রদের জন্য। শূদ্রদিগকে পিসিয়া মারিবার জন্যই যেন সমুদয় সংহিতাকার একযোগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কলম ধরিয়াছিলেন।

শূদ্রেরা নামমাত্র অপরাধ করিলেও যে নিস্তার পাইবে না তাহা ত দেখাইলাম, এখন স্পর্শ করিলে কি দণ্ড হয় শুনুন :—

কামকারেণাস্পৃশ্যস্ত্রৈবর্ণিকংশন্ স্পৃবধ্যঃ ॥ ১০২

পঞ্চম অধ্যায়; বিষ্ণুসংহিতা।

"অস্পৃশ্য জাতি জ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে স্পর্শ করিলে বধ্য হইবে।"

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন :—

* * * * চণ্ডালশ্চেত্তমান্ স্পৃশন্ ॥ ২৩৭ ইত্যাদি।

অর্থাৎ "* * * যে চণ্ডাল হইয়া উত্তমবর্ণকে স্পর্শ করে; যে, শূদ্র প্রব্রজিত যতিদিগকে দৈব পিত্র্য-কার্য্যে ভোজন করায় * * * * যে অযোগ্য হইয়া যোগ্যোপযুক্ত কর্ম্ম করে (শূদ্রের পক্ষে বেদাধ্যয়নাদি) * * * তাহার শতপণ দণ্ড হইবে। ২৩৭—২৪০।"

শুধু কি চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতিগণের স্পর্শেই ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মহানী? না তাহা নহে। তাহাদের অবলোকনেও অমঙ্গলের সম্ভাবনা।

কাত্যায়ন ঋষি বলিতেছেন :—

পাপিষ্ঠং দুর্ভগামন্ত্যং নগ্নমুৎকৃত্তনাসিকম্।
প্রাতরুত্থায় যঃ পশ্যেৎ স কলেরুপযুজ্যতে ॥ ১০

কাত্যায়ন-সংহিতা।

"যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়া, পাপিষ্ঠ ব্যক্তি, * * * * অন্ত্যজ, উলঙ্গ এবং ছিন্ননাসিকা ব্যক্তিকে অবলোকন করে সে কলিযুক্ত হয়।"

ইহা হইতেই বোধ হয় আমাদের দেশে প্রাতঃকালে, যাত্রাকালে, কোনও মাঙ্গলিক কার্য্যে নরসুন্দর, তৈল-বিক্রেতা কলু প্রভৃতির মুখ দর্শন করা অত্যন্ত অমঙ্গলজনক বলিয়া মনে করিবার কুসংস্কার জন্মিয়া থাকিবে। ক্রমে এইভাবে বদ্ধমূল হইয়া সমাজের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে।

মান্দ্রাজের পারিয়াজাতির প্রতি তথাকার অভিজাত সম্প্রদায় যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন; এদেশে নিষাদ, মেদ, চুঞ্চু, অন্ধ্র, মদগ, ক্ষত্র, উগ্র, পুক্কস, ধিগ্বণ এবং বেণজাতির প্রতিও মনু সংহিতা ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুধিগণের ধৈর্য্যচ্যুতি আশঙ্কায় আমরা উহার মূল উদ্ধৃত না করিয়া কেবলমাত্র বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলাম—

মনু দশম অধ্যায়ে লিখিতেছেন :— * * * * * * "পূর্ব্বোক্ত

ঐ সকল জাতি স্ব স্ব বৃত্তি অবলম্বনে জীবন ধারণ করতঃ চৈত্যবৃক্ষমূলে, পর্ব্বত সমীপে, শ্মশানে বা উপবনে বাস করিয়া থাকে। ৫০। চণ্ডাল এবং শ্বপচ জাতির বাসস্থান গ্রাম বহির্ভাগে দেয়, এবং ইহাদিগকে পাত্র-রহিত করা কর্ত্তব্য * * * * * * * * * * একস্থানে অবস্থিত না থাকিয়া সর্ব্বদা পরিভ্রমণ ইহাদের নিত্যকর্ম্ম। ০২। সাধুরা যখন বৈধ-কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিবেন, তখন ইহাদিগের দর্শনাদি ব্যবহার নিষেধ। * * * * * ইহাদিগকে অন্নপ্রদান করিতে হইলে, ভদ্রলোকেরা (?) ভৃত্যদ্বারা ভগ্নপাত্রে অন্ন প্রেরণ করিবেন এবং গ্রামে বা নগরে রাত্রি-কালে ইহাদের যাতায়াত একবারে নিষেধ। * * * * রাজনির্দ্দিষ্ট চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া উহারা দিবাভাগে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিবে।”

শূদ্রদের প্রতি তৎকালিক ব্রাহ্মণগণের অপার স্নেহ প্রীতির এই ত প্রমাণ প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে শূদ্রদের জীবন ব্রাহ্মণগণের নিকট কিরূপ মূল্যবান্ ছিল, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। মনু একাদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন ঃ—

মার্জ্জারনকুলৌ হত্বা চাষং মণ্ডূকমেবচ।
স্ব গোধোলূককাকাংশ্চ শূদ্রহত্যাব্রতং চরেৎ।১৩২

“জ্ঞানতঃ বিড়াল, নকুল, চাষপক্ষী, ভেক, কুক্কুর, গোধা, পেচক ইহাদের একটিকে হত্যা করিলে, শূদ্রহত্যার সমান প্রায়শ্চিত্ত করিবে।” ১৩২

তৎপরে পুনরায় শ্লোক বলিতেছেন ঃ—

অস্থিমতাস্তু সত্ত্বানাং সহস্রস্য প্রমাপণে।
পূর্ণে চানস্থনস্থ্নাস্তু শূদ্রহত্যাব্রতং চরেৎ॥ ১৪১

একাদশ অধ্যায়।

কৃকলাশ প্রভৃতি (কুল্লুকভট্ট) অস্থিবিশিষ্ট সহস্র প্রাণিবধে এবং অস্থিহীন একশকট পরিমিত মৎকুণ প্রভৃতি প্রাণীবধে শূদ্রহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ১৪২। মহর্ষি অত্রি তদীয় সংহিতায় মনুর কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া শূদ্রহত্যার প্রায়শ্চিত্ত বিধান এইরূপে করিতেছেন ঃ—

শরভোষ্ট্রহয়ান্নাগান্ সিংহশার্দ্দূলগর্দ্দভান্।
হত্বা চ শূদ্রহত্যায়াঃ প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে। ২২২

অত্রি সংহিতা।

"শরভ (অষ্টচরণ মৃগ বিশেষ) উষ্ট্র, অশ্ব, হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র বা গর্দ্দভ হত্যা করিলে শূদ্রবধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।"

শূদ্রহত্যার প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে পরাশর ঋষি কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন—

চৌরঃ শ্বপাকচাণ্ডালা বিপ্রেণাপি হতা যদি।
অহোরাত্রোপবাসেন প্রাণায়ামেন শুধ্যতি॥ ১৯

পরাশর সংহিতা।

"ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক চোর শ্বপাক বা চণ্ডাল বিনষ্ট হইলে, সেই ব্রাহ্মণ এক দিবারাত্র উপবাস পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন।" ইহাদ্বারা স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে—'শূদ্রের জীবন,' সংহিতাকারগণের নিকট কতদূর হেয় ও তুচ্ছ ছিল! ফল কথা শূদ্রকে সর্ব্বপ্রকার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে সংহিতাদি যুগের ব্রাহ্মণগণ বিন্দুমাত্র চেষ্টার ক্রটী করেন নাই। জপ তপ সাধন ভজন ধন উপার্জ্জন, ধন সম্পদ ভোগ, উৎকৃষ্টতর বৃত্তি অবলম্বন প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার শারীরিক মানসিক সুখ সুবিধা ও উন্নতি হইতে হতভাগ্য শূদ্রগণকে তাঁহারা বঞ্চিত করিয়াছেন। স্থূলতঃ ইহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া আমরা এ প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিব। শূদ্রদিগকে ধনাদি হইতে বঞ্চিত করিয়া মনু বলিতেছেন ঃ—

সর্ব্বং স্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যৎ কিঞ্চিজ্জগতীগতং।
শ্রৈষ্ঠ্যেনাভিজনেনেদং সর্ব্বং বৈ ব্রাহ্মণোঽর্হতি॥ ১০০
স্বমেব ব্রাহ্মণোভুঙ্‌ক্তে স্বং বস্তে স্বং দদাতি চ।
আনৃশংস্যাদ্‌ব্রাহ্মণস্য ভুঞ্জতে হীতরে জনাঃ। ১০১

মনু, প্রথম অধ্যায়।

"ত্রৈলোক্যান্তর্ব্বর্ত্তী সমুদয় ধনই ব্রাহ্মণের নিজস্ব। সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্টস্থানজাত বলিয়া ব্রাহ্মণই সমুদয় সম্পত্তি প্রতিগ্রহের যোগ্য পাত্র। ১০০। ব্রাহ্মণ যাহা ভোজন করেন, যাহা পরিধান করেন, যাহা দান করেন, তাহা পরকীয় হইলেও নিজস্ব; যে হেতু ব্রাহ্মণেরই অনুগ্রহ বলে অপরাপর লোকে ভোজন পানাদি দ্বারা জীবিত রহিয়াছে।" ১০১।

এইত গেল শূদ্রাদিগণের ধনের উপর আপনাদের অধিকারের কথা— ধনোপার্জ্জনের অধিকারের কথা শ্রবণ করুন। দশম অধ্যায়ে মনু বলিতেছেন :—

শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্য্যো ধনসঞ্চয়ঃ।
শূদ্রো হি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে॥ ১২৯

"অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম হইলেও শূদ্রের তৎসঞ্চয়ার্থ যত্নবান্ হওয়া উচিত নহে; কারণ শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন শূদ্র ধনমদে মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণের অবমাননা করিতে পারে।" ১২৯।

শূদ্রাদি তথাকথিত অধম জাতিগণের পক্ষে উৎকৃষ্ট জাতির বৃত্তি অবলম্বন করা মহা অপরাধের কার্য্য। দাসত্ব করা ব্যতীত শূদ্রের আর অন্য উৎকৃষ্ট বৃত্তি নাই।

ঐ দশম অধ্যায়েই মনু বলিতেছেন :—

যো লোভাদধমো জাত্যা জীবেদুৎকৃষ্টকর্ম্মভিঃ।
তং রাজা নির্দ্ধনং কৃত্বা ক্ষিপ্রমেব প্রবাসয়েৎ॥ ৯৬

"যদি কোন অধম জাতীয় ব্যক্তি, উৎকৃষ্ট জাতির বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ পূর্ব্বক শীঘ্র তাহাকে স্বদেশ হইতে নিষ্কাশিত করা রাজার কর্ত্তব্য" ।৯৬। এইরূপ বিধি যদি বর্ত্তমান কালে রাজাজ্ঞায় প্রচলিত থাকিত তবে যাঁহাদের উৎপত্তিতে ভারতবর্ষ ও এমন কি পৃথিবী পর্য্যন্ত ধন্য হইয়াছে,—যাঁহাদের উৎপত্তিতে সমাজ দেশ জাতি উন্নত হইয়াছে—তাঁহাদিগের অস্তিত্ব কেহ আশা এবং অনুমান পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন কি ? খৃষ্ট, পার্কার, নানক, মহম্মদ প্রভৃতি যুগাচার্য্য-গণ এবং কেশবচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, কৃষ্ণলাল, লুথার, মহেন্দ্রলাল সরকার, মনোমোহন, লালমোহন, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, পরাঞ্জপে, আনন্দমোহন প্রভৃতি ভারত বিখ্যাত এক একটী উজ্জ্বল মণিকে পৃথিবী কখনও অঙ্কে ধারণ করিতে সমর্থা হইত না। কারণ ইহারা সকলেই মনুর মতে ব্রাহ্মণেতর জাতীয়। ব্রাহ্মণেতর শূদ্রজাতির পক্ষে দ্বিজাতিগণের দাসত্ব করা ভিন্ন আর কোনও বৃত্তি ছিল না—আর কোনও গতি ছিল না। অতঃপর শূদ্রগণের ধর্ম্মজীবনের প্রসঙ্গে অত্রি বলিতেছেন :—

জপস্তপস্তীর্থযাত্রা প্রব্রজ্যা মন্ত্রসাধনম্।
দেবতারাধনঞ্চৈব স্ত্রীশূদ্রপতনানি ষট্॥ ১৩৫

অত্রি সংহিতা।

"জপ, তপস্যা, তীর্থযাত্রা, সন্ন্যাস, মন্ত্রসাধন, দেবতা আরাধন, এই ছয়টী কার্য্য স্ত্রী শূদ্রের পাতিত্যজনক"। মানব জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ভগবান্‌কে লাভ করা। কিন্তু ভগবল্লাভের যে ছয়টী উপায়কে পূর্ব্বাচার্য্যগণ পরমোপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যাহার একটি মাত্র অবলম্বনে ও সাধনায় মানুষ ভীষণ সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারে, যাহার একটি মাত্রকে আশ্রয় করিয়া মানুষ কঠিনতর দুচ্ছেদ্য মায়াপাশ অনায়াসে ছিন্ন করিয়া পরম ধামে উপনীত হইতে পারে, পরম প্রেমময় মঙ্গলাস্পদের অভয় দরবারে কটিকল্পান্ত

পর্য্যন্ত আশ্রয় পাইতে পারে, নিষ্ঠুর শাস্ত্রকারগণ ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভৃতি কতগুলি শব্দ সৃষ্টি করিয়া কোটী কোটী নরনারীকে তাহা হইতে এমন করিয়া বঞ্চনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। নারায়ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ স্বরূপ যে সর্ব্ব-বিদ্যা সর্ব্ব জ্ঞানাশ্রয় সর্ব্ব শক্ত্যাধার প্রণব ওঁঙ্কার ধ্বনিতে পাপাশূর দল ও কামক্রোধাদি প্রবল প্রতাপান্বিত দৈত্যদানব ত্রাসিত ও কম্পিত হইয়া উঠে, যে মধুর শব্দ উচ্চারণে হৃদয় মধ্যস্থ সচ্চিদানন্দময় প্রভু আনন্দে তরঙ্গ ভঙ্গে নাচিয়া উঠেন—সেই বেদবেদান্তের সারভূত প্রণব উচ্চারণে—কোটী কোটী নর নারায়ণকে শূদ্ররূপ কল্পিত নামে অভিহিত করিয়া বঞ্চিত করা হইয়াছে ও হইতেছে। অত্রি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে শূদ্রগণকে জপ, তপস্যা মন্ত্রসাধন ঈশ্বরাধনা হইতে শুধু নিবৃত্ত করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই—তাহাদিগকে রীতিমত প্রাণ দণ্ড দিবার ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

অত্রি তদীয় সংহিতার উনবিংশশ্লোকে শূদ্রের ঈশ্বরারাধনা জপ তপ প্রভৃতি গুরুতর অপরাধে নিম্নলিখিত দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন ঃ—

"বধ্যো রাজ্ঞা স বৈ শূদ্রো জপহোমপরশ্চ যঃ।
ততো রাষ্ট্রস্য হন্তাসৌ যথা বহ্নেশ্চ বৈ জলম্॥ ১৯

"জপ হোম প্রভৃতি দ্বিজোচিত কর্ম্ম-নিরত শূদ্রকে রাজা বধ করিবেন; কারণ, জলধারা যেমন অনলকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ ঐ জপহোমতৎপর শূদ্র সমস্ত রাজ্যকে বিনষ্ট করে।" সম্ভবতঃ এইরূপ মত প্রদর্শনের নিমিত্তই রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক শূদ্রক তপস্বীর শিরচ্ছেদের উপাখ্যান রচিত হইয়া থাকিবে ও পরবর্ত্তী কালে রামায়ণে উহা প্রক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে। এইত গেল শূদ্রনামধারী হতভাগ্য জীবগণের প্রতি তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতৃগণের অপার ভালবাসা ও দয়ার নিদর্শন। তার পর খুঁটা নাটী করিয়া যে কত প্রীতি-ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কোন

স্থানে শূদ্রের ঘৃণিত ও নিন্দিত নাম রাখিবার কথা বলিয়াছেন। কোনও স্থানে "ধোপাকে একের বস্ত্রের সহিত অন্যের বস্ত্র মিশাইতে নিষেধ করিয়া বিধি করিয়াছেন।" (মনু অষ্টম অধ্যায় ৩৯৬)। শূদ্রকে আশীর্ব্বাদ করার প্রসঙ্গে অঙ্গিরঃ সংহিতা বলিতেছেন :—

অপ্রণামে তু শূদ্রেঽপি স্বস্তি যো বদতি দ্বিজঃ
শূদ্রোঽপি নরকং যাতি ব্রাহ্মণোঽপি তথৈব চ॥ ৫০

"শূদ্র প্রণাম না করিলেও যে ব্রাহ্মণ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করে, সেই ব্রাহ্মণ ও শূদ্র উভয়েই নরকে গমন করে।" ৫০। শূদ্রের কি ভাগ্য! ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ টুকরা পাইতেও শূদ্রের গলদ্ঘর্ম্ম! প্রণাম দিলে তবে আশীর্ব্বাদ! আশীর্ব্বাদটুকু দিয়া শূদ্রকে কৃতার্থ করিতেও ব্রাহ্মণ মহাশয়গণ কুণ্ঠিত! হা শূদ্রজন্ম!!

ব্রাহ্মণ শূদ্রের পার্থক্যকে আকাশ পাতালের সহিত তুলনা করিলেও বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। কেন না ব্রাহ্মণের যাহাতে পুণ্য, শূদ্রের তাহাতেই পাপ। ধর্ম্মশাস্ত্রের এ অদ্ভুত কারণ নির্দেশ করিতে, একমাত্র ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণই সমর্থ। প্রমাণ স্বরূপ একটী মাত্র দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে, ইহা দ্বারাই সুধীবৃন্দ অনায়াসে ব্রাহ্মণ শূদ্রের বৈষম্যের পরিমাণ করিতে সমর্থ হইবেন।

অত্রি সংহিতা বলিতেছেন :—

পঞ্চগব্যং পিবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণস্তু সুরাং পিবেৎ।
উভৌ তৌ তুল্যদোষৌ চ বসতো নরকে চিরম্॥ ২৯৪

"পঞ্চগব্যপায়ী শূদ্র এবং সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ উভয়েই তুল্যপাপী; এই দুই ব্যক্তি চিরদিন নরকে বাস করে।" অর্থাৎ যে পঞ্চগব্য পান করিলে ব্রাহ্মণ মহা পাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়, সেই পঞ্চগব্য পান করিলে শূদ্র চিরকালের জন্য নরকে নিমগ্ন হয়। একজনের যাহাতে পুণ্য অন্যের

তাহাতেই পাপ ও নরক। এ সম্বন্ধে অধিক টীকা টীপ্পনীর প্রয়োজন নাই। শূদ্রের প্রতি অত্যাচারের কথা লিখিতে গেলে বৃহৎ একখানা পুস্তক হইয়া পড়ে। মনু, যম প্রভৃতি সংহিতাকারগণ শূদ্রের প্রতি গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই, শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণগণের পৃষ্ঠে পর্য্যন্ত তীব্রভাবে কশাঘাত করিয়াছেন—তাঁহাদিগকেও শূদ্রের স্থায় ঘৃণিত চিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন।

এ অধ্যায়ে এ পর্য্যন্ত ত আমরা শূদ্রদের প্রতি ঘোর অত্যাচারের প্রমাণই প্রদর্শন করিলাম। তাহাদের কি করা কর্ত্তব্য, সে কথা একটি-বারও উল্লেখ করি নাই, বিধি নিষেধের কথা অনেক বলিয়াছি। এক্ষণে তাহাদের ধর্ম্ম কি, কর্ত্তব্য কি, কোন্ পথ অবলম্বনীয় ও শ্রেষ্ঠ, কোন্ পথে যাত্রা করিলে তাহারা স্বর্গরাজ্যে উপনীত হইতে পারিবে তাহাই সরল সহজ কথায় উল্লেখ করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি মনু শূদ্রদের প্রতি বড়ই দয়ালু। সুতরাং তিনি তাহাদের জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া বহু চিন্তার পর একটী উত্তম ধর্ম্ম বাছিয়া বাহির করিয়াছিলেন। তাহাই শূদ্রদের একমাত্র শ্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ ধর্ম্ম। এমন সোজা সরল ধর্ম্মের কথা পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ অবগত ছিলেন না। মহর্ষি মনু বহু শত বৎসর তপস্যার পর তাহা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার এ অদ্ভুত অচিন্তিত অলৌকিক আবিষ্কারে পৃথিবী ধন্যা হইয়াছে—শূদ্র জাতি ধন্য হইয়াছে। সে আবিষ্কৃত ধর্ম্ম হইতেছে—দ্বিজ সেবা—অনন্যমনে নিষ্কাম প্রাণে—দ্বিজ সেবা। তাহাদের আর ধর্ম্ম নাই কর্ম্ম নাই যাগ নাই যজ্ঞ নাই পূজা নাই অর্চ্চনা নাই—আছে কেবল দ্বিজ সেবা। ঐ শুনুন—মনু পবিত্রকণ্ঠে বলিতেছেন :—

"স্বর্গার্থমুভয়ার্থং বা বিপ্রানারাধয়েত্তু সঃ
জাতব্রাহ্মণশব্দস্য সা হ্যস্য কৃতকৃত্যতা। ১২২

বিপ্রসেবৈব শূদ্রস্য বিশিষ্টং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে।
যদতোহন্যদ্ধি কুরুতে তদ্ভবত্যস্য নিষ্ফলম্॥ ১২৩। ১০ ম, অঃ

অর্থাৎ "স্বর্গলাভার্থ, অথবা স্বর্গ ও নিজজীবিকা—এতদুভয়ের লাভার্থ ব্রাহ্মণ, শূদ্রের আরাধ্য। "ব্রাহ্মণ সেবক"—এই শব্দবিশেষণ মাত্রই শূদ্র কৃতার্থতা লাভ করে। ১২২। বিপ্রসেবাই শূদ্রের পক্ষেই বিশিষ্ট কার্য্য বলিয়া কীর্ত্তিত হয় এবং এতদ্ভিন্ন যে যাহা কিছু করে তৎসমস্তই তাহার পক্ষে নিষ্ফল"। ১২৩

আমরা কি এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারি না, হে ভারতের 'চলমান শ্মশান,' তথা কথিত হতভাগ্য শূদ্র জাতি, তোমরাই কি মনু অত্রি কথিত সেই ঘৃণিত পদদলিত লাঞ্ছিত, বেদবেদান্ত উচ্চারণে অনধিকারী শিক্ষা দীক্ষা হইতে চিরবঞ্চিত, স্বোপার্জ্জিত ধনৈশ্বর্য্য ভোগে অসমর্থ, 'জঘন্য স্থান হইতে উদ্ভূত,' দাস সংজ্ঞায় অভিহিত শূদ্রজাতি? তোমরাই কি সেই পৌরাণিক যুগের অত্যাচার জর্জ্জরীত ব্রাহ্মণ কর-কষাঘাতে রক্তাক্ত কলেবর ভীষণ পৌরহিত্য শক্তি সংরক্ষণের সহজলব্ধ উপাদান—আশাউদ্যম বিহীন মৃত প্রায় শূদ্রজাতি? তোমরাই কি সেই পরবর্ত্তীযুগের ব্রাহ্মণ্য-শক্তি কর্ত্তৃক জিহ্বাচ্ছেদ শরীর ভেদাদি দয়াল দণ্ডে উৎপীড়িত জাতির ঘৃণিত বংশধর শূদ্রজাতি? তোমরাই কি সেই সর্ব্বশক্তির আধার ভারতের মেরুদণ্ড স্বরূপ অথচ মহামোহাচ্ছন্ন আত্মশক্তি অবিদিত নিদ্রিত সিংহতুল্য অবমানিত শূদ্রজাতি? হে বঙ্গের বৈদ্য কায়স্থ বারুজীবি সৎগোপ কর্ম্মকার কুম্ভকার স্বর্ণকার তিলি তাম্বুলি নরসুন্দর সাহা তন্তুবায় মালাকার শুঁড়ি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ কথিত হীনজাতীয় শূদ্রগণ! তোমরা কি মনু কথিত অত্যাচার নিপীড়িত হতভাগ্য শূদ্রজাতির বংশধর বলিয়া আপনাদিগকে বিশ্বাস কর? তোমরা কি বিশ্বাস কর, ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের সেবার জন্যই পরম মঙ্গলময় দয়ার জলধি পরমেশ্বর তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন?

তোমরা কি আরও বিশ্বাস কর, ভগবান্ তোমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুখ সুবিধা বিদ্যাজ্ঞান হইতে চির বঞ্চিত করিয়া জগতের চরণাবনত দাস করিয়াই তোমাদিগকে এ সংসার ক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়াছেন? শূদ্রের বেদাধিকার নাই—শূদ্রের জপ তপ সাধন ভজন ঈশ্বর আরাধনা নাই—সেবা করিবার জন্যই তাহাদের জন্ম—দাস করিয়াই প্রকৃতি শূদ্রকে প্রসব করিয়াছেন, ধনোপার্জ্জন ধন রক্ষণে তাহাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই—ব্রাহ্মণাদি অভিজাত সম্প্রদায় তাহাদের উপর যে কোন অত্যাচার করিলেও তাহাদের কথাটী বলিবার অধিকার নাই ইত্যাদি মনুর নিষ্ঠুর আদেশগুলিকে কি তোমরা প্রকৃতই হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস কর? তোমরা কি আপনাদিগকে এইরূপ শূদ্রান্তর্গত বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব অনুভব কর? তোমরা কি মনুকেই প্রকৃত কলির ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা বলিয়া বিশ্বাস কর? মনুর এই ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি ইহ পরকালের একমাত্র অবলম্বন ও গতি বলিয়া কি তোমরা বিশ্বাস কর? মনুর আদেশ পালনই ধর্ম্ম মোক্ষ স্বর্গ—আদেশ অপালনই—পাপ বন্ধন নরক বলিয়া কি তোমরা প্রকৃতঃই বিশ্বাস কর? মনুর মতই কি তোমরা বেদ বেদান্ত শাস্ত্রের সারভূত—প্রকৃত ব্রহ্মবাণী—ঋষিবাণী বলিয়া প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস কর? শুধু মুখে বিশ্বাস করি বলিলে চলিবে না—তোমরা কি কায়মনোবাক্যে উহা প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত আছ?, ধন জন তৃপ্তি শান্তি সুখ সুবিধা স্বার্থ কল্যাণ এবং এমন কি জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া তোমরা কি তোমাদের বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করিতে প্রস্তুত আছ? মোটের উপর হিন্দুর—আর্য্যজাতির বেদ বেদান্তাদি সমুদয় শাস্ত্রীয় মত পদদলিত করিয়া,—অশাস্ত্রীয় বলিয়া উড়াইয়া দিয়া—তোমরা—হে ভারতের—হে বঙ্গের হতভাগ্য শূদ্রজাতি! তোমরা কি মনুর নিষ্ঠুর হৃদয়হীন সাম্য বর্জ্জিত কতিপয় আদেশ বাণীকেই একমাত্র কলির ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস কর? যদি বিশ্বাস কর, তবে এইস্থানেই লেখনীর চির

বিশ্রাম হউক, এইখানেই কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া যাউক, এইটুকু আসিয়াই অন্ন বিদায় গ্রহণ করুক। যদি বিশ্বাস কর, তবে আর কিছু বলিবার নাই— আর কিছু লিখিবার নাই। বুঝিলাম তোমরা মৃত—চির নিদ্রিত। চির নিদ্রিত ব্যক্তিকে কে জাগাইতে পারে? কে উঠাইতে পারে? বুঝিলাম অজ্ঞানতার ঘন ঘোর ঘটাচ্ছন্ন নিবিড় তমসায় তোমরা নিমজ্জিত, বুঝিলাম তোমাদের কর্ম্মবন্ধন এখনও ছিন্ন হয় নাই। সুতরাং আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। শেষ একটী কথা বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি শুধু বিশ্বাস করি বলিলে চলিবে না, কায়মনোবাক্যে তাহার পরিচয় দাও। যদি বিশ্বাস কর, তবে এই মুহূর্ত্তে—এই দণ্ডে, যাহাদের জ্ঞান বিদ্যা তাহাদিগকে প্রদান করিয়া, যাহাদের ধন ঐশ্বর্য্য তাহাদিগকে প্রদান করিয়া,—(কেন না শূদ্রের ধনাদিতে তাহার নিজের কোনই অধিকার নাই, ব্রাহ্মণাদিরই সম্পূর্ণ অধিকার) যাহাদিগের আধিপত্য তাহাদিগের হস্তে ন্যস্ত করিয়া, যাহাদিগের প্রাধান্য গৌরব তাহাদিগকে পুনঃ প্রদান করিয়া, জীর্ণ বস্ত্র ছিন্ন বসন পরিধানপূর্ব্বক গললগ্নি কৃতবাসে করজোড়ে দীনের দীন, দাসের দাস সাজিয়া ব্রাহ্মণের চির আশ্রয় অভয় চরণ তলে পড়িয়া যাও,—"না জানিয়া মহা অপরাধ করিয়াছি—আপনাদের ন্যায্য অধিকার দানে প্রতারণা করিয়াছি" বলিয়া—চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর। "প্রভু কৃপা কর, এ দীনহীন মূর্খ শূদ্রগণের অপরাধ মার্জ্জনা কর" বলিয়া, ব্রাহ্মণগণের (তা তিনি যেমনই হউন না কেন—শূদ্রগণের ব্রাহ্মণের বিচারের অধিকার নাই) চরণ তলে পড়িয়া যাও, শূদ্রের সাধন ভজন তপ জপ সার সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণ-চরণে নিশ্চিত ক্ষমা পাইবে। হে ধর্ম্ম বিশ্বাসী শূদ্রগণ, যাও—এই মুহূর্ত্তে গিয়া ব্রাহ্মণগণের চরণে শরণাগত হও গে,—আর বিলম্ব করিও না। বিলম্বে ধর্ম্মভ্রষ্ট—ইহকাল নষ্ট, স্বর্গ দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাইবে। যাও—যে যাহার পূর্ব্ব কার্য্য ত্যাগ করিয়া,

এই মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণগণের দাসত্বে ব্রতী হও গে। উকীল ওকালতি—মোক্তার মোক্তারী—ডাক্তার ডাক্তারী—জমিদার জমিদারী—রাজা রাজত্ব—মন্ত্রী মন্ত্রণা—বণিক বাণিজ্য—বিচারক বিচারাসন—জোতদার জোত জমি এবং সর্ব্বশেষে শিক্ষক ছাত্র স্কুল কলেজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক—হে বিশ্বাসী শূদ্রগণ! যে যাহার দাসত্ব কার্য্যে ব্রতী হও গে। শূদ্রের কর্ত্তব্য দাসত্ব করা,—উপরি লিখিত কার্য্য করা শূদ্রের শাস্ত্রসম্মত নহে। তোমরা যদি দ্বিতীয় ভাগের সুশীল সুবোধ বালকের মত নিজ নিজ দাসত্বে ব্রতী হও—তাহা হইলে আর কাহারও কিছু বলিবার থাকিবে না—সংস্কারক আপনা হইতেই নীরব হইয়া যাইবে। একদিক্ হও,—যদি শূদ্র বলিয়া আপনাদিগকে প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস কর,—মনুসংহিতাকেই কলির একমাত্র পালনীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া—কাণ্ডারী বলিয়া মনে কর, তবে—বিশ্বাসীর মত শূদ্র কর্ম্ম ব্রাহ্মণাদির পদ সেবায় ব্রতী হও। অন্য কাজ কর্ম্ম ব্যবসা বাণিজ্য ধনোপার্জ্জন ধন সঞ্চয়াদি কর্ম্ম পরিত্যাগ কর। নতুবা কাজ করিবে, ব্যবসা করিবে—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের, আর পরিচয় দিবে শূদ্র বলিয়া! ইহলৌকিক কার্য্য কর ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিগণের, আর পারলৌকিক কার্য্য করিতে বসিলেই নিজকে শূদ্র করিয়া বস, প্রণব উচ্চারণে নিজ হইতেই বঞ্চিত হও, ঈশ্বরের পূজায় পুরোহিতের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হও। মন মুখ এক করাই ধর্ম্ম। কিন্তু তোমরা এ কি করিতেছ? মুখে পরিচয় দাও শূদ্র বলিয়া—কাজ কর ব্রাহ্মণাদির। এই কি তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—ধর্ম্ম জ্ঞান! এই না তোমরা শাস্ত্রের দোহাই দিতেছ—মনুর প্রতি অচলা শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিতেছ? এই কি সেই বিশ্বাসের কার্য্য? এই কি শূদ্রের কর্ম্ম? হা ধিক! তোমাদিগের বিশ্বাসকে? ধিক তোমাদিগের কপটতাকে—কাপুরুষতাকে!!

আর যদি বিশ্বাস না কর, তবে কোটী দ্বিযুক্ত মন্ত্রে অজ্ঞাধারী

হিন্দুসমাজ শরীর কম্পান্বিত করিয়া মহাবেগে উত্থিত হও। "নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদেব কেশরী" ভীম বলশালী কেশরীর ন্যায়, হে সর্ব্ব শক্ত্যাধার শূদ্রজাতি! তোমরা শূদ্রত্বের পিঞ্জর চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া—পদতলে দলিত করিয়া বাহিরে আসিয়া দণ্ডায়মান হও। বঙ্গের বা ভারতবর্ষের এমন কোনও সামাজিক শক্তি নাই যে উহার প্রতিরোধ করিতে সমর্থ? এ বিরাট শক্তির নিকট কোন শক্তিই তিষ্ঠিতে পারিবে না। এই দণ্ডে শূদ্রের কলঙ্ক অঙ্কিত চিহ্ন সকল মুছিয়া ফেলিয়া,—সংস্কারের জলে বিধৌত করিয়া, তোমাদের ন্যায্য প্রাপ্য অধিকার লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হও। এই দণ্ডে শূদ্রত্বের ক্ষুদ্র কূপ মণ্ডূকের ক্ষুদ্রতম গর্ত্ত হইতে বহির্গত হইয়া বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্বের অনন্ত প্রবাহ নদ নদী ও সুবিশাল সাগরাম্বুরাশিতে মিশিয়া পড়, এবং ক্রমে সুকঠোর সাধনা ও তপস্যাবলে চরম আদর্শ ব্রাহ্মণত্বের মহা সিন্ধুতে ভাসিয়া গিয়া জন্ম জীবন সার্থক কর। স্বপ্নেও ভাবিও না, ব্রাহ্মণাদি অভিজাত সম্প্রদায় তোমাদিগকে দয়া ও স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া কখনও সামাজিক মুক্তি প্রদান করিবে, স্বপ্নেও ভাবিও না—তোমরা হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে প্রকৃতির নিয়মে আপনা আপনিই সামাজিক স্বাধীনতা আসিয়া উপস্থিত হইবে। সুতরাং আর বিলম্ব করিও না—যত শীঘ্র পার স্বাধিকার লাভের জন্য সকলে দলবদ্ধ হও। শূদ্রত্বের সর্ব্ব প্রকার বন্ধন সবলে ছিন্ন করিয়া ফেল। আচার ব্যবহারে কাজ কর্ম্মে মনঃ প্রাণে শূদ্রত্বের ক্ষুদ্র ভাব পরিত্যাগ কর। শূদ্রত্ব—পশুত্ব ও ক্লীবত্ব ভিন্ন কিছুই নহে। যত সত্বর পার এই শূদ্রত্ব রূপ পশুত্ব ও ক্লীবত্ব হইতে মুক্ত হও। তোমরা ভীত হইও না, কায়মনোবাক্যে ভয়শূন্য হও। অভিজাত সম্প্রদায়ের নিকট মুখভঙ্গী তোমরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিও না; উঁহাদের স্বভাব চিরকালই এইরূপ। উঁহারা কোন প্রকার সংস্কারের পক্ষপাতী নহে, পরন্তু সর্ব্ব প্রকার সংস্কার ও উন্নতির বিরোধী এবং শত্রু।

উহারা চিরকালই সংস্কারক দল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং উঁহাদের হাম্বি তাম্বিতে ভীত ও বিচলিত হইবার কোনই কারণ নাই। এ জীবন যুদ্ধে ঐ দেখ পার্থ সারথি তোমাদের সারথি হইতে প্রস্তুত হইয়া তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। আর কাল বিলম্ব করিও না—আর হীনের মত, অধমের মত সকলের পদতলে পড়িয়া থাকিও না। তোমাদের ঘৃণা লজ্জা মান অপমান বোধ কি অন্তঃকরণ হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে! যাহারা শৃগাল কুকুরের ন্যায়,—ঘৃণায়—অবমাননায় দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়, যাহাদের ঘর দুয়ার ত দূরের কথা—দেবমন্দিরেও তোমাদের ছায়া স্পর্শ করিতে দেয় না, পাছে তোমাদের স্পর্শে দেবতার সহিত দেবমন্দির পর্য্যন্ত অপবিত্র হইয়া যায় এই অশঙ্কায় সর্ব্বদা সর্ সর্—ছুবি ছুবি করে,—তাহাদের বাটীতে যাইয়া পাত্‌রা মারিতে—নিমন্ত্রণ খাইয়া কৃতার্থ হইতে তোমাদের ঘৃণা হয় না। যাহারা তোমাদের জলটুকু খাইতে নারাজ,—তোমাদের কূপের জল যাহাদের নিকট অস্পৃশ্য—সেই সব হৃদয়-হীন দাম্ভিকগণের পা চাটিয়া তাহাদেরই ভাত খাইতে তোমাদের বিবেকে একটুকুও আঘাত লাগে না? মনুষ্যত্ব কি একেবারে লোপ হইয়াছে! শাস্ত্রের নামে অত্যাচারিগণের ঘৃণা অবমাননা—অত্যাচার অবিচার—আর কত কাল নীরবে ভোগ করিবে? পিতা মাতার শ্রাদ্ধে দাসদাসী বলিয়া সেই স্বর্গগত পিতৃমাতৃগণকে আর কত কাল অপমানের বোঝা বহাইবে। বাপ মা যাহাদের—দাস দাসী—তাহারা কি কখন বৈশ্য ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবী করিতে পারে? বাবা মা যাহাদের দাস দাসী—তাহাদের সন্তান কি কখন বড় বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারে—না বড় হইতে পারে? ধিক্ ধিক্—সাম্যবাদী ইংরেজ রাজত্বেও এমন পশুর মত—দাসের মত—অত্যাচারী উচ্চ জাতিগণের পদতলে পড়িয়া আছ! ভগবানের সন্তান এমন হীনের মত পচিয়া মরিতেছ? উঠ উঠ—বক্ষ স্ফীত করিয়া জগতের সম্মুখে দাঁড়াও।

তোমরাও যে মানুষ? ভয় কি—তোমাদের পশ্চাতে ব্রিটিশ আইন সতত রক্ষার জন্য নিয়োজিত আছে। যাহারা কুকুরের ন্যায় ঘৃণা করে, গৃহ স্পর্শ করিতে দেয় না, তোমরা ছুঁইলে যাহাদের কূয়ার জল অপবিত্র অস্পৃশ্য হইয়া যায়,—তোমাদের পূজিত দেবতাকেও যাহারা তোমাদের মতই ঘৃণা করে,—তোমাদের ব্রাহ্মণগণকে পর্য্যন্ত যাহারা পশুবৎ ঘৃণা করে—সেই সব জাতির বাটীতে যাইয়া—কুকুরের ন্যায় প্রসাদ পাইতে তোমাদের বিন্দুমাত্রও ঘৃণা বোধ হয় না? ধিক্ তোমার বিদ্যা বুদ্ধিতে, ধিক্ তোমাদের ধন সম্পদে, ধিক্ তোমাদের লেখা পড়া শিক্ষায়! যাহারা বলে—তোরা হীন নীচ, অস্পৃশ্য ইতর,—যাহারা বলে তোরা ছোট লোক—পতিত, অনাচরণীয়; সয়তানের দূত তাহারাই! কে বলে তাহারা সমাজপতি। অমৃতের পুত্রকন্যাগণ, এমন মৃতের মত পড়িয়া আছ—সামাজিকগণের নির্ম্মম নিদারুণ অপমান প্রতিদিন মাথা পাতিয়া কেমন করিয়া বহন করিতেছ! হে বিরাট—হে হিরণ্যগর্ভ—হে মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্ম—একবার স্ব স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া জাগ্রত হও—জাগ্রত হও।

নবম অধ্যায়।

নিম্নশ্রেণী।

পাঠক! ঐ যে শীর্ণদেহ জীর্ণবাস, যুগযুগান্তরের নিরাশাব্যথিত বদন, ক্ষুধাতৃষ্ণায় দীপ্তিহীন চক্ষুর কাতর দৃষ্টি, আশা উদ্যমবিহীন পরিশ্রমসহিষ্ণু, স্বজনোন্নতি অসহিষ্ণু, বলবানের পদলেহক শ্রমজীবি দেখিতেছ উহারা কে বলিতে পার? উহারাই ভারতের নিম্নশ্রেণী। উদরে অন্ন নাই, পরিধানে বসন নাই, গৃহের ছাদ নাই, মুখে উৎসাহ নাই, উহারাই নিম্নশ্রেণী। ব্রাহ্মণাদি অভিজাত জাতির যুগযুগান্তরের পেষণের ফলস্বরূপ আজি ইহাদের এই দশা—এই শোচনীয় পরিণাম! প্রাণের বল নাই, মনের সাহস নাই, জীবনোন্নতির আকাঙ্ক্ষা নাই; স্বাধীনতার স্পৃহা নাই। নাই, কিছুই নাই। তবে আছে কি? আছে কতকগুলি ছাই আর ভস্ম, কতকগুলি শ্মশানক্ষেত্র। এই জন্যই বুঝিবা ভাষ্যকার ইহাদিগকে চলমান শ্মশান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঘৃণার চরম বিশেষণ—চলমান শ্মশান! ইহাদিগকে দেখিয়া মনে হয় বুঝি বা বিশেষণ প্রয়োগ স্বার্থকই হইয়াছে। চলমান শ্মশানই বটে! ইহাদের বিদ্যা নাই বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই অভিজ্ঞতা নাই, উৎসাহ নাই উদ্যম নাই, ঘৃণা নাই লজ্জা নাই, আছে কতকগুলি ছাই আর ভস্ম। শ্মশানক্ষেত্র নিশ্চল আর এগুলি চলমান এইটুকু পার্থক্য! প্রকৃত যোগী সাধক ভিন্ন যেমন অধিকাংশ লোকই শ্মশানকে অপবিত্র বলিয়া মনে করে, শ্মশান স্পর্শে স্নান করে, শ্মশানক্ষেত্রকে নিতান্ত হেয় অবজ্ঞ মনে করে—এই চলমান শ্মশানগুলিকেও সাধারণ লোকে এইরূপ দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকেন।

ভারতীয় হিন্দু সমাজের অজ্ঞাত পরন্তু অবজ্ঞাত মেরুদণ্ড, ভারতীয় জাতীয় জীবনের অজানিত শক্তি, জীবন-তরুর লুক্কায়িত মূলদেশ, হিন্দুর জাতীয় জীবন অট্টালিকার দৃঢ় নির্ম্মিত ভিত্তি—নিম্নশ্রেণীর কি দুরবস্থা, কি অধঃপতন! লক্ষ লক্ষ বৎসরের অত্যাচার অবিচার, লক্ষ লক্ষ বৎসরের পদাঘাত কষাঘাত, লক্ষ লক্ষ বৎসরের ঘৃণা অবমাননা, লক্ষ লক্ষ বৎসরের দৌরাত্ম্য উৎপীড়নে উহাদের দেহ মনঃপ্রাণ ক্ষত বিক্ষত, জর্জ্জরিত। ইহাদের প্রতি যথেচ্ছা ব্যবহার চালাইতে কোন ক্ষত্রিয় রাজা, কোন ঋষি নামধেয় ব্রাহ্মণ কবি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই। যুগ-যুগান্তরের অত্যাচারে ইহারা এক্ষণে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। ভারতে অনেক সভা সমিতি আছে কিন্তু ইহাদের প্রতি উহার কয়টীর সহানুভূতি? ঘৃণায় ঘৃণায় উহাদের মনুষ্যত্ব লোপ পাইয়াছে। আর অত্যাচার? অমন প্রজাবৎসল রামচন্দ্রকেও শূদ্র তপস্বীর শিরচ্ছেদ করিতে হইয়াছে। যেখানে যত ঘৃণা যত তাচ্ছিল্য সেখানে তত পশুত্ব তত দাসত্ব। ঘৃণায় মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের লোপ, দাসত্বের পূর্ণ বিকাশ!

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন:—"যে নিজ্‌কে অধম ও বদ্ধ বদ্ধ মনে করে সে বদ্ধই হ'য়ে যায়, আর যে মুক্ত মুক্ত করে সে মুক্তই হ'য়ে যায়।"

"He who thinks himself weak shall become weak"

'তোরা নীচ হীন, তোরা মহা অপবিত্র ঘৃণীত, তোদের ছুঁলে আমাদের স্নান করতে হয়'—হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া এই কথা শুনিতে শুনিতে তাহাদের সত্য সত্যই ঐরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে তাহারা হীন নীচ। তাহারা মানুষ—তাহারা যে ভগবানের সন্তান, জগজ্জননী ভগবতীর স্নেহের তনয়, ঋষির বংশধর—একথা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। তাহারা জানে কাঠ কাটা, জল তোলা, গরু রাখা, ক্ষেত্রে কাজ করা, গোলামী

করা, দাসত্ব করাই তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য। এ ছাড়া তাহাদের আর কিছুই করিবার নাই। তাহারা যে অতি ছোট অতি ঘৃণীত অতি হেয় অবজ্ঞাত মহাপাপী এ বিশ্বাস তাহাদের অস্থি মজ্জায়—রক্তের প্রতি কণায় মিশিয়া গিয়াছে। তাহারা জানে যে মহাপাপে তাহাদের নীচ কুলে জন্ম; উচ্চ শ্রেণীর গালিগালাজ দুর্ব্বাক্য কুকথায়, উচ্চ শ্রেণীর অনবরত পদাঘাত ও অত্যাচারে তাহাদের পাপ দুরীভূত হইয়া থাকে। একদিন একটী চর্ম্মকারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'দেখ—তোমরা কত কাজ কর্ম্ম করিতে পার, দোকানদারী মুটেগিরি মাটী তোলার কাজ, মৎস্যের ব্যবসা ইত্যাদি কিন্তু তাহা না করিয়া তোমরা বিনা আহ্বানে ব্যাপারাদির বাড়ীতে সপরিবারে কেন যাও? সারাদিন গালাগালিই বা কেন খাও; শেষে সন্ধ্যা বেলা চিড়ামুড়ি লইয়া কোথাও বা ভগ্নমনোরথে গৃহেই বা ফিরিয়া যাও কেন?" এই কথার উত্তরে সে যাহা বলিয়াছিল তাহা কি মর্ম্মস্পর্শী—কি নিদারুণ!!

সে বলিল—"ঠাকুর মশায়! আমরা কি চারটী খাইবার প্রত্যাশায় যাই? আমরা যাই আমাদের মহাপাপ ক্ষালনের জন্য—মুচি জন্ম হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য। আমরা চারিটী খাইবার আশায় যাই না। এই দেখুন, মহামহা পাপের ফলস্বরূপ আমরা অতি নীচ মুচি কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, পাপের প্রায়শ্চিত্ত দণ্ড ভোগ! আমরা উচ্চ শ্রেণীর বাটীতে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দণ্ড ভোগের জন্যই স্বেচ্ছায় আগ্রহ করিয়া যাইয়া থাকি। আমাদের উপর যতই গলাগালি, অত্যাচার, মারপিট্ হইবে, আমাদের পাপ—মহাপাপ ততই দূর হইবে। দণ্ড গ্রহণ করিয়া মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমরা উচ্চ শ্রেণীর বাটীতে খাইতে যাইয়া থাকি?" আহা কি মর্ম্মভেদী বাণী, কি ভয়ানক বিশ্বাস? এই সর্ব্বোন্নতি ধ্বংসী সংস্কারের ফলেই নিম্ন শ্রেণীর এই শোচনীয় পরিণাম! এক সমাজের বিশ্বাসের

কথা বলিলাম, এইরূপ ভাবে প্রায় সমুদয় নিম্ন শ্রেণীর নিকট হইতে ঐ একই জবাবই পাইয়াছি।

তাহারা যে মানুষ—একথা তাহারা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। কথকের মুখে, যাত্রাগানে, গুরু পুরোহিতের বাচনিক, ব্যবস্থাপক পণ্ডিতমণ্ডলীর বক্তৃতায়, তীর্থক্ষেত্রে টোলে বিবাহবাসরে শ্রাদ্ধস্থলে সর্ব্বত্র তাহারা হীন ছোট অপবিত্র এই কথা শুনিয়া শুনিয়া তাহাদের ঐ বিশ্বাসই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

শিক্ষা দীক্ষায় তাহারা চির বঞ্চিত, পিতৃপিতামহ গত বংশানুক্রমিক গুণাবলীও তাহারা কিছু পায় নাই। যাহা শোনা—অমনি শেখা, অমনি হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যাওয়া। কি ঘৃণা! নিম্ন শ্রেণীদিগকে উচ্চ শ্রেণীরা কি ভয়ানক ঘৃণা করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে পশু পক্ষী অপেক্ষাও অধিক ঘৃণা করা হইয়া থাকে। ঘরে বিড়াল গেলে, দুগ্ধ মৎস্য মাংস প্রভৃতিতে মুখ দিলে, কিয়দংশ আহার করিয়া ফেলিলেও উহা নষ্ট হয় না; আর একজন সাহা বা সুবর্ণ বণিক ঘরে গেলেই কিংবা বাহির হইতে একখানা হস্ত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দিলেই খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হইয়া যায়? শুধু কি তাই, বিড়াল হয় ত বাহিরে কোন নীচ (?) শূদ্রভৃত্যের ভুক্তাহার ও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া আসিল—পরক্ষণেই গৃহে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণের পাত চাটিতে লাগিল, অসাবধানে রক্ষিত দুগ্ধের বাটীতে চুমুক দিল বা খোকার পাত্র হইতে থাবা দিয়া মাছখানি লইয়া গেল, ইহাতে কাহারও আহার নষ্ট হইল না, খাদ্য নষ্ট হইল না।

শুধু কি বাঁচিয়া থাকিতেই অশুচি—"মরিলে কি সকল দোষ ঘুচিয়া যাইবে? নিশ্চিত নহে। গরু বাছুর মরিলে ব্রাহ্মণ কায়স্থ কাঁধে করিয়া ভাগাড়ে ফেলিয়া আসিবে, কারণ তাঁহারা জানেন, স্নান করিলেই শুচি হইবেন, কিন্তু বাগদীর মৃতদেহ কেহ স্পর্শ করিবেন না। ব্রাহ্মণ কায়স্থ

বাগ্দীর শব দেহ সৎকারার্থ বহন করিয়াছেন কেহ শ্রবণ করিয়াছেন কি ?” (১)

কুকুর বিড়াল স্পর্শ করিয়া কয়জন লোক, কয়জন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া থাকেন, কিন্তু আমি, শূদ্র, যাহা স্পর্শ করিয়া স্বচক্ষে পুরোহিত ব্রাহ্মণকে স্নান করিতে দেখিয়াছি। মানুষ কি তবে কুকুর বিড়াল অপেক্ষাও হেয় ঘৃণীত ? মানুষ কি কুকুর বিড়াল অপেক্ষাও অধম অস্পর্শীয় ? শূদ্র স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শুচি হইতে হয়, কি ভয়ানক কথা ? যাহাদিগকে শ্রীগৌরাঙ্গ আদি অবতারগণ বাহুপাশে আলিঙ্গন করিতেন, যাহাদিগকে অবতারপ্রতিম মহাপুরুষগণ বুকের ভিতরে টানিয়া লইতেন, যাহাদিগের উদ্ধারের জন্য মহাপুরুষগণ সংসার স্ত্রী পরিজন ধন-ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্যঝুলি স্কন্ধে করিয়াছেন, যাঁহাদের ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন :—

“আয়ান্তু মূর্খ-বুধ-পাতকি-পুণ্যবন্তঃ
চণ্ডাল-বিপ্র-ধনহীন-সমৃদ্ধিমন্তঃ।
নানাদরো ন চ ভয়ং নহি তত্র লজ্জা
সর্ব্বে সমাধিকৃতয়ঃ খলু মাতুরঙ্কে ॥
—“আয়রে চণ্ডাল-বিপ্র-পাপি-পুণ্যবান্ !
আয়রে-দরিদ্র-ধন জ্ঞানী-বা অজ্ঞান !
নাহি তথা লজ্জা-ভয়-মান-অপমান,
মার কোলে অধিকার সবারি সমান।” (২)

(১) কর্ণেল ইউ, এম, মুখার্জ্জি প্রণীত “ধ্বংসোন্মুখ জাতি”।
(২) পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন প্রণীত “সমাজ সংস্কার”।

যে মহাপুরুষগণ বলিয়াছেন :—

"ওহে পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত সর্ব্ব পাপিগণ।
আমার নিকটে এস পাবে পরিত্রাণ॥"

সেই মহাপুরুষগণের চির স্নেহের—চির আদরের জনগণকে আমরা কি ভীষণ ঘৃণার চক্ষেই না দেখিয়া থাকি? ইহার উত্তরে বলা হয়, "আমরা কি মহাপুরুষ যে উহাদিগকে আলিঙ্গন করিব?" চমৎকার উত্তর! এমন না হইলে কি ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, সমাজপতি হওয়া যায়? মহাপুরুষ নহেন, পুণ্যবান্ নহেন, তাই বলিয়াই ঘৃণা করিতে হইবে? মহাপুরুষ নও—পুণ্যবান্ নও, তবে কি পাপী? পাপী হইলে ত ঘৃণা করিবার কিছুই থাকে না! তাহারাও যাহা তোমরাও যদি তাহাই হও তবে আর ঘৃণা কেন? তোমরা বড়; কেন—কিসে বড়? তোমাদের যে ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চভূতে দেহ নির্ম্মিত, নিম্নশ্রেণীদের দেহও কি উহা দ্বারাই নির্ম্মিত নহে?—তোমাদের যে চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, তাহাদের তাহাই, তোমাদের যে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ এবং গন্ধ এই পঞ্চ বুদ্ধিন্দ্রীয়, তাহাদেরও তাহাই, তোমাদের যে হস্ত, পাদ, উপস্থ, জিহ্বা এবং পায়ু এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রীয় তাহাদেরও তাহাই—আর তোমাদের যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং প্রকৃতি তাহাদেরও তাহাই—তার পর সর্ব্বোপরি—তোমাদের যে আত্মা তাহাদেরও তাহাই। আত্মাতে লিঙ্গ বয়স বা জাতিভেদ নাই। আত্মারূপী শ্রীভগবান্ সর্ব্ব দেহে সর্ব্ব স্থানে বিরাজ করিতেছেন। তবে বল তোমরা বড় কিসে? শারীরিক বলে? দেহের বল ত তোমাদের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর অনেক বেশী। তবে কি মানসিক বল? তাহা তোমাদের মধ্যেও কাহারও কাহারও অধিক থাকিতে পারে এবং নিম্নশ্রেণী শূদ্রদের মধ্যেও কাহারও কাহারও অধিক আছে। বরিশালের কোন সভায় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার দত্ত

একবার নিম্ন জাতীয়গণের মধ্যে একটী জলন্ত ধর্ম্মভাবের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছিলেন। বিষয়টী এইরূপ, একটী জেলের ছেলে নরহত্যা করে, উহার মাতা তাহা জানিত, গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে জেলেনীকে (আসামীর মাকে) সাক্ষী নির্ব্বাচন করা হয়। উহার মা হলপ পড়িয়া কাটগড়ায় দাঁড়াইয়া পুত্রের অপরাধের কথা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল। মার মুখে এই কথা শুনিয়া আসামী পুত্র কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল—"মা! তুমি কি আমাকে ভালবাসিতে না? আমার জীবন কি তোমার অভিপ্রেত নহে?" মাতৃদেবী তখন উত্তর করিলেন, "বাবা—আমি তোকে ভালবাসি, কিন্তু ধর্ম্মকে যে আমি তোর অপেক্ষাও বেশী ভালবাসি; তোর জন্য কেমন করিয়া সেই ধর্ম্মকে নষ্ট করিব?" জানিনা—এরূপ ধর্ম্ম-প্রাণা মহিলা ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির গৃহে কয়টী আছেন? তারপর বিদ্যা, বিদ্যাতেই বা তাহারা কম কিসে—? শিশুকাল হইতে সুযোগ এবং অর্থ সাহায্য পাইলেই নিম্নশ্রেণীর মধ্য হইতেও রত্ন জন্মিতে পারে। যদি বল—তাহাদের বিদ্বানগণের সংখ্যা কত অল্প কত সামান্য? এটাও অতি অযৌক্তিক কথা, যে সুবিধা লাভ করিয়া ইহাদের অনেকে বিদ্বান ও উন্নত হইয়াছেন, সেই সুযোগ ও সুবিধা যদি অধিকাংশ সন্তানগণ লাভ করিতে পারিত, তবে আরও অনেকে তাঁহাদের মত উন্নত হইতে পারিত। জ্ঞানহীন মূর্খ পরন্তু ধনাঢ্য অভিভাবকগণের অজ্ঞতায় এবং দারিদ্র্যের জন্য নিম্ন শ্রেণীর বালকগণ শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হইতেছে। তাহাদিগকে শিক্ষা দিলেই তাহারা শিক্ষিত হইতে পারে। বরং অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই প্রতিযোগীতা ক্ষেত্রে নিম্ন শ্রেণীর সন্তান ব্রাহ্মণাদি উচ্চ শ্রেণীর সন্তানকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। বিগত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল আলোচনা করিলে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই, বহু নিম্ন শ্রেণী ছাত্র প্রতিযোগীতায় ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য সন্তানগণকে পরাজিত করিয়াছে ও

করিতেছে। পিতৃ পিতামহ-অর্জ্জিত বংশানুক্রমিক বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয়ের ফল কোথায় দেখিতেছি ও কোথায় পাইতেছি? সংস্কৃত ভাষা ত ব্রাহ্মণগণের তথা কথিত একচেটিয়া বিদ্যা? বহু দিন হইল দেখিয়া আসিতেছি সংস্কৃত এম, এ, পরীক্ষায় শূদ্র নন্দন প্রথম স্থান অধিকার করিতেছে। শূদ্র ত দূরের কথা মুসলমান সন্তান পর্য্যন্ত প্রতিযোগী পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেছে! কৈ তোমার বংশানুক্রমিক বিদ্যার ফল? তবে বল—তোমরা কিসে বড়? তবে কি পৈতাবলে তোমরা বড়? যদি বল হাঁ তাই বটে, তবে তদুত্তরে বলা যায়—তাহাতেও তাহারা পশ্চাৎপদ নহে। ইতিমধ্যে অনেকে পৈতা লইয়াছেন ও অনেকে লইবার জন্য যোগাড়াদি করিয়াও তুলিয়াছেন।

অত্যাচারের ফল ত হাতে হাতেই পাইতেছ। নিম্ন শ্রেণীর উপর দিয়া যে অত্যাচার গিয়াছে, ইউরোপের দাসত্ব প্রথা ভিন্ন, প্রাচীন ভারতে শূদ্র নিপীড়নের ন্যায় এরূপ অমানুষিক অত্যাচার কস্মিন্‌কালে কোনও দেশে ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ। বর্ত্তমান কালেই কি সমুদয় অত্যাচার লোপ পাইয়াছে? পতিতা বেশ্যাকে আমাদের উচ্চ শ্রেণীর নরসুন্দরগণ ক্ষৌরী করে কিন্তু মালী নমঃশূদ্র পাটনীর কন্যাকে নাপিত ক্ষৌরি করিবে না পরন্তু সে যদি ধর্ম্মভ্রষ্টা চরিত্রহীনা হইয়া বার-বিলাসিনী হয়, তখন তাহাকে ক্ষৌরী করিতে আর আপত্তি নাই? কি ভয়ানক কথা! রামচন্দ্র মালীকে ক্ষৌরী করিতে দিলাম না কিন্তু সে যদি কল্য হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ করিয়া মালা ছিঁড়িয়া কল্মা পড়িয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ এবং মহম্মদ রোমজান খাঁ নাম ধারণ করে তবে আর তাহার নরসুন্দরের অভাব থাকিবে না। উচ্চ শ্রেণীর নরসুন্দর নন্দন তখন তাহাকে সেলাম দিয়া ক্ষৌরী করিতে প্রবৃত্ত হইবে। মেয়েদের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা, আজ মুক্তা মালিনী বা সরলা নমঃশূদ্রাণী নাপিত পাইল না কিন্তু কাল যদি জনৈক মুসলমান

যুবকের সহিত নিকাহ বসে এবং বিবি খাতেমন্নিসা বা গহরজান বিবি নাম পরিগ্রহ করে, তবে আর নরসুন্দর মহাশয় ক্ষৌরী করিতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করিবে না। এই ত হিন্দু-সমাজের অবস্থা। যত দিন সে হিন্দু ছিল, হিন্দুর দেবদেবী আরাধনা করিত, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের চরণ ধূলি লইত, যথাসাধ্য হিন্দু-আচার ব্যবহার প্রতিপালন করিয়া চলিত, ভগবানের নাম কীর্ত্তন, গঙ্গা স্নান, তীর্থ দর্শনাদি করিত—তত দিন সে নাপিত পায় নাই, কিন্তু যেই সে মুসলমান হইল বা কুলে কালী দিয়া বারবনিতালয়ে ঘর তুলিল অমনি নাপিত ক্ষৌরী করিবার জন্য হাজির। এইরূপ অত্যাচারের ফলেই ভারতে ছয় কোটী মুসলমানের উদ্ভব। তোমার প্রতিবাসী মুসলমান মহম্মদালী খন্দকার ত আর আরব পারস্য বা আফগান দেশ হইতে আইসে নাই, তাহার পূর্ব্ব পুরুষ তোমারই ধর্ম্মাবলম্বী তোমারই জাতি ভাই তোমারই হিন্দু আত্মীয় ছিল, সামাজিক কঠোর অত্যাচারে ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া সে আজ তোমার পর তোমার শত্রু (?) হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাঠান মোগল প্রভৃতি বৈদেশিক আক্রমণকারিগণের সহিত কয় সহস্র স্বজাতীয় মুসলমান সৈন্য আসিয়াছিল? কয় সহস্র? আর আজ তাহাদের সংখ্যা কত? সমাজপতিগণ! একবার এদিকে একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি? অত্যাচারে জর্জ্জরীত হইয়া—অসহ্য বোধ করিয়া নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ভ্রাতৃগণ দলে দলে মুসলমান হইয়া গিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের একই পথে ব্রাহ্মণ ও পারিয়ার চলিবার উপায় নাই। ময়মনসিংহ জেলাস্থ কোন ব্রাহ্মণ জমিদারের বাটীতে একবার একজন কায়স্থ ভদ্রলোক আহার করিতে চাকরের অসাবধানতায় প্রদত্ত নিষ্ঠাবান্ উক্ত জমিদারের কাংসনির্ম্মিত গ্লাসে জল পান করেন। ব্রাহ্মণের কাঁসার গেলাসে শূদ্র এঁটো হাতে জল পান করিয়াছে, সুতরাং সে গ্লাস কি আর পুনরায় ব্যবহার চলে? তিনি বাটীর চাকর চাকরাণীদের না দিয়া

অন্য একটী লোক ডাকিয়া ঐ গ্লাস দান করিয়া দিলেন। বাটীতে থাকিলে যদি ভ্রম ক্রমে তিনি কখন উহার জল পান করিয়া ফেলেন এই আশঙ্কা। এই ঘটনায় তাঁহার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু জিজ্ঞাসা করেন—"আচ্ছা, কায়স্থ, শূদ্র উহাতে জল পান করিয়াছেন জন্য উহা দূষিত, নষ্ট ও অব্যবহার্য্য হইল। বাসনপত্র থালা ঘটি বাটী প্রভৃতি বাগ্দী চাকরাণীরা মাজিয়া যখন বাহিরে রাখিয়া দেয় এবং কুকুরাদি যখন উহা জিহ্বা দ্বারা চাটিয়া থাকে তখন তাহা জল দিয়া ধুইয়া লইয়া কিরূপে ব্যবহার চলে? কায়স্থের জলপানের পর ত উহা বালী ছাই ইত্যাদি দ্বারা মার্জ্জিত হইয়াছিল—তাহা যখন অব্যবহার্য্য হইল তখন কুকুরচাটিত হইবার পর জল দ্বারা ধুইয়া ঐ বাসনপত্র কিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে? তবে কি কায়স্থাদি শূদ্রজাতি কুকুর অপেক্ষাও হেয়, ঘৃণীত ও অস্পৃশ্য?"

এইরূপ ভাবে শূদ্র সাধারণের ঘৃণা করিয়া করিয়া হিন্দুজাতি জগতের সর্ব্বজাতির ঘৃণার্হ হইয়া পড়িয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ এক স্থানে লিখিয়াছেন "যে দিন হইতে হিন্দুজাতি ম্লেচ্ছ যবন প্রভৃতি ঘৃণাসূচক শব্দাবলী প্রয়োগ করিতে আরম্ভ ও নাসিকা কুঞ্চিত করিতে লাগিল সেই দিন হইতেই হিন্দু-জাতির মরণ-ভেরী বাজিয়া উঠিল।" পূর্ব্বেও বলিয়াছি ঘৃণায় মনুষ্যত্বের অপলাপ ধর্ম্মের অপলাপ, ঘৃণায় উন্নতির অপলাপ দেবত্বের অপলাপ। এইরূপ ভাবে নিজেদিগকে ঘৃণা করিতে করিতে হিন্দুসমাজ-পতিগণ হিন্দু-সমাজকে ধ্বংসের মুখে আনিয়া উপনীত করিয়াছেন। নিম্নশ্রেণীর কোন প্রকার বিদ্যা নাই, বোধ-শক্তি নাই, জড়পিণ্ডবৎ পড়িয়াছিল, সমাজপতিগণ যেরূপ ভাবে উঠাইয়াছে নামাইয়াছে তাহারাও সেইরূপ ভাবে উঠিয়াছে নামিয়াছে। নিজেদের স্বাতন্ত্র্য কিছুমাত্র ছিল না। যেরূপ চালাইয়াছেন সেইরূপ ভাবে চলিয়াছে। পরন্তু সংখ্যায় ইহারা কোন কালেই অল্প ছিল না—আজিও নহে।

"প্রত্যেক এক শত বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে ছয় জন ব্রাহ্মণ আছে। মোটামুটি হিসাবে ইহাদিগের সংখ্যা একাদশ লক্ষ হইবে। প্রত্যেক শতে পাঁচ জন কায়স্থ পাওয়া যায়। প্রত্যেক দুই শতে একজন ক্ষত্রিয় দেখা যায়। ইহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা বহু বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। কাজেই কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ইঁহারাও এক্ষণে বাঙ্গালী হইয়াছেন। বৈদ্যের সংখ্যা রাজপুতদিগের অপেক্ষাও অল্প। সমগ্র বঙ্গে হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ১২·৮ উচ্চ জাতি আছে।

"ইহাদিগের পর নবশাক ও অন্যান্য সৎশূদ্র আছে। ইহাদিগের জল উচ্চ শ্রেণীর আচরণীয়। ইহাদিগের মধ্যে বারুই, গন্ধবণিক, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, মালাকার, মোদক, নাপিত, সৎগোপ, তাম্বুলী, তন্তুবায়, তিলি প্রভৃতি জাতি আছে। ইহাদিগের সংখ্যা প্রায় ৩১ লক্ষ হইবে, বঙ্গের সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে ইহারা শতকরা ১৬·৪ হইবে। ইহাদিগের মধ্যে সৎগোপের সংখ্যাই অধিক এবং মালাকারের সংখ্যা কম। সৎগোপ ছয় লক্ষ হইবে, মালাকর মোটে ৩৬ হাজার। নবশাকদিগকে সৎশূদ্র বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহাদিগের পৌরহিত্য কার্য্য করিবার জন্য ব্রাহ্মণ আছেন। তবে ইহাদিগের ব্রাহ্মণ সমাজে অপদস্থ এবং ইঁহাদিগের সহিত অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ তেমন ভাবে আদান প্রদান বা আহারাদি করেন না। ইহাদের স্পৃষ্টজল অনাচরণীয় নহে।

"তাহার পরের দল সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ১৩·৪ হইবে। মাহিষ্যের সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ হইবে। ইহাদের মধ্যে কতক আচরণীয় ও কতক অনাচরণীয়। ব্রাহ্মণও পৃথক্। গোয়ালাদিগের সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ হইবে। ইহাদিগেরও ব্রাহ্মণ আছে এবং তাহাদিগকেও নিম্ন-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া গণনা করা হইয়া থাকে। গোয়ালার স্পৃষ্টজল

ব্রাহ্মণ ও উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা ব্যবহার করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর পর বৈষ্ণব, যোগী, সরাক, সুবর্ণবণিক, সাহা, সূত্রধর প্রভৃতি শ্রেণী। ইহাদের সংখ্যা প্রায় ১৭ লক্ষ হইবে এবং বঙ্গের সমগ্র অধিবাসীর সংখ্যার মধ্যে ইহারা শতকরা ৮·৮ হইবে। ইহাদিগের মধ্যে সামাজিক অবস্থার বিশেষ তারতম্য আছে। ধনবান্ সাহা বা সুবর্ণ বণিক ধনাধিক্য হেতু উচ্চশ্রেণীর ন্যায় আদর ও সম্মান পাইয়া থাকে। বৈষ্ণব ও যোগী হিন্দু সমাজের সহিত যেন দূর সম্পর্কিত। ইহাদিগের ব্রাহ্মণ নাই। অন্য জাতির ব্রাহ্মণ আছে এবং তাঁহারা বর্ণের ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। ইহাদিগের সকলেরই স্পৃষ্ট জলই কিন্তু অব্যবহার্য্য।

"ইহাদিগের পর পরবর্ত্তী শ্রেণীর হিন্দু আছে। ইহারা চাষাতী, ধোবা, কালু, কপালী, নমঃশূদ্র, রাজবংশী। তৎপর পলিয়া, পাটনী, পোদ, শুন্ড়ী, টিপ্‌রা, তেওর, বাগ্‌দী প্রভৃতি জাতি। ইহাদিগের সংখ্যা ৭৬ লক্ষ এবং বঙ্গের সমগ্র হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৩৯·৭ জন ইহারা হইবে।

"হিন্দুদিগের মধ্যে রাজবংশীর সংখ্যা খুব অধিক। ইহাদিগের সংখ্যা ২০ লক্ষের অধিক হইবে,—তাহা হইলেই শতকরা ১১ জন হিন্দু এই জাতিভুক্ত। ইহাদিগের পরই নমঃশূদ্র। ইহাদিগের সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ হইবে। বাগ্দীরও সংখ্যা নিতান্ত সামান্য নহে—১১ লক্ষ হইবে। উত্তর বঙ্গে রাজবংশী জাতি অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গে নমঃশূদ্রদিগের সংখ্যাধিক্য পরিদৃষ্ট হয়। বাগ্দীজাতি সর্ব্বত্রই সমান আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহারা সর্ব্ববাদী সম্মত নীচজাতি। ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চ জাতি, নবশাক, সূত্রধর পর্য্যন্ত ইহাদিগকে হেয় জ্ঞান করে। ইহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও ব্রাহ্মণ আছে বটে, কিন্তু এই সকল ব্রাহ্মণকে লোকে পতিত বলিয়া গণ্য করে। এই সকল জাতির জল অস্পৃশ্য।

"ইহাদিগের অপেক্ষাও নিম্নশ্রেণীর লোক আছে। বাউরি, চামার, ডোম, হাড়ি, ভুঁইমালী, কেওরা, কোরা, মুচি প্রভৃতি। ইহাদিগের সংখ্যা ১৭ লক্ষ হইবে এবং বঙ্গের সমগ্র হিন্দু অধিবাসী সংখ্যার মধ্যে ইহারা শতকরা ৮।৯ সংখ্যা হইবে। মুচির সংখ্যা ৪ লক্ষের অধিক, হাড়ির ২॥ লক্ষ, ডোম প্রায় দুই লক্ষ এবং চামার প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার হইবে। ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও ব্রাহ্মণ আছে। * * * ইহারা যে জল স্পর্শ করে, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর তাহা অব্যবহার্য্য। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা যে ঘরে বসে, ইহাদিগকে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতেও দেওয়া হয় না।

"এক্ষণে উপরোক্ত তালিকাগুলি একত্রিত করা যাউক। যুক্ত বঙ্গে ১ কোটি ৯১ লক্ষ হিন্দু আছে। প্রত্যেক শতে ১৩ জন করিয়া ব্রাহ্মণ ও উচ্চ জাতি, কিঞ্চিদধিক ১৬ জন করিয়া নবশাক ও সৎশূদ্র, ১৩ জন করিয়া তদধম জাতি, ১০ জন করিয়া এমন জাতি—যাহাদিগের জল আচরণীয় নহে—বাকী ৪৮ জন করিয়া এরূপ নীচ জাতি যে, তাহাদিগের পূজাদি করিবার জন্য ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না।" (১)

নবশাক ও মাহিষ্য জাতির ধর্ম্মাদি কার্য্য যে সকল ব্রাহ্মণ সম্পন্ন করাইয়া থাকে, তাহারা হীন ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য। এই নবশাক ও কৈবর্ত্ত জাতি বঙ্গের সমগ্র হিন্দু অধিবাসীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হইবে। বাকী হিন্দুর যজন যাজন করিতে অতি অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণই সম্মত হইয়া থাকে। যাহারা স্বীকৃত হয়, তাহারা বর্ণের ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত। শতকরা যে ১৩ জন উচ্চ জাতির কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা শতকরা ৩০টী ভিন্ন জাতির সহিত একত্রে উপবেশন অপমানজনক

(১) "ধ্বংসোন্মুখ জাতি।"

বলিয়া বিবেচনা করেন, বাকী জাতির সহিত সংস্পর্শও ইহাদিগের নিকট দোষাবহ হইয়া থাকে। শেষোক্ত জাতি যে জল স্পর্শ করে, অন্যান্য জাতি তাহা গ্রহণ করা—ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য বলিয়া মনে করে।

অনেকের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে, যে জাতিগত পার্থক্য কেন ঘটিয়া থাকে? কেন একজাতি উচ্চ এবং অন্য জাতি নীচ বলিয়া বিবেচিত হয়? অনেকের বিশ্বাস শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে ঐরূপ হয়, কিন্তু এই বিধি ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ অনেকেই অবগত নহে। শাস্ত্রবিধি কি, তাহা জানিতে পারিলে অনেকের কৌতূহল চরিতার্থ হইতে পারে। গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় পূর্ব্বাপর ইহা চলিয়া আসিতেছে, অনেকে ইহাই মাত্র জানে। সাধারণতঃ বিশ্বাস বৃত্তি অনুসারে জাতি গঠিত হইয়াছে। অধিক সংখ্যক হাড়ি ও কেওরা শূকর পালকের কার্য্য, ডোমেরা শবদেহ বহনাদি, চর্ম্মকার ও মুচি চামড়ার কাজ এবং রজকেরা বস্ত্রাদি ধৌত করে। কিন্তু নমঃশূদ্র, পোদ বা রাজবংশীরা কেন নিম্নজাতি বলিয়া পরিগণিত হইল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।”

এক্ষণে ইহাদের জীবিকা নির্ব্বাহক বৃত্তি আদির উল্লিখিত হইতেছে। “যুক্ত বঙ্গে একশত ব্রাহ্মণের মধ্যে ৪৮ জন কৃষিকার্য্য, ৩৪ জন বিদ্যাচর্চ্চা অথবা শিল্প বাণিজ্য এবং ১৮ জন অন্যান্য কার্য্য করিয়া থাকেন বর্ণিত হইয়াছে। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণেরা কখনই স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ করেন না। এ সম্বন্ধে ভারতের অন্যান্য স্থানের ব্রাহ্মণদিগের সহিত তাঁহাদের পার্থক্য আছে। তথাপি অনেকের নিকট ইহা বিশেষ অভিনব সংবাদ বলিয়া পরিগণিত হইবে যে, সমগ্র ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রায় অর্দ্ধেকাংশ কৃষিজীবী। অতি নীচ জাতি বাগদীদিগের কথাই ধরুন না কেন! পশ্চিম বঙ্গে ইহাদিগের সংখ্যাধিক্য পরিলক্ষিত হয়। ইহাদিগের মধ্যে শতকরা ৫০ জন

কৃষিকার্য্য, ২০ জন খাদ্যাদি বিক্রয়, ১৮ জন দৈনিক মজুরী এবং ১২ জন অন্যান্য রূপ কার্য্য করে।

"বাউরি আর একটী হীনজাতি। ইহাদিগের মধ্যেও শতকরা ৩৬ জন কৃষিজীবী, ৪৩ জন দৈনিক শ্রমজীবী, ৭ জন গো মেষাদি পালক এবং বাকী অন্যরূপ ব্যবসায়ী। একশত জন চামার ও মুচির মধ্যে ৩৩ জন শিল্পী প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর কার্য্য করিয়া থাকে। পূর্ব্ব বঙ্গে ১০০ জন নমঃশূদ্রের মধ্যে শতকরা ৮২ জন চাষের উপর নির্ভর করে, এবং অবশিষ্ট ১৮ জন অন্যান্য কার্য্য করে। ১০০ জন রজকের মধ্যে শতকরা ৬০ জন জাতি ব্যবসায় এবং ৩১ জন কৃষকের কাজ করে। ১০০ জন কর্ম্মকারের মধ্যে ৩০ জন চাষ, ৪৭ জন লৌহাদির কার্য্য এবং ২৩ জন অন্যান্য কার্য্য করে। ১০০ জন কায়স্থের মধ্যে ৬৬ জন চাষ, ৮ জন বিদ্বদ্‌জনোচিত বা শিল্পাদি কার্য্য করে। শতকরা ৮৫ জন পদ্মরাজ এবং ৯২ জন রাজবংশী কৃষিকার্য্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে।"

"উপরিলিখিত তালিকা অনুধাবন করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, ব্যবসা বা বৃত্তির সহিত জাতি নির্ণয় বা জাতি বিচারের বিশেষ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নাই।" (১) * * *

১০০ জন হিন্দু জাতির মধ্যে ৬ জন মাত্র ব্রাহ্মণ আছে ইহারা "দেব" উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন, বাকী ৯৪ জন "দাস" বলিয়া পরিচিত। নিম্ন জাতির লোক ব্রাহ্মণ দেখিলে দণ্ডবৎ করিয়া থাকে। এই দণ্ডবৎ অর্থে কাষ্ঠগুচ্ছের ন্যায়; জীবিত জীবের ন্যায় ত নহেই—মানুষ ত দূরের কথা;—ভূমিতে আপতিত হওয়া।

* * * * "ইতর বা অন্যান্য জাতির সংস্পর্শে থাকিতে

(১) কর্ণেল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "ধ্বংসোন্মুখ জাতি।"

হয় বলিয়া ব্রাহ্মণেরা সকল স্থানে সকলের সঙ্গে সমবেত হইতে পারে না। * * * * পূজা কথকতা প্রভৃতি জাতীয় উৎসবে সকল জাতি উপস্থিত হইলেও জাতি-বিচারের পূর্ণ পরিচয় এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন হাড়ি অথবা ডোম, ইহারাও হিন্দু—পূজার দালানে উঠিলে কুক্কুরাদির ন্যায় বিতাড়িত হইয়া থাকে। পূজাদি ব্যাপারে জাতি বিচার পূর্ণ মাত্রায় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অজ্ঞতাপ্রযুক্ত ইতর জাতির আত্মসম্মান জ্ঞান নাই বলিলেই হয়। যে সামান্য শিক্ষালোক তাহাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে উচ্চজাতির নিকট ঐরূপ দুর্ব্ব্যবহার পাইলেও তাহারা এখনও ক্ষুণ্ণ হয় না;" * * *
"সমগ্র সাঁওতাল পরগণা এবং ছোট নাগপুর বিভাগ খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের সুন্দর ক্ষেত্র বলিয়া মিশনারীদিগের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এবং ঐ সকল লোককে যে ভাবে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইতেছে তাহাতে অতি সত্বরই সমগ্র সাঁওতাল পরগণা ও ছোট নাগপুর বিভাগ—যাহা আয়তনে আসামের অপেক্ষা বৃহত্তর এবং যুক্ত বঙ্গের প্রায় তুল্য হইবে—খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত জাতির দ্বারা অধ্যুষিত হইবে। পূর্ব্ববঙ্গে গাড়ো ও নাগারাও খ্রীষ্টধর্ম্মাক্রান্ত হইতেছে।"

"ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগের প্রতি কিরূপ ভাবাবলম্বন করেন? কেহ ইহাদিগকে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আহ্বানও করেন না, কেহ প্রতিবন্ধকতাও প্রদান করেন না। উহারা হিন্দু বলুক আর নাই বলুক, তাহাতে ব্রাহ্মণদিগের কোনরূপ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। এই অসভ্য জাতিরা হিন্দু হউক আর নাই হউক, ব্রাহ্মণদিগের নিকট সমভাবে অস্পৃশ্য। ইহাদিগের পৌরহিত্য কার্য্য করিতে ব্রাহ্মণেরা সম্মত হইবে না। যদি কোন ব্রাহ্মণ উহাদিগের পুরোহিত হয়, তাহা হইলে সে অমনি "পতিত" বলিয়া গণ্য হইবে এবং এমন কি উহাদিগের অপেক্ষাও তাহাকে অধিকতর

ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচনা করা হইবে। সেই ব্রাহ্মণের ছোঁয়া জল কেহ গ্রহণ করিবে না।” * * * *।

“শুদ্ধ যে ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগের সংস্পর্শে আইসে না তাহা নহে, কায়স্থ বৈদ্য এমন কি নবশাক পর্য্যন্ত ইহাদিগকে (হাড়ি ডোমকে) স্পর্শ করে না; ইহাদিগের সহবাসেও দোষ ঘটিয়া থাকে। ইহা হইতে বুঝা যায়, ব্রাহ্মণেরা যে পথ প্রদর্শন করেন, অন্যান্য জাতি তাহা অবলম্বন করিয়া থাকে।”

* * * “ব্রাহ্মণদিগের সহিত ইতর জাতির যেরূপ সম্বন্ধ সাহেবদিগের সহিত দেশীয়দিগের তদ্রূপ সম্বন্ধ! তুলনাটা সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ না হইতে পারে। ব্রাহ্মণ ও ইতর জাতি এদেশে যতকাল আছে, সাহেব ও দেশীয় ততকাল নাই, কাজেই কতক বিষয়ে তুলনা না হইতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা ইতর জাতিকে যেরূপ অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, যেরূপ অবমাননাকর ব্যবহার, সহবাস পরিহার প্রভৃতি করিয়া থাকে, সাহেবেরাও তদ্রূপ করে। মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোক অগণিত লোকের সহিত যুগযুগান্তর একদেশে বাস করিয়া কিরূপে স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছে, তাহা ভাবিয়া স্থির করা সুকঠিন।”

“উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ স্বধর্ম্মীর সহিত একত্র যোগদানে একান্ত অনিচ্ছুক। সহস্র বৎসর ধরিয়া আমরা এই সমস্ত সমধর্ম্মীর সহিত সম্মিলিত না হইবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছি এবং ইহাতে প্রায় কৃতকার্য্য হইয়াছি। যতক্ষণ না উচ্চনীচ ভাব পরিস্ফুট হয়, যতক্ষণ না আমরা অন্য বর্ণের সহিত স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণে সমর্থ হই, ততক্ষণ আমাদের মনে আনন্দ হয় না। আমরা এক্ষণে যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, তাহাতে বার জন হিন্দু বর্ণগত পার্থক্য বিস্মৃত হইয়া সমভাবে সমক্ষেত্রে একযোগে সমবেত হইয়া কার্য্য করিতে পারে না। অনৈক্য যেন আমাদিগের

জাতিগণ ধর্ম্ম হইয়াছে—যেন আমাদিগের সামাজিক অবয়বের অস্থি মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়াছে।”

“দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইতর জাতি বাগ্দীর কথাই ধরুন। বাগ্দীর সংখ্যা কায়স্থের অপেক্ষা কম নহে। প্রত্যেক জাতির শারীরিক ও মানসিক অভাবপূরণের প্রয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু বাগ্দীর পারত্রিক মঙ্গলের এবং মানসিক উন্নতি সাধনের প্রতি কাহারও দৃষ্টি আছে কি? সে কালের কোন ব্রাহ্মণকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, নিম্নজাতি বাগ্দীর উপকারার্থ তিনি কি করিয়াছেন? তাহা হইলে ব্রাহ্মণ নিশ্চিতই বিস্ময়ান্বিত হইবেন। “বাগ্দী কি একটা মানুষ”—যে তাহাদের জন্য কিছু করিবার প্রয়োজন আছে? সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণের মনে ইহাই উদিত হইবে। বাগ্দী যে হিন্দু, ম্লেচ্ছ বা যবন নহে তাহা ব্রাহ্মণ স্বীকার করিবেন, কিন্তু তাহাতে কি হয়? সে যে বাগ্দী—হীনজাতি। বাগ্দীর কল্যাণার্থ ব্রাহ্মণের যে কিছু কর্ত্তব্য আছে, তাহা সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ ঠাকুরের মনোমধ্যে কখন উদয় হয় নাই, কেননা ব্রাহ্মণের অন্যান্য অনেক কাজ আছে ত?

“বাগ্দীর যে ধর্ম্ম বা নীতি জ্ঞান শিক্ষা দিবার গুরু নাই, আমি তাহা বলিতেছি না। বাগ্দীজাতির পারত্রিক মঙ্গল সাধনার্থ কোন না কোন ব্রাহ্মণ নিয়োজিত আছে বটে, কিন্তু এই ব্রাহ্মণকে অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা “পতিত” বলিয়া গণ্য করেন। অপরাধ তিনি বাগ্দীদের পৌরহিত্য করিয়া থাকেন। শুদ্ধ ব্রাহ্মণেরা কেন, অন্য জাতিও তাহাকে বাগ্দীর ন্যায় অস্পৃশ্য বিবেচনা করিয়া থাকে। সাধারণতঃ বাগ্দীর ব্রাহ্মণ বাগ্দীদের ন্যায় অজ্ঞ ও দরিদ্র হইয়া থাকে। তিনি যে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন তাহা উচ্চ নীতি বা ধর্ম্মমূলক নহে। বস্তুতঃ, নিজের অজ্ঞতাবশতঃ তিনি কিছুই শিক্ষা দিতে পারেন না। বাগ্দীরা কিন্তু এই ব্রাহ্মণ পাইয়া “হাতে স্বর্গ” পাইয়াছে বলিয়া মনে করে। যদি ব্রাহ্মণদিগের হস্তেই

অবিসংবাদিতরূপে ইতর জাতির শিক্ষার ভার ন্যস্ত থাকিত তাহা হইলে ইতর জাতির কোনরূপ ধর্ম্মজ্ঞানই হইত না! সুখের বিষয় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, চৈতন্যের শিক্ষা হিন্দুর নিম্ন স্তরে পর্য্যন্ত প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। ১ কোটি ৯০ লক্ষ বঙ্গবাসী হিন্দুর মধ্যে অন্ততঃ ১ কোটি ৫০ লক্ষ চৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।"

"বস্তুতঃ বাগ্দীর ধর্ম্মগুরু গোস্বামী বা ঠাকুর—মনুষ্যসমাজের হীন আদর্শ স্থল। এই বৈষ্ণব গুরু সকল জাতির লোকই হইতে পারে; কারণ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে জাতিবিচার নাই। ইহাদিগের শিক্ষা বা সঙ্গতি শিষ্যদিগের অপেক্ষা বিশেষ অধিক নাই। শিষ্যের নিকট হইতে অর্থাদি লাভের প্রত্যাশায় দরিদ্র বাগ্দীর গৃহে গুরুর পদার্পণ হইয়া থাকে। পুরুষানুক্রমে গুরুর ইহাই পেশা। এই ব্যবসা যে ভাল চলে না এবং ইহাতে অর্থলাভও যে হয় না তাহা বলাই বাহুল্য। বাগ্দীশিষ্যের বাটীতে গুরু আহার করেন না, এমন কি একত্রে উপবেশন পর্য্যন্ত করেন না। আর ধর্ম্ম বা নীতি শিক্ষাদানের কথা? গুরুর নিজেরই তাহার বিশেষ অভাব, সুতরাং শিক্ষা দান করিবেন কি? ইতর জাতিদিগের মধ্যে যে দয়া দাক্ষিণ্য সম্পন্ন ধার্ম্মিক ও নীতিবান্ লোক নাই, আমি তাহা বলিতেছি না, তবে উহা গুরুদত্ত শিক্ষার ফল নহে। নিজেদের পরিমার্জ্জিত ধর্ম্ম বুদ্ধি বা জ্ঞানের পরিণাম।"

"ইতরজাতীর আভ্যন্তরীণ জীবনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে অনেক হিন্দুই তাহা বলিতে পারিবেন না। ভদ্রলোকে এ বিষয়ে কখনই মস্তিষ্ক চালনা করেন না। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই দুলেপাড়া, হাড়িপাড়া, ডোমপাড়া আছে, সম্ভ্রান্ত লোকে এ পল্লীতে প্রায়ই গমন করেন না। কারণ বাগ্দী প্রভৃতি জাতির সমস্তই অস্পৃশ্য, তাহাদিগের দেহ, তৈজসাদি, আহার্য্যাদি, এমন কি ছায়া পর্য্যন্ত অস্পৃশ্য ও সংক্রামক। ইহাদিগের জাতিগত কার্য্য

লইয়া সম্ভ্রান্ত জাতিরা অতি সামান্যরূপ সংস্পর্শে কখন কখন আইসেন,—তদ্ব্যতীত ইতরদিগের সহিত বিশেষ সংস্রবই রাখা হয় না। উৎসবাদিতে সকলের শেষ ভাগে—যেখানে কাহারও সহিত সংস্রব নাই—ইহারা উপস্থিত হইতে পারে। বিবাহাদি ক্রিয়া কলাপে কোন নীচ কার্য্য করাইবার প্রয়োজন হইলে ইহাদিগকে দূরে কদর্য্যস্থানে অপেক্ষা করিতে বলা হয়। ইতরজাতিরাও পুরুষানুক্রমে তাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট স্থানাদি জানে—কাজেই কোনরূপ গোলযোগ ঘটে না! * * * * ইতর জাতির যদি কোন লোক পীড়িত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতিবাসী স্বজাতিই তাহার পরিচর্য্যায় রত হইয়া থাকে। কে কবে শুনিয়াছেন, ভদ্রলোকে ইতরজাতির দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া রোগীর সেবাদি করিয়া থাকেন।" * * * * * * * * * *।

বিদ্যাচর্চ্চার কথা আর কি বলিব—। "বাগদীদিগের মধ্যে হাজার করা ১৭ জন পুরুষ লেখা পড়া জানে। যাহাদিগের শিক্ষাদির পরিমাণ এরূপ, তাহারা কিরূপ লোক হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহারা যে অধঃপতিত জাতিভুক্ত অধঃপতিত লোক, তাহা সহস্র বৎসর ধরিয়া তাহারাই বুঝিয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ ইহাদিগের চিত্র গভীর—মর্ম্মস্পর্শী। ইহারা আবহমানকাল হইতে দরিদ্র—ভীষণ দরিদ্র। উদর পূর্ণ আহার কদাচ ঘটিয়া থাকে। ইহারা অলস, অমিতব্যয়ী ও অবিশ্বাসী। ইহাদিগের স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের অবস্থা আরও শোচনীয়। ইহাদিগের মস্তকাচ্ছাদনের স্থান—জীর্ণ শীর্ণ কুটীর—কখন পড়িয়া যায় স্থির নাই। এরূপ দরিদ্রতা সত্বেও ইহারা অত্যন্ত অলস। যদি ঘরে দিনান্তে আহার যুটিবার সংস্থান থাকে, তাহা হইলে ঘরের বাহির হইবে না। যদি দৈনিক-মজুরী পেশা হয় এবং কাজ করিতে যাইবার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে কেহ কাজ করাইবার জন্য ডাকিতে আসিলে গৃহাভ্যন্তরে লুকাইয়া থাকে,

পরিবারকে বলে—"সে গৃহে নাই—কর্ম্মদাতাকে যেন এই কথা বলা হয়।" "কাজে লাগিলে" যতদূর ঠকাইতে পারে, নিয়োগকারীকে ততদূর ঠকাইবার চেষ্টা করে। কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে। কেহ দেখিলে তাম্রকুট সেবন বা কথোপকথন করিতে থাকিবে। তাহার পর নিজের দুঃখের গল্প, কার্য্যের কাঠিন্যের কথা এবং নানারূপ পীড়ার কথা উত্থাপন করিয়া সময় নষ্ট করিবে।"

ইহারা যেমন অলস, তেমনি অমিতব্যয়ী। যদি দৈনিক তিন আনার পয়সা উপার্জ্জন করে, তাহা হইলে স্ত্রীকে ছয় পয়সা দিবে এবং ছয় পয়সার তাড়ি পান করিবে। মত্তাবস্থায় ঘরে আসিয়া যদি মনোমত আহার্য্য না পায়, তাহা হইলে স্ত্রীর মস্তক চূর্ণ করিতে উদ্যত হইবে। যখন অনশনে বিশেষ ক্লিষ্ট হয় এবং "হাতে কাজ কর্ম্ম" কিছুই থাকে না, তখন তস্কর বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। উচ্চ জীবনের কল্পনাও তাহার মনোমধ্যে কখন উদিত হয় না। আত্মসম্মানের কথা? সে কথার অর্থও সে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। কারণ সে যে জাতিতে বাগ্দী, ইতরজাতি ভুক্ত। যাহা কিছু পাপজনক—নীচ, তাহারই প্রতি শব্দ ইতর জাতি। তাহার স্বজাতির লোক ছাড়া সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করে। স্বজাতির মধ্যে "বেরাদারী" আছে,—অন্য জাতির সহিত বেরাদরী ভাব ও থাকিতেই পারে না। সে যখন বাগ্দী কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তখন হইতেই উচ্চাভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা, আত্মসম্মান, স্বাবলম্বন প্রভৃতির অর্থ তাহার কাছে কিছুই নাই। অদৃষ্ট পরীক্ষা করিবার জন্য সে কলিকাতায় যায় না কেন? ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। সে বলিবে কলিকাতা অনেক দূর—রেলগাড়ীর ভাড়া নাই, সেখানে থাকিবার খরচ চাই; জানা শুনা লোক কেহ নাই,—সুতরাং সেখানে গিয়ে কেমনে কাজ পাইবে? কতক পরিমাণে কথা সত্য, কোন হোটেল প্রভৃতি স্থানে গিয়া সে জাতির পরিচয় দিলে তাহাকে কেহ

খাইতে বা থাকিতে স্থান দিবে না। ভদ্রলোকের বাড়ীর চাকরেরা যদি জানিতে পারে সে বাগ্দী, তাহা হইলে তাহারা তাহার সম্পর্কে কোন কার্য্যই করিবে না। কাজেই যেখানে পূর্ব্বপুরুষ কাটাইয়া গিয়াছেন, সেইখানেই থাকাই শ্রেয়ঃ। সত্য বটে, দিন ক্রমেই অচল হইয়া আসিতেছে, কিন্তু উপায় কি ?

"গরু বাছুর মরিলে ব্রাহ্মণ কায়স্থ কাঁধে করিয়া ফেলিয়া আসিবে কিন্তু বাগ্দীর মৃত দেহ কেহ স্পর্শ করিবেন না।"

এখন দেখুন বাগ্দীর জীবন কিরূপ ? শারীরিক অবস্থায় সে রুগ্ন; অভাব, অনাহার, পান-দোষ ও অন্যান্য দুষ্কার্য্য তাহার স্বাস্থ্যকে একেবারে ভঙ্গ করিয়া ফেলে। মানসিক অবস্থায় পশ্বাদির অপেক্ষা সে শ্রেষ্ঠ কিসে ? শতকরা ৯৮ জন নিরক্ষর। নীতিজ্ঞানও তথৈবচ; ইহারা প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিষ্পেষিত—বিধ্বস্ত। বহু বৎসরের অবনত অবস্থা ইহাদিগের হৃদয় হইতে সদ্বৃত্তি সমূহকে বিনষ্ট করিয়াছে। *

---

* ২৫ বৎসর পূর্ব্বে পূজনীয় লেপ্টন্যাণ্ট কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গদেশের অবজ্ঞাত জাতিদের শোচনীয় দুর্দ্দশা দেখিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন—ভগবৎ কৃপায়, দেশে শিক্ষা বিস্তার সংবাদ পত্রাদি প্রতিষ্ঠার ফলে—তাহার অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। অবজ্ঞাত ভ্রাতাদের উচ্চ শিক্ষিত নেতৃমণ্ডলী স্ব স্ব সমাজে জাতীয় সভা সমিতি প্রতিষ্ঠা, জাতীয় গ্রন্থ প্রচার ও সংবাদপত্র, মাসিক পত্রাদি পরিচালন দ্বারা সমাজে দ্রুত পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতেছেন। হাওড়া নিবাসী, ভারতবন্ধু সপ্তাহিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মহাপ্রাণ শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় পশ্চিম বঙ্গের ২০ লক্ষ বাগ্দী বা ব্যগ্রক্ষত্রিয় ভ্রাতাদের পরিচালনা ও নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়া অল্প দিনের মধ্যে তৎসমাজে যে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তিনি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"বাগ্দী বা ব্যগ্রক্ষত্রিয় জাতি,—পশ্চিমবঙ্গে এই জাতির সংখ্যা বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়; তথায় ইহারা প্রায় বিশ লক্ষাধিক। ইহারা শক্তিমান, তেজস্বী ও সরল প্রাণ জাতি। কৃষি

যে সকল কথা বাগ্দীদিগের সম্বন্ধে প্রযোজ্য, তাহা নিম্নশ্রেণীর সকল জাতির পক্ষেই সমভাবে প্রযোজ্য। মুচি, কেওড়া, বাউড়ি, তেওর * * * * * চণ্ডাল চামার, ডোম, হাড়ি, প্রভৃতি জাতি—যাহাদিগের সংখ্যা সমগ্র হিন্দু সমাজে শতকরা ৫৮ জন হইবে—সমাবস্থাপন্ন। ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে কেবল ধর্ম্ম ব্যতীত আব কিছুরই সৌসাদৃশ্য নাই: এমন কোন উৎসব বা সামাজিক ব্যাপার নাই—যে উপলক্ষে ইহারা পরস্পরে মিলিত হইতে পারে। যদি কখন কোন ঘটনায় ইহারা সম্মিলিত হয়, তাহা হইলে এক জাতি অন্য জাতির সহিত বসে না, ভিন্ন ভিন্ন জাতি পৃথক ভাবে স্থানাধিকার করে। কখন কখন এক জাতির কোন লোকে অন্য জাতির পেশা অবলম্বন করিয়া থাকে বটে, কিন্তু উভয় জাতির মধ্যে

বৃত্তি ইহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের প্রধান উপায়। ইহাদের মধ্যে বহু ব্যক্তি অধুনা ব্যবসা এবং শিল্প কার্য্যাদির দ্বারাও জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। অনেকে এজাতিকে পশ্চিম বঙ্গের মেরুদণ্ড স্বরূপ বলিয়া থাকেন। ইহারা না থাকিলে তথায় তথাকথিত উচ্চ জাতিদিগের দিন চলা ভারস্বরূপ বোধ হইত এবং দক্ষিণ হস্তের কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত নিজেদিগকে গুরুতর শ্রমসাধ্য কর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইত। দেশীয় মল্লের আবশ্যক হইলে এখনও এই জাতির মধ্যে হইতে উহা সংগৃহীত হয়। ইহারা ক্ষত্রিয়োচিত দ্বাদশ দিবস অশৌচ পালন করে, কোন কোন স্থলে ক্ষত্রিয়ের ন্যায় উপবীত ধারণ করে ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সেনাপতি, সিংহ, দলপতি, পাত্র, মিত্র, মহাপাত্র, মালিক প্রভৃতি উপাধি ধারণ করে। এ কারণ অনেকে মনে করেন ইহারা প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতির বংশধর।

গত দুই বৎসর কাল ইহারা সমিতি আদি সংস্থাপন করিয়া পূর্ণ ঐক্য বলে দিন দিন বলীয়ান্ ও শক্তিমান হইয়া উঠিতেছে। মদ্যাদি পান হইতে একেবারে বিরত হইয়া দিন দিন আচার ও নিষ্ঠাবান্ হইয়া উঠিতেছে। ইহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার হইয়াছে এবং দ্রুত শিক্ষার প্রসার বর্দ্ধিত হইতেছে। বহুল পরিমাণ পাঠশালা, নৈশ বিদ্যালয় এবং হরিসভা আদি স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। সন্ধ্যার সময় ইহাদের পল্লীতে গমন করিলে হরিনাম শ্রবণে কর্ণযুগল পরিতৃপ্ত হয়।”

বিবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে। সামাজিক হিসাবে ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব লইয়াও ঈর্ষা দ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এবংবিধ ঈর্ষাদি প্রদর্শনের প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ অন্য কিছু নাই, এই সকল জাতির একত্রে সমাবেশ প্রায়শঃ ঘটে না। তথাপি এই ইতর জাতির মধ্যে এক জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—এই ভাব বিদ্যমান আছে—বেশ বুঝা যায়।"

"ধোপা, মাহিষ্য, (জেলে কৈবর্ত্ত) কপালী, নমঃশূদ্র, রাজবংশী প্রভৃতি শ্রেণীর আপনাদিগের মধ্যেই আবার প্রাধান্য ও হীনতা আছে। কোন কারণবশতঃ কোন লোক জাতি বিগর্হিত কোন কার্য্য করিলে—তাহার স্বজাতি তাহাকে অধঃপতিত ভাবে জাতিচ্যুত করিয়া থাকে। অপরাধের গুরুত্ব লঘুত্ব আদৌ বিচার করে না। পূর্ব্ব বঙ্গে সে দিনের হাঙ্গামায় রাজবংশীরা মুসলমানদিগের দ্বারা প্রহৃত হয়। যাহারা নিগৃহীত হইয়াছিল, তাহাদিগকে অন্য রাজবংশীরা জাতিচ্যুত করে। নীচ জাতির সহিত একঘাটে স্নান করিলে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের জাতিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে। বিগত জামালপুরের হাঙ্গামায় যে সকল হিন্দু রমণী মুসলমান কর্ত্তৃক অত্যাচারিত হইয়াছিল, তাহারা জাতিচ্যুতা হয়—পিতৃকুল ও পতিকুল হইতে পরিত্যক্তা হয়,—অবশেষে নিরাশ্রয় অবস্থায় খৃষ্টানদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। উচ্চ স্তরের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত। কর্ম্মকার, কুম্ভকার, মালাকার, মোদক, পরামাণিক, সদ্গোপ, তন্তুবায়, তিলি অথবা মাহিষ্য অস্পৃশ্য নহে। ব্রাহ্মণ সমাজে ইহাদিগের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে—কাজেই স্থানও আছে, ইহাদিগের ব্যতীত সমাজ তিষ্ঠিতে পারে না, কাজেই ইহাদিগকে পরিবর্জ্জন অসম্ভব। তথাপি ইহারা 'দাস' অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের ভৃত্য আখ্যাভুক্ত। অস্পৃশ্য জাতি অপেক্ষা ইহারা অধিকতর সুবিধা বা ক্ষমতা পাইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে বটে, কিন্তু যথাযোগ্য স্থানে থাকিতে

বাধ্য। ব্রাহ্মণদিগের সহিত একত্রে আহার বিহারের কথা ত দূরে—উপবেশন পর্য্যন্ত করিতে পারে না। ভিন্ন শ্রেণীর নবশাকেরা কদাচ একত্রিত হয়। ইহাদিগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পেশা আছে। অস্পৃশ্য জাতির প্রতি ঘৃণা ইহাদের মধ্যে সাধারণ ভাবে বিদ্যমান আছে। ইহাদিগের যজনাদি ব্রাহ্মণ করে বটে, কিন্তু ঐ সকল যাজকও অন্যান্য ব্রাহ্মণের চক্ষে হীন ও অবনত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

"ইহাদিগের প্রত্যেক শ্রেণী স্বতন্ত্র, স্বাধিকৃত। এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীর সহিত একত্রে আহারাদি অথবা কার্য্যাদি করে না। এক শ্রেণীর লোক অন্য শ্রেণীর মধ্যে কি হইতেছে না হইতেছে, তাহার সংবাদ রাখে না, পরস্পরের মধ্যে সাহায্যাদি বা সহযোগিতা তিল মাত্র নাই, প্রত্যেক শ্রেণী অন্য শ্রেণী অপেক্ষা এরূপ স্বতন্ত্র যে ভিন্ন দেশবাসী হইলেও এতদপেক্ষা অধিকতর স্বাতন্ত্র্য বা সংস্রব শূন্যতা পরিলক্ষিত হইত না। স্বজাতির মধ্যেও একতা পরিলক্ষিত হয় না। সকলেই স্ব স্ব স্বার্থ সংরক্ষণার্থ ব্যস্ত, অন্যের ইষ্টানিষ্টের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না। জাতিগত ব্যবসা অক্ষুন্ন রাখিবার নিমিত্ত ইহাদিগের আবশ্যক মত মূলধন নাই—শিক্ষাও নাই। ব্রহ্মণাদি উচ্চশ্রেণীর বিষয় এ অধ্যায়ে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, নিম্নশ্রেণীর শোচনীয়তা প্রদর্শনের নিমিত্ত তুলনা করিয়া তাঁহাদের কথাও কিঞ্চিৎ আলোচিত হইবে।

"তাহার পর ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চ জাতির কথা। ইহাদের সংখ্যা প্রায় ২৪ লক্ষ হইবে, সমগ্র বাঙ্গালী হিন্দুর প্রায় এক-অষ্টমাংশ। মনে করুন, দুইজন ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হইল। ইহাদিগের মধ্যে আবার শ্রেণী বিভাগ আছে—যথা রাঢ়ী, বৈদিক, বারেন্দ্র। উভয়েই যদি রাঢ়ী শ্রেণীর লোক হয়েন, তাহা হইলেও গোত্রের কথা উত্থাপিত হইবে। গোত্রও প্রায় ধার প্রকার আছে। তাহার পর গোত্রের মিলন হইলেও 'মেলের' বিচার

আছে। মেল প্রায় বিংশতি প্রকার আছে। 'মেল' এক হইলেও কাহার সন্তান, কি গাঁই, এ সকল প্রশ্নও উপস্থাপিত হইতে পারে। 'স্বভাব' কি 'ভঙ্গ' ইহাও জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে। ভঙ্গ হইলে পুরুষ নির্ণয় করিতে হয়।

বৈদ্য ও কায়স্থ মধ্যেও ঐরূপ বিভাগ আছে। কলিকাতার সান্নিধ্যে হাড়িদেরও তিন শ্রেণী হইয়াছে। এক শ্রেণী ধাত্রীর কার্য্য করে, এক শ্রেণী শূকর চড়ায় এবং এক শ্রেণী সাহেবদের বাবুর্চ্চির কার্য্য করে। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যেরূপ রাঢ়ী, বৈদিক ও বারেন্দ্র শ্রেণী সকলেই স্ব স্ব শ্রেণীর প্রাধান্য দিয়া থাকেন, হাড়িরাও তদ্রূপ স্ব স্ব শ্রেণীকে প্রধান বলিয়া গণ্য করে।" "আরও একটী বিশেষ বিবেচ্য বিষয় আছে। একশত জন ব্রাহ্মণের মধ্যে ৬৪ জন লিখিতে পড়িতে জানে, একশত জন বৈদ্যের মধ্যে ৬৫ জন লেখা পড়া জানে। কায়স্থদিগের মধ্যে অনেক শ্রেণী আছে বলিয়া উহার অপেক্ষা কম লোকে লিখিতে পড়িতে জানে, এরূপ অনুমান হয়। পূর্ব্বে প্রত্যেক শ্রেণীর ইষ্টানিষ্ট সেই শ্রেণীর লোকের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। এক শ্রেণীর লোক অন্য শ্রেণীর শুভাশুভ সম্বন্ধে চিন্তা করিত না। এক্ষণে আর সে ভাব নাই—উচ্চ বর্ণের মধ্যে অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।"

"পূর্ব্বে বলিয়াছি ব্রাহ্মণদিগের জাতিগত ব্যবসা যজন যাজন। শতকরা ৮০ জন আপনাদিগের জাতিগত ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছেন। বৈদ্য ও কায়স্থদিগের জাতিগত ব্যবসা কি একথা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। বর্ত্তমান সময়ে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে ২টী বিষয় সকলের মধ্যে সমভাবে প্রচলিত আছে দেখা যায়। প্রথমতঃ বিদ্বৎজনোচিত ব্যবসা ইহাদিগের এক চেষ্টা; দ্বিতীয়তঃ যে বৃত্তি অবলম্বন করিবার ইহাদিগের ইচ্ছা, সেই বৃত্তিই ইহারা গ্রহণ করিয়া থাকে—তাহা সংস্কার বা আচার অনুমোদিত হউক আর নাই হউক। কোন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বা কায়স্থ

মহিলা কোন ধাত্রী কার্য্য নিপুণা অশিক্ষিতা মালী নমঃশূদ্র বা হাড়ি জাতীয়া স্ত্রীলোকের সহিত একাসনে বসিবেন না কিন্তু তাঁহার পুত্র যদি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে ধাত্রীবিদ্যায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হয়—তবে তিনি নিজেকে ধন্যা মনে করেন এবং কতদূর সুখী হন। ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি উচ্চ বর্ণের অনেক পিতামাতা অভিভাবক নানাপ্রকার ত্যাগ স্বীকার ও প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া নিজ নিজ সন্তানকে ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি তথাকথিত ম্লেচ্ছরাজ্যে ম্লেচ্ছ (!) সংসর্গে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ইঁহারাই আবার আপনাদিগের সন্তানগণকে স্বদেশে নিজের গ্রামে নবশাকের সন্তানগণের সহিত একত্রে বসাইয়া শিল্পশিক্ষা করিতে দিতে সম্মত হন না! কিন্তু কালধর্ম্মের প্রভাবে আস্তে আস্তে এ ভাব দেশ হইতে ক্রমে তিরোহিত হইতেছে। শ্রীরামপুর উইভিং কলেজে ৪৫টী ছাত্রের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ—উচ্চজাতির বালক।

এক্ষণে শিক্ষাগত সংস্কারের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

"বঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু উপাধিধারীর সংখ্যা দশ হাজারের অধিক হইবে না। বারজন প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর মধ্যে একজন গ্রাজুয়েট হয়। এই হিসাব ধরিলে গ্রাজুয়েটের সংখ্যার দশগুণ অধিক ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, স্থির করিতে হইবে। ইহার উপর গৃহে শিক্ষাপ্রাপ্ত অথবা বাঙ্গালা শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা যদি ৪০ সহস্র যোগ করা যায়, তাহা হইলে সর্ব্বশুদ্ধ ১ লক্ষ ৫০ হাজার শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক পাওয়া যায়। হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা ১ কোটী ৯০ লক্ষ হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইবে, প্রত্যেক ১২৭ জনের মধ্যে ১ জন লেখা পড়া জানা লোক আছে। ১৮১৭ সালে বাঙ্গালীদিগের দ্বারা বঙ্গের প্রথম বিদ্যালয় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। সুতরাং এক শত বৎসরের শিক্ষাফলে যে উহা হইয়াছে তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

"একটু নিবিষ্ট চিত্তে অনুধাবন করিলে হিন্দুর শিক্ষা সম্বন্ধে গূঢ়তত্ত্ব আরও আবিষ্কৃত হইতে পারে। এক সহস্র বৈদ্যজাতীয় পুরুষের মধ্যে ৬৪৮ জন লেখা পড়া জানে, এক সহস্র ব্রাহ্মণের মধ্যে ৬৩৯ জন, এক সহস্র প্রকৃত কায়স্থের মধ্যেও ঐরূপ সংখ্যক লোক লিখিতে পড়িতে পারে। ইহারা উচ্চ জাতি। গন্ধবণিক জাতীয় নরনারীর মধ্যে হাজার করা ৩১৮ জন, কাঁসারীর মধ্যে ২১৮ জন, ময়রার মধ্যে ২৪৮ জন, সুবর্ণ বণিকের মধ্যে ৩২৩ জন লেখা পড়া জানে। ইহারা প্রধানতঃ নবশাক। নবশাকের মধ্যে সকল জাতি ঐরূপ উন্নত নহে, কুমারদিগের মধ্যে হাজার করা ৩৪ জন মাত্র লিখিতে পড়িতে জানে।

"তার পর অধম জাতির কথা ধরুন। জেলিয়াদিগের মধ্যে হাজার করা ৪৩ জন, ধোপাদিগের মধ্যে ২৬ জন, তেওরদিগের মধ্যে ২৮ জন, নমঃশূদ্রের মধ্যে ৩৩ জন, কাওরাদিগের মধ্যে ৩১ জন, বাগ্দীদিগের মধ্যে ১৬ জন, ডোমদিগের মধ্যে ১২ জন, হাড়িদিগের মধ্যে ১০ জন, চামারদিগের মধ্যে ৬ জন এবং বাউরিদিগের মধ্যে ৪ জন লিখিতে পড়িতে পারে। হিন্দু মুচিদিগের মধ্যে হাজার করা ৮ জন।"

"এখন মোট হিসাব দেখা যাউক। বাঙ্গালী হিন্দু ৫০টি জাতিতে বিভক্ত। ইহাদিগের মধ্যে শতকরা ১৩ জন ব্রাহ্মণ ও উচ্চ বর্ণ * * * * ইহারা যে কেবল অবশিষ্ট শতকরা ৮৭ জন হিন্দুর অপেক্ষা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান করে, তাহা নহে, সর্ব্ববাদি সম্মতিক্রমেও ইহারা শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অন্যান্য জাতির প্রতি ইহাদিগের যে কোনরূপ কর্ত্তব্য বা দায়িত্ব আছে, তাহা ইহারা স্বীকার করে না।

"তাহার পর নবশাক বা শিল্পী জাতি বা চাষী গোয়ালা ও মাহিষ্যের কথা। প্রত্যেক জাতি সামাজিক ও ব্যবসায় হিসাবে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানাধিকার করে। তাহারা যে ব্রাহ্মণেতর জাতি, তাহা স্বীকার করে এবং উচ্চবর্ণের

ন্যায় ইতর জাতিদিগকে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করে। দেশের শিল্পাদি কার্য্য এক সময়ে ইহাদিগের হস্তেই ছিল। এখন ইহাদিগের অতি অল্প সংখ্যক লোকেই আপনাদিগের বৃত্তি পালন করিয়া থাকে। ইহারা উচ্চ জাতির সহিত মিশিতে পারে না। আপনাদিগের মধ্যে কদাচ মিলিত হয়; নিম্নজাতির সহিত ত একেবারেই মিলিত হয় না।

"তৎপরে নিম্নশ্রেণীর কথা—ইহার মধ্যে অস্পৃশ্য জাতি আছে। হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৫৮·জন এই জাতির অন্তর্গত। ইহারা আবার ৩০টী পর্য্যায় ভুক্ত—প্রত্যেকে স্বতন্ত্র এবং প্রধান। ইহাদিগের মধ্যে দুইটী জাতি (সুবর্ণ বণিক ও সাহা) অর্থশালী ও ক্ষমতাবান, এমন কি উচ্চবর্ণ অপেক্ষা এই দুই জাতি কোন অংশে হীন বলিয়া প্রতীয়মান হয় না; অবশিষ্ট ২৮টী জাতির সংখ্যা ১ কোটী ২০ লক্ষ হইবে। বাকী ৪২টী জাতি সহায়সম্পত্তিহীন, ঘৃণিত, পরিত্যক্ত, অস্পৃশ্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

তবে কি কোন বিষয়েই এই জাতিসমূহের মধ্যে সমতা নাই? হাঁ আছে বই কি? "প্রত্যেক জাতির মধ্যে প্রত্যেক লোকই স্বার্থ সাধনে ব্যস্ত। অজ্ঞতা, অসূয়া ও অবিশ্বাস-পরবশ হইয়া সকলেই আপনাকে অন্যের সহিত সংস্রবশূন্য বিবেচনা করে, প্রতিবেশীর প্রতি ঈর্ষাহেতু একজন অন্যের সহিত সম্মিলিত হয় না। (১)

দারিদ্র্যই নিম্নশ্রেণীর সর্ব্বপ্রকার অবনতির মূলীভূত কারণ। এই দরিদ্রতার জন্যই তাহারা সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে পারে না। "সমুদয় অনর্থের মূল এই দারিদ্র্য। নির্ধন অবস্থায় মনুষ্যের চিত্তবৃত্তি নিচয়ের অবনতি ঘটে, সমাজের সঙ্ঘশক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়, বাহু বলের

(১) ধ্বংসোন্মুখ জাতি।

হ্রাসের সহিত পরশ্রীকাতরতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জীবন সংগ্রাম তীব্রতর হইলে নীচতা, মিথ্যাচরণ, অসাধুতা প্রভৃতি দোষের প্রাবল্য ঘটে, বুদ্ধি বৃত্তির বিশিষ্টরূপ বিকাশ বা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়া হয় না, অধ্যাপক হক্স্‌লি, কিড্‌ ও রোমানিস্‌ প্রভৃতি পাশ্চাত্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।"

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার ধন ঐশ্বর্য্যের সহিত ভারতবর্ষের দারিদ্র্য তুলনা করিয়া বেদনাবিদ্ধপ্রাণে কোন শিষ্যকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন। * * * * * "দ্বিতীয় দরিদ্র লোক। যদি কারুর আমাদের দেশে নীচকুলে জন্ম হয়, তার আর আশা ভরসা নাই, সে গেল। কেন হে বাপু? কি অত্যাচার! এদেশের সকলের আশা আছে, ভরসা আছে, Opportunities আছে। আজ গরীব, কাল সে ধনী হবে, বিদ্বান হবে, জগৎ মান্য হবে। আর সকলে দরিদ্রের সহায়তা করিতে ব্যস্ত। গড় ভারতবাসীর মাসিক আয় ২৲ টাকা। সকলে চেঁচাচ্ছেন, আমরা বড় গরীব, কিন্তু ভারতে দরিদ্রের সহায়তা করিবার কয়টা সভা আছে? ক'জন লোকের লক্ষ লক্ষ অনাথের জন্য প্রাণ কাঁদে? হে ভগবান্‌ আমরা কি মানুষ! ঐ যে পশুবৎ হাড়ি ডোম তোমার বাড়ীর চারিদিকে, তাদের উন্নতির জন্য তোমরা কি করেছ, তাদের মুখে এক গ্রাস অন্ন দেবার জন্য কি করেছ, বল্‌তে পার? তোমরা তাদের ছোঁওনা, দূর দূর কর; আমরা কি মানুষ? ঐ যে তোমাদের হাজার হাজার সাধু ব্রাহ্মণ ফির্‌ছেন, তাঁরা এই অধঃপতিত দরিদ্র পদদলিত গরীবদের জন্য কি কর্‌ছেন? খালি বল্‌ছেন, ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা। এমন সনাতন ধর্ম্মকে কি ক'রে ফেলেছে! এখন ধর্ম্ম কোথায়? খালি ছুৎমার্গ—আমায় ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা।" (১)

(১) পত্রাবলী—১ম ভাগ।

স্বামীজি বলিতেন, আয়র্লণ্ডের ক্ষুধাতুর কৃষক যখন আমেরিকার স্বাধীন মাটীতে পদার্পণ করে, তখন তাহার কেমন ভয় ভয় চাহনি, বাধ বাধ কথা, যেন চলিতে বলিতে তাহার কেমন একটা আড়ষ্টভাব। কেন এমন হয়; তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া তিনি লিখিয়াছেন যে, আইরিশ কৃষক দেশে থাকিতে উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের নিকট শুনিয়াছে যে, সে গরীব নীচ আইরিশ কৃষক; তাহার জীবনের কোন উচ্চ লক্ষ্য নাই; শুধু দুর্ভিক্ষ এবং দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া উচ্চশ্রেণীর সেবা করাই তাহার ধর্ম্ম। জীবনের প্রথম হইতেই এই সকল উৎসাহহীন কথা শুনিয়া শুনিয়া আইরিশ কৃষকের জীবন শুকাইয়া গেল; সে আর মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিল না, স্বদেশে বসিয়া সে শুধু এই লাভ করিল যে, তাহার জীবনের কোনও উচ্চ আদর্শ থাকিতে পারে না।

তাই সে যখন আমেরিকায় উপস্থিত হইল, তখন সে ভয়ে ভয়ে চলিতে লাগিল। কিন্তু সেই স্বাধীনতার লীলাভূমিতে কে তাহার নিকট হইতে মুক্তির বারতা গোপন করিয়া রাখিবে? আমেরিকার মাটিতে পা দিয়াই সে শুনিল—জগদীশ্বর মানবের পিতা এবং পৃথিবীর নরনারী সকলেই তাঁহার সন্তান! কেন তবে আইরিশ কৃষক তুমি ভয়ে ভয়ে চল? তুমিও মানুষ, আমিও মানুষ; আমার ন্যায় তুমিও শিক্ষালাভ কর এবং পরিশ্রমী হও, তাহা হইলে তোমার দুঃখের নিশ্চয় অবসান হইবে। যেই সে এই সহানুভূতির বাক্য শুনিল, সেই তাহার চেহারা ফিরিয়া গেল; তাহার আড়ষ্ট ভাব দূরে চলিয়া গেল এবং দেখিতে দেখিতে সে একজন সাহসী কর্ত্তব্যপরায়ণ পরিশ্রমশীল অমেরিকান হইয়া গেল;—দেশের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য সেও জীবন দিতে শিক্ষালাভ করিল। সহানুভূতি এবং প্রেম এমনি করিয়াই মানুষকে বড় করিয়া তুলে।

"এই আইরিশ কৃষককে যেমন এতদিন আয়র্লণ্ডের উচ্চশ্রেণী মাথা

তুলিতে দেয় নাই, আমরাও তেমনি আমাদিগের দেশের অগণ্য লোক-দিগকে আজ বহু শতাব্দীর মধ্যে মানুষ হইতে দিই নাই। নিরক্ষর শ্রম-জীবী যদি তাহার প্রদত্ত টাকার রসীদ অথবা দাখিলাখানি পড়িবার চেষ্টা করিয়াছে, অমনি আমরা—ভদ্রলোকেরা রুক্ষস্বরে তাহাকে বলিয়াছি—"এ্যাঃ—কৈবর্ত্তের পো আবার লেখা পড়া শিখেছে।" মুচি যদি ভুলক্রমে আমার ছায়া স্পর্শ করিয়াছে, অমনি আমার ব্রাহ্মণ্য গর্ব্বে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে এবং সেই হতভাগ্য মুচিকে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দারুণ নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে।

"চামার যদি পেটের জ্বালায় বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ক্ষুধাতুর কণ্ঠে বলিয়াছে—'মা! আমি অভুক্ত, উপবাসী, আমাকে দু'মুঠা খাইতে দাও'—অমনি আমরা আমাদের উচ্ছিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন তাহাকে দিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তাহাকে হাজার বার সম্ঝাইয়া দিয়াছি যে, তুই মুচি, এখান হইতে দূর হইয়া গিয়া ঐ দূরে বাগানের কাছে গাছ তলায় যাইয়া অপেক্ষা কর। ঐখানে এঁটো কাঁটা যাহা কিছু দিবার দেওয়া যাইবে"। (১)

বিগত ১৩২৪ সনের ৩২তম জাতীয় মহাসমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা য়্যানি বেসান্তও তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"* * * উপেক্ষিত জাতি-গণকে অবহেলা করা হইয়াছিল। তাহারা দেখিতেছে যে খ্রীষ্টান অথবা মুসলমান হওয়া তাহাদের পক্ষে লাভজনক। তাহাতে তাহাদের সামাজিক মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়। এই যে ব্যাপার, ইহার ভিতর বিপদ প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে। * * * মাতৃভূমির প্রত্যেক ভক্ত সন্তানের এখন এই সমুদয় উপেক্ষিত সন্তানগণকে জননীর সাধারণ গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আসা একান্ত কর্ত্তব্য।"

(১) "নিগৃহীতের অভ্যুত্থান," সঞ্জীবনী, ১০ই চৈত্র ১৩১৪।

"আর এক ঋণ দেশের অনুন্নত শ্রেণীগুলি সম্বন্ধে। এই Depressed class এর কথা যখন ভাবি, তখন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি। মানুষের বিধি ব্যবস্থা মানুষকে কত হীন করিয়া ফেলিতে পারে। ইহারা সভ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও সকল সুফল হইতে বঞ্চিত। ইহাদের সেবা ছাড়া সমাজ চলিবে না,—অথচ পদাঘাত ব্যতীত ইহাদের অন্য কোনও প্রাপ্তি নাই। মানুষের ঘৃণিত স্বার্থপরতা ইহা অপেক্ষা আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে না। ইহাদিগের শিক্ষা দানের বিরুদ্ধে যখন যুক্তি শুনি—'তাহা হইলে আমাদিগের চাকর মিলিবে না'—তখন দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত বলিতে হয়—'ছোট' নাগপুর অপেক্ষা 'বড়' নাগপুরেই—এই সব হামবড়াদের মধ্যেই—ধর্ম্ম প্রচারের কত বড় ক্ষেত্র রহিয়াছে। শিক্ষা ও সভ্যতার আবরণের নীচে একি অমানুষিক হীনতা!

* * * প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পরম পুরুষ আপনাকে প্রকাশ করিবার অবকাশ খুঁজিতেছেন, মানবাত্মায় যে ব্রহ্মের প্রকাশ, তাহাই শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। যে রীতি নীতি আচার পদ্ধতি সেই প্রকাশে বাধা উৎপন্ন করে তাহার বিরুদ্ধে অনন্তকালব্যাপী সমর ঘোষণা করিতে হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে,—মানুষ এমন অনেক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে, যাহার চাপে অন্তরস্থ ব্রহ্ম নিষ্পেষিত। ইহাই বাস্তবিক ব্রহ্মহত্যা। যাহা মানুষের মনুষ্যত্ব হরণ করে,—মানুষকে তাহার ব্রহ্মসন্তানত্বের দাবী হইতে বঞ্চিত করে, তাহার বিপক্ষে—'দেশভক্ত' কখনও সংগ্রাম করিতে বিরত হইতে পারে না। মানুষকে মানুষ হইতে দাও—"(১) তাহাদের হাত ধরিয়া তোল,—উঠাও। তাহাদের পদদলিত করিয়া—আত্মহত্যা ও স্বদেশহত্যা করিও না।

(১) শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, লিখিত "জাতীয় জীবনে ব্রাহ্ম সমাজের সিদ্ধি" বৈশাখ, ১৩২০ নব্যভারত।

অবজ্ঞাত শ্রেণীর প্রতি উচ্চ জাতির দারুণ অত্যাচারের শোচনীয় পরিণাম উপলব্ধি করিয়া এবং "ভারতের পুনরুদ্ধারের জন্য কি করা উচিত" এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—

"আমার মনে হয়, দেশের ইতর সাধারণ লোককে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাহাই আমাদের অবনতির একটি কারণ। যত দিন না ভারতের সর্ব্বসাধারণ উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে, উত্তমরূপে খাইতে পাইতেছে, অভিজাত ব্যক্তিরা যত দিন না তাহাদের উত্তমরূপে যত্ন লইতেছে, ততদিন যতই রাজনীতির আন্দোলন করা হউক না কেন কিছুতেই কিছু ফল হইবে না। ঐ সকল জাতিরা আমাদের শিক্ষার জন্য (রাজকর রূপে) পয়সা দিয়াছে—আমাদের ধর্ম্ম লাভের জন্য শারীরিক পরিশ্রমে বড় বড় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু ঐ সকলের বিনিময়ে তাহারা চিরকাল লাথিই খাইয়া আসিয়াছে। তাহারা প্রকৃত পক্ষে আমাদের ক্রীতদাস স্বরূপ হইয়া আছে। যদি আমরা ভারতের পুনরুদ্ধার করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমাদিগকে তাহাদের জন্য কার্য্য অবশ্য করিতে হইবে।" (১)

আমাদের দেশের তথাকথিত উচ্চ জাতিরা তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিয়া আসিতেছে। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় বলিয়াছেন,—"যাহারা বর্ত্তমান বাঙ্গালার ৪ কোটি ৬০ লক্ষের মধ্যে ৪ কোটি, যাহারা দেশের সারবস্তু; যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া মাটি কর্ষণ করিয়া আমাদের শস্য উৎপাদন করে; যাহারা ঘোর দারিদ্র্য মধ্যেও মরিতে মরিতে বাঙ্গালার নিজের সভ্যতা ও সাধনাকে সজাগ রাখিয়াছে, যাহারা সর্ব্বপ্রকার সেবায় নিরত থাকিয়া আজিও বাঙ্গালীর ধর্ম্মকে অটুট অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, যাহারা আজিও

(১) উদ্বোধন—অগ্রহায়ণ, ১৩১৮।

শুদ্ধচিত্তে সবল প্রাণে জন্মে জন্মে বাঙ্গালার মন্দিরে মন্দিরে পূজা দেয়; মস্‌জিদে মস্‌জিদে প্রার্থনা করে, যাহাদের জন্য বাঙ্গালী বাঙ্গালী, যাহারা বাঙ্গালার জলের সঙ্গে এক হইয়া, বাঙ্গালী জাতির জাতিত্বকে স্থানে কি অস্থানে সাগ্নিক অগ্নির মত জ্বালাইয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগকে আমরা বিলাতী শিক্ষার মোহে আইন আদালতের প্রভাবে, জমিদারের খাজানা ন্যায় কি অন্যায় করিয়া বাড়াইবার জন্য, শত প্রলোভন দেখাইয়া, শত অত্যাচার করিয়া একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারি নাই, যাহারা বাস্তবিক বাঙ্গালা দেশের একাধারে রক্তমাংস প্রাণ, তাহারা বড় কি আমরা বড়? কোন্ সাহসে, কিসের অহঙ্কারে তাহাদের জল স্পর্শ করি না, কাছে আসিলে ঘৃণিত কুক্কুরের মত তাড়াইয়া দিই! এত অহঙ্কার কিসের? এত দাম্ভিকতা কেন? আমরা হিন্দু হিন্দু বলিয়া চীৎকার করি, আস্ফালন করি, সেই আমরা যে দিনে দিনে হিন্দুধর্ম্মের যে মর্ম্মস্থান সেখানে ছুরিকা আঘাত করিতেছি!—বর্ণাভিমান লইয়া এমনই করিয়া মরণের পথে ভাসিয়া যাইবে! ঐ যে মা ডাকিতেছেন—সাবধান।” (১) ভরসা করি ক্ষমতালোলুপ, জাত্যভিমানী, দাম্ভিক, স্বার্থপর “উচ্চবর্ণের” কর্ণকুহরে সভাপতি মহাশয়ের বাণী প্রবেশ করিবে। আমরা যেন বুঝিতে পারি যে, যদি আমরা জগতের অগ্রগামী জাতিসমূহের সহিত একাসনে উপবেশন করিতে ইচ্ছা করি, তবে সর্ব্বাগ্রে দেশের কোটি কোটি অস্পৃশ্য নরনারীকে মনুষ্যত্বের অধিকার দিতে হইবে। কাহাকেও বঞ্চিত করিলে চলিবে না। জনসাধারণের অভ্যুদয়ই ভারতের উন্নতির একমাত্র পথ। ‘নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।”

(১) ১৩২২ সনের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ।

দশম অধ্যায়।

জাতিভেদের অনিষ্টকারিতা,—'পৃথ্বীরাজ মহাকাব্যের' জীবন্ত শিক্ষা।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী। ইন্দ্রপ্রস্থ বা দিল্লীর বৃদ্ধ অধিপতি অপুত্রক অনঙ্গপাল দৌহিত্র পৃথ্বীরাজকে রাজ্য সিংহাসন অর্পণ করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক বদরিকাশ্রমে গিয়া ইষ্টদেব আরাধনা করিতে মনস্থ করিয়াছেন। নৃপতির দুই কন্যা, জ্যেষ্ঠা কনোজ রাজমহিষী সুন্দরী, কনিষ্ঠা আজমীর রাজ্ঞী কমলা। জয়চন্দ্র সুন্দরীর ও পৃথ্বীরাজ এই কমলার পুত্র। অনঙ্গপাল প্রকাণ্ড সভা আহ্বান করিয়া পাত্র-মিত্রের সমক্ষে নিজ করে পৃথ্বীরাজকে আপনার সিংহাসনে বসাইলেন। ইহাতে অত্যন্ত কোপাবিষ্টা হইয়া জয়চন্দ্রের জননী হঠাৎ সভামধ্যে আসিয়া পৃথ্বীরাজের প্রতি পিতার এই প্রকার স্নেহাধিক্য দর্শনে অতিশয় বিচলিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

শুনিনু একি সংবাদ ? কি করিনু অপরাধ ?
না পারি বুঝিতে কোন্ দোষে ;
জ্যেষ্ঠের না রাখি মান, কনিষ্ঠেরে রাজ্যদান
করিলেন কি হেতু কি দোষে।

রাজা বলিলেন—বৎসে ! দুরন্ত তুরুকগণ আর্য্যাবর্ত্ত আক্রমণের আয়োজন করিতেছে। এই সময় রাজ্য ভাগ করিয়া দিলে অনিবার্য্য বলহানি এবং প্রজারাও অসন্তুষ্ট হইবে।

মণি, মুক্তা মোর কাছে যা'কিছু সঞ্চিত আছে
জয়চন্দ্রে করিব প্রদান ;
কুবের-সম্পদতুল্য রাজ্য হ'তে গুরুমূল্য
নিরখিলে পাইবে প্রমাণ।
এত শুনি নৃপসুতা কহিলেন রোষযুতা,
"বিস্মৃত কি হেতু নৃপবর !
ভিক্ষুক, যাচক জন রাজদ্বারে চাহে ধন,
পুত্র মম রাজরাজেশ্বর।
প্রসন্না শ্রীহরিপ্রিয়া রাজ্য যা'র বিভূষিয়া
রেখেছেন বৈকুণ্ঠ সমান,
সে আসি অর্থের তরে ভিক্ষা পাত্র ল'বে করে !
কেন তা'রে হেন অপমান ?
ক্ষত্রকুলে জন্ম তা'র, থাকে যদি তরবার,
ল'বে রাজ্য নিজ ভুজ বলে ;
সে আশা পূরিবে যবে, আবার আসিব তবে
কানোজে ফিরিয়া যাই চলে।
পৃথ্বী ! তুমি পুত্রসম, মনে রেখো কথা মম,
অধর্ম্মে অর্জ্জিত যেই ধন ;
কভু নাহি ভোগ হয়, ভোজ্য, ভোক্তা সমুদয়
ধ্বংস পায় শাস্ত্রের বচন।
এই অবিচার ফলে যা'বে দিল্লী রসাতলে,
লুপ্ত হবে, তোমর চৌহান ;
যদি আমি কায়মনে পূজে থাকি নারায়ণে
বাক্য মোর না হইবে আন।"

জয়চন্দ্রের পরবর্ত্তী দেশদ্রোহিতার বিষ-বীজ আজ এইখানে সঞ্জাত হইল। এই হিংসানলে শুধু পৃথ্বীরাজ নহে — বিরাট বিশাল হিন্দুজাতি ও হিন্দুস্থান ভারতবর্ষ যে ভবিষ্যতে দগ্ধ হইবে এই তাহার সূত্রপাত হইল।

"ওদিকে গজনী নগরীতে বীরবর মহম্মদ ঘোরী
নিজ পাত্র-মিত্র লয়ে, দক্ষিণে কুতব
নবীন যৌবন কান্তি উজলিছে তনু,
উৎসাহে প্রদীপ্ত মুখ, বীর দর্পে ভরা।
বামে বসি' হামজবী, গম্ভীর মূরতি,
ললাটে চিন্তার রেখা। মধ্যে উভয়ের
সাধু ভক্ত মৈনুদ্দীন, করে জপমালা,
বিলম্বিত শ্মশ্রুজাল স্পর্শে নাভিদেশ,
প্রশান্ত বদন কান্তি! দাঁড়ায়ে অদূরে,
সম্ভ্রমে বিনত শির, রাজদূতত্রয়।
সম্বোধিয়া দূতগণে জিজ্ঞাসিলা ঘোরী,
মধুর গম্ভীর ভাষে ;—হিন্দুস্থান মাঝে
ছিলে সবে এতদিন ; কি দেখিলে সেথা ?
কেমন সে দেশ বল ; সম্পদ, বিভব,
লোকের প্রকৃতি, ধর্ম্ম, যা' কিছু দেখেছ,
বল বিস্তারিয়া সবে, অগ্রে বল, আলি!"
সম্ভ্রমে নোয়ায়ে শির, ভূমি স্পর্শ করি',
আরম্ভিলা আলি ;—কি কহিব, "জাঁহাপনা"!
অদ্ভুত অপূর্ব্ব দেশ। বিশ্বস্রষ্টা যেন
সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে তারে নিরুপম করি,

গড়েছেন ধরাধামে। সুনীল আকাশ,
সমুজ্জল, দিবাভাগে, তপন-কিরণে;
জ্যোতির্ম্ময়, নিশাকালে, নক্ষত্রনিকরে;
দীপ্তিমান চন্দ্রালোকে। তুষার-ঝটিকা
না জানে সে দেশে কেহ। মধুর পবন
বহে সেথা সংবৎসর; স্রোতস্বতী যত
অমৃত-সলিলে পূর্ণ। তরুলতাগণ
ফলে, ফুলে শোভাময়। নাহি জানি নাম,
আস্বাদে, সৌরভে কিন্তু চিত্ত বিমোহিত।
বিশাল সে দেশ; কোথা গিরি সুমহান,
গগনে তুলিয়া শির, আছে বিরাজিত;
কোথা বনভূমি, পূর্ণ-ভীষণ শ্বাপদে;
কোথা রম্য উপবন, পুষ্পে সুশোভিত,
মুখরিত বিহগের মধুর সঙ্গীতে।
যোজন—যোজনব্যাপী ক্ষেত্র স্নিগ্ধ-শ্যাম
শোভে কোথা; কোথা নদী বহে কলকলে।
খনি-গর্ভে জন্মে মণি; সাগরে মুকুতা;
নারী সেথা অনুপমা। সমৃদ্ধা নগরী;
ফলে শস্যে পূর্ণ পল্লী। কি ক'ব অধিক,
স্বর্গ স্বর্গ বলে লোক, স্বর্গ, হিন্দুস্থান।"

কহিলেন ঘোরী;—

"কহ দূত! কহ শুনি, কোন্ কোন্ স্থান
দেখিয়া এসেছ তুমি।" নিবেদলা দূত;—
"এসেছি হেরিয়া প্রভো! যমুনার তীরে

প্রাচীন নগরী দিল্লী, পূর্ণ ধনে, জনে ;
জয়স্তম্ভে দেবালয়ে, সুরম্য প্রাসাদে
অনুপম ধরা মাঝে। দেখেছি কনোজ,
অবস্থিত গঙ্গাতটে ; নানা দেশজাত
পণ্য-দ্রব্যে পরিপূর্ণ। দেখেছি আজমীর,
মরু সিন্ধু-বক্ষে রম্য, শ্যাম দ্বীপ সম
শোভাময়। হেরিয়াছি মথুরা নগরী,
বারাণসী পুণ্যতীর্থ উভয় হিন্দুর ;
আর (ও) কত শত স্থান। হিন্দুস্থানে গিয়া
এসেছি যা' নিরখিয়া বর্ণিবার নয়।"
"কি দেখেছ, এবে, বলহ, হানিফ্!"
সম্বোধি দ্বিতীয় দূতে কহিলেন ঘোরী ;—
"কোন্ বেশে ছিলে সেথা ?" উত্তরিলা দূত ;-
"মৌনী সন্ন্যাসীর বেশে। করেছি ভ্রমণ
তীর্থে তীর্থে, গ্রামে গ্রামে, নগরে, প্রান্তরে ;
দেখিয়াছি রাজা, প্রজা, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ।
পশি' কভু যজ্ঞশালে, কভু দেবালয়ে,
হেরিয়াছি ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার হিন্দুর ;
শুনিয়াছি শাস্ত্র পাঠ। হ্রীং, ক্লীং, ওঁ।
কিন্তু জাঁহাপনা! আমি না পারি বুঝিতে
কেন বিশ্বস্রষ্টা, হেন মনোহর দেশে,
এ হেন অধম জাতি করিলা সৃজন,
ধর্ম্মহীন জ্ঞানহীন! এক, অদ্বিতীয়
ভুলি' পরমেশে আছে মূর্ত্তিপূজা লয়ে।

অদ্ভুত তাঁ'দের ধর্ম্ম ; কেহ পূজে শীলা,
কেহ নদী, কেহ তরু। কেহ আঁখি মুদি'
করে মহা শূন্য ধ্যান। বিচিত্র তাঁ'দের
মনোভাব, পূজারীতি। কহে কোন জন
'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ' ; আবার কেহ বা
নৃত্য করে নরবলি করিয়া প্রদান।
কেহ শাক্ত, কেহ শৈব, বৈষ্ণব কেহ বা ;
কেহ পূজে বুদ্ধে, কেহ পূজে জিন দেবে।
নাহি হিতাহিত জ্ঞান ; মুক্তিলাভ তরে
কেহ ডুবে নদী জলে ; গিরিশৃঙ্গ হ'তে
পড়ে কেহ লম্ফ দিয়া, রথচক্র তলে
হয় কেহ নিষ্পেষিত ; বক্ষে বিঁধে শূল ;
বিদারে রসনা বাণে। নির্ম্মম নিষ্ঠুর ;
পুত্রে দেয় ভাসাইয়া সাগরের জলে ;
দগ্ধ করে, অবিভেদে, মাতায়, সুতায়,
বাঁধি' চিতা কাষ্ঠে, তা'র মৃত পতি সনে ;
বাজায় দামামা, যদি করে আর্ত্তনাদ।
বলে সবে হিন্দু মোরা, কিন্তু পরস্পর
জাতি ধর্ম্মদ্বেষে, নিত্য, রত বিসংবাদে ;
নাহি সখ্য, নাহি প্রেম। উচ্চবর্ণ, যদি,
চামার, চণ্ডাল আদি হীন জাতি নরে
স্পর্শে কভু, স্নান করি শুচি হয় তবে।
নহে বুদ্ধিহীন তাঁ'রা ; তর্কে সুনিপুণ ;
রচিয়াছে বহু গ্রন্থ। কিন্তু নাহি জানি,

কেন হেন মতিভ্রান্ত! ব্যথিত অন্তর,
হিন্দুর দুর্ম্মতি হেরি'। * * * নীরবিলা দূত।
* * কহিলেন ঘোরী ;—
"কি তুমি দেখেছ সেথা, বল, জাঁহান্দর!"
কহিলা তৃতীয় দূত ;—"সত্য, জাঁহাপনা।
হিন্দুস্থান সমদেশ নাহি এ ধরায়।
কিন্তু যে ফণীর শিরে থাকে মহামণি,
দন্ত তা'র বিষে ভরা। নিরখি' তা'দের
বল বীর্য্য, বুঝিয়াছি বীর হিন্দুজাতি ;
দুর্দ্ধর্ষ সমরক্ষেত্রে। বুঝিয়াছি আর (ও)
ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু ; হ'ক ধর্ম্ম তাহাদের
ভ্রমাত্মক, তবু প্রাণ দিবে তা'র তরে।
প্রজা সেথা রাজভক্ত ; রাজার আদেশে
অনলে, গরলে, জলে না ডরে মরিতে
আছে জাতিভেদ সত্য, কিন্তু হিন্দু নামে
এক সূত্রে বাঁধা সবে। না বুঝি', না ভাবি'
হিন্দুস্থান আক্রমণ উপযুক্ত নয়।
দেখিয়াছি হিন্দুস্থানে আছে তরু এক,
বট নামে ; মহা বাহু করিয়া বিস্তার,
আবরিয়া রাখে গ্রাম ; শাখা হ'তে তা'র
সূক্ষ্ম সূত্র সম মূল, পরশিয়া ভূমি,
ক্রমে হয় মহাতরু ; আকর্ষিয়া রস,
রহে সঞ্জীবিত, মূল বৃক্ষ ধ্বংস হ'লে।
তেমতি এ হিন্দু জাতি ধরে, জাঁহাপনা!

অপূর্ব্ব জীবনীশক্তি ; হ'ক মূলচ্ছেদ,
উৎপাটন, শাখা তবু রহিবে বাঁচিয়া।
কি কাজ বিবাদে তবে হেন শত্রু সহ ?
কি ফল প্রতিমা ভঙ্গে, লুণ্ঠনে, পীড়নে ?"
"পার কি বলিতে তুমি সমর-কৌশল
কিরূপ হিন্দুর ? অশ্ব, গজ, পদাতিক
শিক্ষিত কেমন ? অসি, শূল, ধনুর্ব্বাণ
কোন্ অস্ত্রে পটু তা'রা ? উত্তরিলা দূত ;—
"নহি যোদ্ধা আমি প্রভো ! বর্ণিব তথাপি
দেখিয়াছি যাহা ; হিন্দু বলী গজ বলে।
সচল পর্ব্বত সম গজযুথ যবে
হয় যুদ্ধে অগ্রসর। নাহি শক্তি কা'র (ও)
রোধিতে তা'দের বেগ ; প্রতিদ্বন্দ্বি সেনা
চূর্ণ হয় দণ্ডমাত্রে। দেখিয়াছি আর (ও)
শরক্ষেপে অদ্বিতীয় হিন্দু পদাতিক,
অব্যর্থ-সন্ধানী সবে। বিশ্বাস আমার
না পারিবে মুসলমান আঁটিতে হিন্দুরে
গজে, পদাতিক সৈন্যে। দ্বিতীয় রুস্তম
জাঁহাপনা ! করুন্ তা' উচিত যা' হয়।"
ইঙ্গিতে বিদায় করি' রাজদূতগণে
কহিলেন তবে ঘোরী ;—"শুনিলে ত সবে,
যা কহিলা দূতগণ ? কিবা যুক্তি বল ?"
* কহিলা কুতব, হিন্দু নহে বীর্য্যহীন
সত্য ; কিন্তু অন্ধপ্রায় ভ্রমে, কুসংস্কারে।

কাসিম দেবলপুরী আক্রমিলা যবে,
ঘোষণা করিল হিন্দু ; মন্দির চূড়ায়
যাবৎ পতাকা এক রহিবে উড্ডীন,
না পারিবে শত্রুসৈন্য প্রবেশিতে পুরে।
কৌশলী কাসিম, শুনি', ধ্বজ লক্ষ্য করি,'
হানিলা অজস্র অস্ত্র ; ছিঁড়িল পতাকা ;
নিরাশা-পীড়িত হিন্দু হ'ল পরাজিত।
ব্যবহারে শিশু তা'রা। আলোর-ভূপতি.
দাহির দৈবজ্ঞে ডাকি' জিজ্ঞাসিলা তা'রে ;
কোথা শুক্রগ্রহ এবে করিতেছে স্থিতি ?
কি হ'বে যুদ্ধের ফল ?' দৈবজ্ঞ কহিল ;
'সম্মুখে তোমার শুক্র, পশ্চাতে তা'দের,
যুদ্ধে তা'রা হবে জয়ী। কহিলা ভূপতি ;
'কর কিছু প্রতিকার।' ডাকি স্বর্ণকারে
শুক্রের সুবর্ণ মূর্ত্তি করায়ে নির্ম্মাণ
রাজার পশ্চাতে বাঁধি' অশ্বের পর্য্যাণে,
দিল পাত্রমিত্রগণ ; কহিল বুঝায়ে ;—
'পশ্চাতে যখন শুক্র যুদ্ধে হ'বে জয়।'
নির্ব্বোধ দাহির, নাহি বুঝি' নিজ বল,
পশিল সমরে ; যুঝি সিংহের বিক্রমে
মুসলমান—অসিঘাতে প্রাণ দিল শেষে।
জানে প্রাণ দিতে হিন্দু ; কিন্তু নাহি জানে
শৃঙ্খলা, সমরনীতি ; স্বভাবে সরল ;
দেখে দিন, দেখে ক্ষণ, শুভাশুভ যোগ।

নাহি বুঝে, ব্যাধি—বহ্নি—সমর—সঙ্কটে,
ক্ষণমাত্র কালক্ষেপে ঘটে সর্ব্বনাশ।
না জানে পুরুষকার, দৈব, দৈব করি,
নয়ন থাকিতে অন্ধ ; হোঁছটে, হাঁচিতে,
কাক শৃগালের রবে গণে পরমাদ।
অল্পে হয় বিশৃঙ্খল ; নায়ক অভাবে,
ভাঙ্গি ব্যূহ, মেষ সম করে পলায়ন।
আস্থাহীন নিজ বলে ; চিনে মাত্র রাজা ;
নিরাশ নির্জ্জীব হয় রাজার পতনে।
দাহির, অনঙ্গপাল হস্তী আরোহিয়া
এসেছিল যুদ্ধে দোঁহে ; তীক্ষ্ণ শরাঘাতে,
জ্বলন্ত কন্দুকে করী গেল পলাইয়া,
বিধ্বস্ত বিপুল সেনা হইল নিমেষে।
শুনিয়াছি আছে লেখা শাস্ত্রে তাহাদের,
মুসলমান হিন্দুস্থান আক্রমিবে যবে,
হ'বে তারা পরাজিত ; সাম্রাজ্য তুর্কের
প্রতিষ্ঠিত হবে সেথা। হিন্দু, শাস্ত্রভীরু,
আছে চিন্তান্বিত হ'য়ে ; প্রবেশিলে মোরা,
হিন্দুস্থানে, নিরাশায় হ'বে পদানত।"

এইরূপ আশা উৎসাহ বাক্যে উৎসাহিত হইয়া

* * কহিলেন ঘোরী ;—

"নাহি অভিলাষ মোর মামুদের সম,
ঝটিকার বেগে পড়ি', ঝটিকার প্রায়,
হ'তে পুনঃ অন্তর্হিত। বাঞ্ছা সংস্থাপিতে

স্থায়ী রাজ্য হিন্দুস্থানে। কুতব! তোমারে
দিনু এ কার্য্যের ভার; কর আয়োজন;
দেশ দেশান্তর হ'তে আনো সেনাদল।
শুনেছ ত জাঁহান্দর যা' কহিল এবে?
গজসৈন্যে, পদাতিকে হিন্দু বলবান্;
কিন্তু নাহি চিন্তা তাহে। সুবিদিত তব,
রণক্ষেত্রে মত্ত গজ ঘটায় বিপদ,
শত্রু মিত্র উভয়ের; পায় যদি ত্রাস,
না মানে অঙ্কুশ, করে উভে বিদলিত।
পদাতিক শ্রান্ত হয়, রণক্ষেত্র যদি
হয় দীর্ঘ, সুবিস্তৃত; না পারে সহিতে
দূর পর্য্যটন-ক্লেশ, লৌহ বর্ম্মভার;
চালনায় শ্লথ গতি। অশ্ব আমাদের,
পরিশ্রমী, দৃঢ়কায়, তুষ্ট অল্পাহারে;
উল্লম্ফনে, সন্তরণে, গিরি অরোহণে
সুদক্ষ, অভ্যাস গুণে; অশ্ববলে মোরা
গজ, পদাতিক দুই করিব বিজয়।
কর আয়োজন তুমি; বুঝিলে সময়,
শ্যেন যথা পড়ে গিয়া কপোত মাঝারে,
পড়িব হিন্দুর দেশে। প্রকৃতি তা'দের
বুঝেছি উত্তম আমি। বীরত্বে, বিক্রমে
যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী তা'রা; ধরে বহু গুণ।
কিন্তু জাতি-জ্ঞাতি-বৈরে নিত্য জর্জ্জরিত,
ভ্রষ্ট সত্য ধর্ম্ম হ'তে; পতন তা'দের

অনিবার্য্য। শিলাখণ্ড বাঁধা পরস্পর,
রোধ করে স্রোতবেগ, তরঙ্গ উত্তাল;
কিন্তু অনাবদ্ধ হ'লে, উলটি' পালটি,'
হয়, ক্রমে, রেণু শেষ; হিন্দু বটে দৃঢ়,
বন্ধন না আছে কিন্তু তাহাদের মাঝে।
শত জাতি, শত ধর্ম্ম, শত রাজ্য যথা
ধ্বংসে রত পরস্পর, কেমনে তথায়
বন্ধন, মিলন হবে? কিন্তু মোরা সবে
এক জাতি, এক ধর্ম্মী, এক ভূপতির
আজ্ঞাধীন; মোরা যবে হ'ব অগ্রসর,
স্রোত-মুখে বালুসম যাবে ভাসি তা'রা।
আর (ও) শুন গূঢ় কথা; মূঢ় হিন্দু জাতি
গৃহচ্ছিদ্র প্রকাশিতে না হয় বিমুখ।
চিরদিন এই রীতি শুনিতেছি আমি;
যখন (ই) বিদেশী কেহ প্রবেশে ভারতে,
স্বদেশ—স্বধর্ম্মদ্রোহী হিন্দু কোন জন
আসি, পক্ষ লয় তার। সিকন্দর বীর
পশিলা পঞ্জাবে যবে, তক্ষশিলাপতি
অশ্ব, অর্থ, খাদ্যসনে শিবিরে তাঁহার
পাঠাইয়া দিল দূত। সুল্‌তান মামুদে,
লয়ে অশ্ব সৈন্য, দুষ্ট শিবানন্দ রায়
করিল সাহায্য দান। প্রবেশিলে মোরা
হিন্দুস্থানে, সাহায্যের না হ'বে অভাব।
জান সবে হিন্দুস্থানে ঐশ্বর্য্যে, গৌরবে

অগ্রগণ্য দিল্লী। আমি পেয়েছি সংবাদ,
বিবাদের বিষ-বীজ হয়েছে রোপিত
দিল্লীরাজ্যে। বৃদ্ধ রাজা গেলে তীর্থবাসে,
বাধিবে বিবাদ ঘোর ভ্রাতায়, ভ্রাতায়;
একে করি' হস্তগত নাশিব অপরে।
দিল্লী যদি একবার হয় অধিকৃত,
ইস্‌লাম প্রভুত্ব হ'বে স্থাপিত ভারতে॥"

এদিকে মাতামহ পৃথ্বীরাজকে দিল্লী বা হস্তিনাপুরীর সিংহাসন দান করার জন্য জয়চন্দ্র ক্ষোভে রোষে হিংসা দ্বেষে জর্জ্জরিত হইয়া কেমন করিয়া পৃথ্বীরাজকে জব্দ ও তাহার সর্ব্বনাশ করিবেন এই চিন্তা করিয়া এক রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল— এ যজ্ঞে ভারতের সমুদয় নরপতিই আগমন করিবেন, শুধু পৃথ্বীরাজ দিল্লীর প্রাধান্য রক্ষার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ স্বীকার করিবেন না। এই সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া গুরু তুঙ্গাচার্য্য জয়চন্দ্রের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—

জয়চন্দ্র! করিনু শ্রবণ
সেনাগণ ব্যস্ত তব যুদ্ধ আয়োজনে;
ছিলাম প্রবাসে, বৎস! যুদ্ধ কার সনে?
"যুদ্ধ হ'বে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ সনে,
তাই, সেনাগণ মম বড় আয়োজনে।"
কহিলেন গুরু,—"কিবা অপরাধ তা'র?
করেছে সে কোনরূপ ক্ষতি কি তোমার?"
উত্তরিলা জয়চন্দ্র;—"ক্ষত্রিয়ের মান
ক্ষতি হ'তে বড়; তুচ্ছ তা'র কাছে প্রাণ।

মাতামহ, বসি' দিল্লী-রাজসভাতলে,
বলেছেন ;—দিনু রাজ্য সমর্থ, সবলে।
অধম ভিক্ষুক প্রায় গণি' মোরে মনে
চাহিলেন তুষিবারে অর্থ বিতরণে।
এর চেয়ে কিবা, দেব! হ'বে অপমান ?
রাঠোর দুর্ব্বল হ'ল, সবল চৌহান ?
জননীর উপরোধ করিয়া স্মরণ
করি নাই, এত দিন, কৃপাণ গ্রহণ।
তাই, দেব! করেছি মন্ত্রণ,
রাজসূয় মহাযজ্ঞ করি' উদ্‌যাপন
লব সার্ব্বভৌম পদ। ভারত মাঝার
কলিযুগে রাজসূয় হয় নাই আর।
পৃথ্বীরাজ যজ্ঞে যদি লয় নিমন্ত্রণ,
কৌশলে উদ্দেশ্য মোর হইবে সাধন।
রাঠোর প্রাধান্য যদি করে সে স্বীকার,
না রহিবে তা'র প্রতি বিদ্বেষ আমার।
কিন্তু শুনি লোকমুখে, দগ্ধ ঈর্ষানলে,
না আসিবে দুরাচার রাজসূয়-স্থলে।
প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে মোর যজ্ঞ-উদ্‌যাপনে
দিবে বাধা ; তাই আমি ভাবিয়াছি মনে,
দ্বারপাল-মূর্ত্তি তা'র করায়ে গঠন
বেত্রকরে সভাস্থলে করিব স্থাপন।
হেরি' তা'রে অন্ধ দুষ্ট লভিবেক বোধ,
শক্তি থাকে, আসিয়া, সে ল'বে প্রতিশোধ।

বিনা প্রতিবাদে যদি সহে অপমান,
কে দুর্ব্বল, কে সবল হইবে প্রমাণ।

তখন ব্যথিতচিত্তে তুঙ্গাচার্য্য বলিলেন—এই ঘোর সঙ্কটসময়ে ভ্রাতৃভেদ, জাতিদ্বেষ কি কখনও কল্যাণকর হইবে। তীর্থপ্যর্গটন উদ্দেশে হিঙ্গলাজে গিয়া যে সংবাদ শুনিয়া আসিয়াছি তাহাতে মনে বিন্দুমাত্র শান্তি নাই। ভারতবর্ষে তুর্ক-রাজ্য স্থাপন উদ্দেশ্যে গজনীরাজ মহম্মদ ঘোরী মহা আয়োজন করিতেছে।

* * গুরু আমি তব, মোর শুন উপদেশ,
ভুলে যাও অভিমান, জিঘাংসা, বিদ্বেষ।
সম্মিলিত হও বীর পৃথ্বীরাজ সনে,
শিখাও সংগ্রাম-নীতি মিলি' দুইজনে
রাঠোর-চৌহান-দলে। যদি হুতাশন
মিলে বায়ু সনে, তা'রে কে করে দমন ?
ঝটিকার বেগ যথা রোধে মহীধর,
তেমতি দাঁড়াও দোঁহে বদ্ধপরিকর।
প্রতিপদে যবনেরে বাধা করি' দান,
দাও বলি সুখ, স্বার্থ, বলি দাও প্রাণ।
নিরখিয়া যবনের হউক বিদিত,
হিন্দুত্ব ধূলায় নয়, শিলায় গঠিত।
রুদ্ধ হ'ক তুরুকের পূর্ব্বমুখী গতি,
মগধ, মিথিলা, বঙ্গ পা'ক অব্যাহতি।
শত্রু করগত প্রায় জন্মভূমি যা'র
সাজে কি এ তুচ্ছ দ্বেষ, অভিমান তা'র ?

কি লাঞ্ছনা পর সেবা বুঝিবে তখন,
দাসত্ব শৃঙ্খল কণ্ঠ পীড়িবে যখন।
আত্মীয়-কলহে যদি তৃপ্তি এত হয়,
করিও পশ্চাতে ; এবে, উপযুক্ত নয়।
হিন্দু হ'ক, বৌদ্ধ হ'ক, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ
এ সময় রক্ষা নাই বিনা সম্মিলন।
দিল্লীশ্বরে অপমান করি' অকারণ
কেন জ্বালাইবে সর্ব্বগ্রাসী হুতাশন ?
কি করিলা যুধিষ্ঠির পড়ে নাকি মনে ?
সমাপিলা যজ্ঞ, তুষি' রাজা দুর্য্যোধনে।
অগ্রে যদি হ'ত কুরুক্ষেত্র আয়োজন
তা' হ'লে কি হ'ত রাজসূয় উদ্‌যাপন ?
ভ্রাতৃভেদে কভু কার (ও) হয় নাই হিত,
উভয়ে পাইবে ধ্বংস, জানিও নিশ্চিত।"

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পরম হিতৈষী গুরুর উপদেশবাক্য নিষ্ফল হইল। জয়চন্দ্রের মন একটুকুও নরম ও পরিবর্ত্তিত হইল না। কন্যা সংযুক্তার স্বয়ম্বর ও রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষে ভারতবর্ষের রাজন্যবৃন্দকে নিমন্ত্রিত করিলেন এবং পূর্ব্বকথিতমত পৃথ্বীরাজের মূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক দ্বারদেশে দ্বারপালরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সমস্ত সংবাদ গুপ্তচরমুখে অবগত হইয়া পৃথ্বীরাজ স্বীয় বিশ্বস্ত অনুচর ও সহচরগণ সহ আসিয়া ছদ্মবেশে নিজ প্রতি-মূর্ত্তি-পাশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে নানালঙ্কারে সজ্জিতা হইয়া রাজকন্যা সংযুক্তা সভামধ্যে আনীতা হইলেন। ভাট একে একে সমস্ত রাজপুত্রগণের বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সংযুক্তা কাহারও কণ্ঠে মাল্য অর্পণ না করিয়া

যথায়, সভার প্রান্তে, জনতার মাঝে,
দ্বারপাল-বেশী নিজ প্রতিমূর্ত্তি পাশে,
উপবিষ্ট পৃথ্বীরাজ, আসিলা কুমারী।
* * * * সখী-কর হ'তে
ল'য়ে অর্ঘ্য, লয়ে মাল্য নৃপতিনন্দিনী
পূজি দ্বারপাল-মূর্ত্তি, অর্ঘ্য সমর্পিয়া,
কণ্ঠে পরাইয়া মাল্য, নমিলা সম্ভ্রমে।
আতঙ্কে বিস্ময়ে লোক নিরখে নয়নে,
'পাণ্ডু রাজ্যেশ্বর', ধরি' সংযুক্তার কর,
তুলি' অশ্বপ'রে তাঁরে, পার্শ্বে বসাইয়া
কশাঘাত করি বাজি দিলা ছুটাইয়া
গঙ্গাতীর পানে। আসিলেন গঙ্গাতীরে।
সান্ত্বনিয়া সংযুক্তায় করে ধরি' বীর
তুলিলেন তরী'পরে। অমনি ইঙ্গিতে
লৌহ-দৃঢ় শত বাহু আকর্ষিলা বলে
বহিত্র, ছুটিল তরী ঝটিকার বেগে।
অনুকূল স্রোত, বায়ু হইল সহায়,
অদৃশ্য হইল তরী মুহূর্ত্তের মাঝে।

একে জলন্ত অনল, তাহাতে ঘৃতের আহুতি। জয়চন্দ্রের পৃথ্বীরাজ-বিদ্বেষ-বহ্নি দাবাগ্নিতে পরিণত হইল।

চল, হে পাঠক! তবে, ত্যজি' আর্য্যভূমি,
যাই পুনঃ ফিরি' সেই গজনী নগরে,
নিরখি সেথায় ঘোরী, ল'য়ে মন্ত্রিগণে,
চূর্ণিতে হিন্দুরে রত কোন্ আয়োজনে।

কহিলেন ঘোরী—
"ভেদনীতি আমাদের হইবে সহায় ;
হিন্দু, বৌদ্ধ মাঝে আছে তীব্র দ্বেষানল ;
অনভ্যস্থ বৌদ্ধ রণে, অস্ত্র ব্যবহারে,
মরিবে সহজে ; হিন্দু না রক্ষিবে ত'ারে।
উচ্চবর্ণ জন কত শত্রু হিন্দুস্থানে,
অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, শূদ্র শু'ন অগণন ;
লাঞ্ছিত, দলিত এই নীচ জাতি যা'রা
বুদ্ধিহীন, বীর্য্যহীন মেষ সম তা'রা।
না আছে দৃঢ়তা, ধৈর্য্য, না আছে সাহস,
শৃঙ্খলা, সমরনীতি না পারে বুঝিতে ;
পদাঘাত ভয়ে আসি' অসি ধরে রণে ;
কি শক্তি তা'দের যুঝে আমাদের সনে ?
শাস্ত্র, বিধি হিন্দুগণ রচিয়াছে বহু ;
কিন্তু এই স্থূলতত্ত্ব ভাবে নাই তা'রা ;
দেহের প্রত্যঙ্গ যদি সবল না রয়
সে দেহ বলিষ্ঠ, দৃঢ় কখন (ও) কি হয় ?
পঙ্গু, জড়প্রায় রাখি' অসংখ্য মানবে
কেমনে সমাজবপু হ'বে বলবান ?
ভগ্ন যা'র মেরুদণ্ড হ'ক না সে বীর,
পারে কি দাঁড়াতে কভু উচ্চ করি শির ?
হ'ক দীন, হ'ক দাস তবু মুসলমান
জানে রাজা, মন্ত্রী হ'তে অধম সে নয় ;
প্রতিপদে হীন নীচ করিয়া শ্রবণ

নহে ভগ্নোৎসাহ, নহে সঙ্কুচিত মন।
আজ যে দারিদ্র্য-বশে নীচ কার্য্যে রত
অশ্বপাল, চর্ম্মকার, ভৃত্য, ভারবাহী;
সেও ভাবে যদি তা'র গুণ কিছু রয়,
রাজত্ব, মন্ত্রিত্ব তা'র অসম্ভব নয়।
বীর্য্য, বুদ্ধি নীচজনে মস্‌লিম-সমাজে
করে উচ্চ; আত্মাদরে দৃপ্ত তাই তা'রা;
হিন্দুর যে নীচ, রহি' নীচ চিরদিন,
হতমান, স্বল্পায়াসে হইবে অধীন।
মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণ শাসে হিন্দুস্থান,
অন্য যা'রা রাজতন্ত্রে অজ্ঞ, উদাসীন;
কোথা পাবে স্ফূর্ত্তি তা'রা, কোথা পাবে বল?
পলা'বে সঙ্কটকালে ত্যজি রণস্থল।
আছে রাজপুত জাতি বটে বীর্য্যবান,
সম্মিলিত হ'লে তা'রা অজেয় সমরে;
কিন্তু গ্রামে, গ্রামে তা'রা রাজা জনে, জনে;
সর্ব্বে সার্ব্বভৌম, হবে মিলন কেমনে?
নাহি সখ্য, নাহি মৈত্রী রাজপুত মাঝে;
অল্পে রুষ্ট, হানে অসি বক্ষ পরস্পর;
ক্ষতিগ্রস্ত, ঈর্ষাপন্ন, লাঞ্ছিত বিজিত,
বহু শত্রু চৌহানের আছে হিন্দুস্থানে;

* * * *

শত্রুর যে শত্রু তা'রে মিত্র ভাবি' মনে
পৃথ্বীরাজ-শত্রু সনে হইবে মিলিত;

উচ্চ, নীচ যে যা' হ'ক, পুরুষ কি নারী,
যথাযোগ্য কার্য্যে সবে কোরো সহকারী।
থাকে শত্রু রাজা, তা'র যাইবে সভায়,
থাকে শত্রু সাধু, তা'র যাইবে আশ্রমে;
শ্মশানে; শুনি শত্রুধ্বংস তরে
ভ্রান্ত হিন্দু শব লয়ে পূজা সেথা করে।
পৃথ্বীরাজ শত্রু মাঝে শ্রেষ্ঠ দুইজন,
কনোজের রাজা আর জম্মু-অধিপতি;
হয়েছে নৃসিংহদেও পদে মোর নত,
তুমি গিয়া জয়চন্দ্রে কোরো হস্তগত।

কত দিন যায়—একদিন চৌহানের রাজপুরী আজমীরে পাত্রমিত্র গুরুদেব সহ পৃথ্বীরাজ রত্নখচিত স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবিষ্ট। এমন সময় গজনী হইতে ঘোরীর দূত তাহাদের আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিল। অন্যান্য বহু কথাবার্ত্তা বাক্‌বিতণ্ডার পর গজনীর দূত—

নতশিরে হামজবী কহিলেন তবে;—
* * * জানাইব আমি
বলেছেন প্রভু যাহা; কর্ত্তব্য নির্ণয়
করিবেন হিন্দুরাজ। আদেশে প্রভুর
কোরাণ, কৃপাণ আমি আনিয়াছি সাথে;
রাখিনু উভয় এই। লইলে কোরাণ
মদিনানিবাসী এই সেথ মহামতি
করিবেন দীক্ষাদান। লইলে কৃপাণ
লক্ষ অশ্বারোহী, লক্ষ পদাতিক সহ,
ঘিরিবে আজমীর, দিল্লী;—যথা অভিরুচি।

*　　*　　*　　*

কহিলেন পৃথ্বীরাজ ; আষাঢ় প্রথমে
নবীন নীরদ যেন গর্জ্জিল গগনে ;—
"শুন, দূত ! লহ গ্রন্থ, দাও তরবারী।
কহিও প্রভুরে তব, জন্ম জন্মান্তরে
থাকে যদি পুণ্য, নরজন্মে হিন্দুকুলে ;
পারে বুঝিবারে হিন্দুধর্ম্মের মহিমা।
হেন ধর্ম্মত্যাগ আমি করিব স্বেচ্ছায় !
ধিক্ মোরে ! শত ধিক্ এ হেন প্রস্তাবে !
না ছাড়িব ধর্ম্ম আমি। কহিলে যে দূত,
আছে বহু শত্রু মোর, মিথ্যা তা'হা নয়।
কিন্তু প্রাণাত্যয়ে আমি দণ্ডিতে হিন্দুরে
না ডাকিব মুসল্মানে। মূষিক যদ্যপি
করে উপদ্রব, তবে, কোন্ গৃহী, বল,
ডাকে কালসর্পে তা'র বিনাশের তরে ?
　　এই ধনুর্ব্বাণ, এই মহাখড়্গ মোর
অক্ষম কি শত্রু জয়ে ? তাই তুরুকের
লইব আশ্রয় আমি ? ব্যর্থ বাহুবল !
কহিলে যে তুমি, দূত ? প্রভু তোমাদের
না চা'ন অপর কিছু, চাহেন কেবল
প্রভুত্ব-স্বীকার ; কিন্তু প্রভুত্ব পরের
করে যে স্বীকার, কিবা রহে তার মাঝে ?
কি পার্থক্য পরাধীনে পালিত বৃষভে ?
করি রজ্জুবদ্ধ প্রভু চালায় উভয়ে।

যতক্ষণ র'বে শ্বাস স্বধর্ম্ম, স্বদেশ,
স্বাধীনতা ছাড়িব না, ছাড়িব না কভু।
এই মোর জন্মভূমি, মাতৃস্বরূপিনী
রাজোয়ারা, সুখধাম, নন্দন সদৃশ
আজমীর দিব আমি তুরুকের করে?
পুণ্যতীর্থে, তপোবনে বৈকুণ্ঠ সদৃশ
যে দেশ, সে দেশ আমি করিব অর্পণ
শত্রুভয়ে? নিজ দেশে পরদাস হয়ে
করিব জীবন পাত? ধিক সে জীবনে!
লইলাম তরবারী, কহিও প্রভুরে,
হইবে সাক্ষাৎ দোঁহে সমর-প্রাঙ্গণে।
নির্ভয়ে কহিও দূত প্রভুরে আপন,
বিনা দোষে বক্ষে কার (ও) হানিলে ছুরিকা
শতধারে পড়ে তাহা ঘাতকের বুকে;
পাতকের প্রায়শ্চিত্ত বিধি বিধাতার। (১)"

তারপর পৃথ্বীরাজের সঙ্গে ঘোরীর মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহম্মদ ঘোরী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইলেন। ইহাই বিখ্যাত থানেশ্বর বা তিরোরীর যুদ্ধ। যুদ্ধে হারিয়া—

বসিয়াছে মন্ত্রসভা ঘোরীর শিবিরে;
ভূপতির মূর্ত্তি হেরি' ত্রস্ত, অধোমুখ
দলপতি কয়জন। কঠোর ভাষায়
কহিছেন ভূপ সম্বোধিয়া তা' সবায়;—

(১) মহম্মদ ঘোরীর সম্বন্ধে এ কথা ব্যর্থ হয় নাই। গক্করদিগের হস্তে তিনি অতি নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইয়াছিলেন।

*　　*　　*

সত্যধর্ম্ম হিন্দুজাতি শিখে নাই কভু ;
বুঝে নাই মানবের স্রষ্টা ভগবান ;
তাই, রচি জাতিভেদ, মোহে অন্ধপ্রায়,
একে অন্যে পশুসম লাঞ্ছে অবজ্ঞায়।
অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য জাতি যা'রা হিন্দুস্থানে,
শুনিয়াছি, মনস্তাপে জর্জ্জরিত তা'রা ;—
মোরা গিয়া ভাই বলি' করিলে আহ্বান
দলে দলে আসি' সবে হ'বে মুসল্‌মান।
শুনেছি ধর্ম্মের নামে মূঢ় হিন্দুগণ
পাপাচার, কদাচার করে শত শত ;
বুঝাইলে শাস্ত্রবাক্য করে যুক্তিদান,
আমাদের প্রতিযুক্তি করাল কৃপাণ।

*　　*　　*　　*

কহিলা কুতব ;—"প্রভো! সন্দেহ কি তায় ?
পাপ বিনা, হ'য়ে তা'রা, বীর, বুদ্ধিমান্,
হ'বে কেন মতিভ্রান্ত ? কেন আকরণ
করিবে স্বজাতি ধ্বংসে অন্যে নিমন্ত্রণ।
মুসল্‌মানে মুসলমানে সত্য ঘটে বাদ,
কিন্তু মোরা যুদ্ধ করি নিজেদের মাঝে ;
অন্য ধর্ম্মী শত্রু কভু না করি আহ্বান ;
হিন্দু ডাকে 'ভায়ে মোর কাটো, মুসল্‌মান!'
কহিলেন ঘোরী ;—'সত্য বুঝেছ, কুতব!
জাতিবৈর-পাপে ধ্বংস হ'বে হিন্দুজাতি ;

এদিকে তারা গিরি-শিরে রাজগুরু তুঙ্গাচার্য্য শিষ্যসহ উপবিষ্ট। বিশাল হিন্দুজাতির ভাবী পতনের আশঙ্কায় অতিশয় চিন্তান্বিত—

আচার্য্য, উন্মীলি' নেত্র, জিজ্ঞাসিলা ধীরে ;—
"কহ, বৎস! গজনীর কি সংবাদ এবে।"
বিনয়ে কহিলা শিষ্য ; মহা আয়োজন
করিছে তুরুকদল নানাদেশ হ'তে
সৈন্য, অস্ত্র, তুরঙ্গম করিছে সংগ্রহ।
কঠোর প্রতিজ্ঞ বীর মহম্মদ ঘোরী
তীব্র অপমানে
করেছে প্রতিজ্ঞা তা'রা মরিবে এবার,
তবু না ছাড়িবে যুদ্ধ।" কহিলেন গুরু ;—
"দেখ বৎস! কি পার্থক্য হিন্দু মুসলমানে।
পরাজিত জয়পাল, অভিমান ভরে,
পশিলা অনলে ; আর পরাজিত ঘোরী
করিয়াছে প্রাণপণ জিনিতে হিন্দুরে!
*　　*　　*　　*
"বল এবে, অন্য যাহা পেয়েছ সংবাদ।"
নিবেদিলা শিষ্য ;—"দেব! করিনু শ্রবণ,
ছদ্মবেশে আসি বহু যবনের চর
আমাদের বলাবল লয়েছে সন্ধান।
শুনিলাম, বহু রাজা হিন্দুস্থানবাসী,
চৌহানের জয়লাভে হয়ে ঈর্ষান্বিত,
করিয়াছে বাক্যদান সাহায্যের তরে
বলেছেন জয়চন্দ্র, পৃথ্বীরাজ যবে

পশিবেন রণক্ষেত্রে, রাঠোর সৈনিক,
হ'য়ে সম্মিলিত জম্মু সেনাদল সনে,
আক্রমিবে ভীমবলে দিল্লীর বাহিনী।

এই সমস্ত শুনিয়া গুরু তুঙ্গাচার্য্য বলিতে লাগিলেন—

তথাপি ভরসা আছে, হিন্দুগণ যদি
রহে সম্মিলিত, এই তুরুক ঝটিকা
চ'লি যা'বে, শক-হূন ঝটিকার প্রায়।
দেখিয়াছ তুমি, যবে বহে মহাঝড়,
কত তরু কত শাখা যায় ভগ্ন হ'য়ে,
কিন্তু বেণুপুঞ্জ, বদ্ধ প্রেমে পরস্পর
অভিন্ন অচ্ছিন্ন রহে। হিন্দুও তেমতি
রহিবে অভেদ্য, যদি বাঁধা থাকে প্রেমে।
বল বৎস! শুনি এবে, কোথা কোথা তুমি
গিয়াছিলে; মনোভাব কি বুঝিলে কা'র?"
কহিলেন শিষ্য;—"দেব; হইল বাসনা,
বুঝিতে, প্রথমে, যত সাধারণ লোক
কি ভাবে দেশের কথা, কি চাহে তাহারা।

এই উদ্দেশ্যে কার্ত্তিকী-পূর্ণিমা দিবসে গঙ্গা-গণ্ডকী সঙ্গমে লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত যোজনান্তব্যাপী প্রকাণ্ড মেলাস্থলে উপনীত হইয়া—কহিলাম আমি—

"শুন, দেশবাসি! মহা শঙ্কট সময়
উপস্থিত প্রায়। ম্লেচ্ছ তুরুকের সেনা,
শুনিয়াছ, সোমনাথ ভেঙ্গেছিল যারা,
আসিছে আবার। যথা পড়ে পঙ্গপাল,

পত্র, পুষ্প, ফল কিছু না রহে যেখানে।
তেমতি এ তুর্কদল পড়িবে যথায়
উচ্ছিন্ন করিবে দেশ। এ সময় কেহ
রহিও না উদাসীন ; নিজ নিজ ভূপে
করিও সাহায্য দান। রাজার বিপদে
প্রজার বিপদ সদা রাখিও স্মরণে।
ডাকিবেন যবে রাজা সাহায্যের তরে
দাঁড়াইও অস্ত্র ল'য়ে। দেবী দেশমাতা,
বাস্তুভূমি বলি' যাঁরে পূজা কর সবে,
ডাকি'ছেন নির্ব্বিশেষে রাজা, প্রজা সবে।
আসি' যদি তুর্কদল বসে সিংহাসনে,
ম্লেচ্ছ-পদ-সেবা ভাগ্যে ঘটিবে সবার।
(কহে তারা পরস্পরে—)
"কে তুরুক ? কেন আসে ?" কৃষি একজন,
গ্রামের মণ্ডল বলি·বোধ হ'ল তারে,
কহিলা সে নমি মোরে—
"সন্ন্যাসী ঠাকুর !
কি বলিছ ? কেন হেন দেখাইছ ভয় ?
আসিবে তুরুক-সেনা, কি ক্ষতি মোদের ?
সেবায় না ডরি মোরা ; অভ্যস্ত সেবায়।
রাজা, রাজমন্ত্রী, রাজ-গুরু-পুরোহিত,
সেনাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ, অশ্ব-হস্তিপাল,
সৈনিক, প্রহরী সেবা নাহি করি কা'রে ?
সবে আমাদের প্রভু, সবে চাহে সেবা ;

কি লাজ তুরুক-রাজে সেবি যদি তবে ?
জন্মে ছাগ মাংস দিতে ; নর দেয় বলি,
ব্যাঘ্র করে বিদারিত, গ্রাসে অজগর,
এই মাত্র ভেদ ; কিন্তু মৃত্যু প্রতিস্থলে।
পিতৃ পিতামহ হ'তে শুনিতেছি মোরা,
যে হ'ক সে হ'ক রাজা, আমরা কৃষক
সকলের ভক্ষ্য। মোরা কি জানি যুদ্ধের ?
নহি রাজপুত, নাহি অস্ত্রের অভ্যাস ;
বহি ভার, কর্ষি ভূমি। রাজার প্রহরী
ধরে আসি', যা'ব যুদ্ধে যা' জানি করিব।
হন জয়ী মহারাজ, দিব পূজা, বলি ;
জয়ী হ'য়ে তুর্করাজ বসে সিংহাসনে,
দিব কর ; বাস্তু মাতা থাকুন মস্তকে।"
ব্যথিত অন্তরে,
উত্তীর্ণ হইয়া গঙ্গা, আসিলাম আমি
পুষ্পপুরে (পাটলীপুত্র—পাটনা)
হেরিলাম শ্রীহীনা, মলিনা
এবে-পুরী। নেত্রে ধারা বহিল স্মরণে.
কোথা সে যবনজয়ী চন্দ্রগুপ্ত ভূপ,
কোথা সেই সার্ব্বভৌম অশোক নৃপতি।
দেখিলাম বৌদ্ধধর্ম্মী, পালবংশোদ্ভূত
নৃপ এক অধিষ্ঠিত রাজসিংহাসনে।
জিজ্ঞাসিলা ভূপ ;—
"বিপ্র ! কি প্রার্থনা তব ?"

কহিলাম আমি ;—
"নৃপ ! দেবী দেশমাতা,
আসমুদ্র-হিমাচল বক্ষ প্রসারিয়া
রহেছেন যিনি ল'য়ে আমা সবাকারে,
বিপন্না, ব্যাকুলা এবে। আসিছে তুরুক
চির-অধীনতা-পাশে বাঁধিতে তাহারে।
ধর্ম্মভেদ, জাতিভেদ ভুলি' এ সময়
পশুন সংগ্রাম ক্ষেত্রে। বীর পৃথ্বীরাজ
স্বদেশ, স্বধর্ম্ম তরে প্রাণ আপনার
করেছেন যুদ্ধে পণ। হিন্দু, বৌদ্ধ সবে
হয় যদি সম্মিলিত, কখন (ও) যবন
না পারিবে প্রবেশিতে আর্য্যাবর্ত্ত মাঝে।
কিন্তু যদি পরাজিত হন দিল্লীশ্বর,
কনোজ, মগধ, বঙ্গ না র'বে স্বাধীন।
পাষাণ-প্রাচীর যদি ভাঙ্গে স্রোতবলে
বালুবন্ধ সেথা কভু পারে কি রহিতে ?
বসে যদি তুর্করাজ দিল্লী সিংহাসনে,
দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হ'বে আর্য্য ভূমি ;
তাই দেশমাতা মোরে দেছেন পাঠায়ে।"
হাসিয়া কহিলা রাজা ;—
"বুঝেছি ব্রাহ্মণ !
চৌহানের চর তুমি ; এসেছ কৌশলে
সেনা, অর্থ বল মোর করিতে নিয়োগ
চৌহানের শত্রু জয়ে ; বরিতে আমারে

দিল্লীর সামন্তপদে ; বৃথা এ প্রয়াস।
নহি অর্ব্বাচীন আমি, নহি অবিবেকী,
না আছে বিবাদ মোর তুরুকের সাথে,
চৌহানের পক্ষ ল'য়ে, তবে অকারণে,
কেন ঘাঁটাইব তায় ? ভুলি নাই মোরা,
অহিংসক বৌদ্ধ প্রতি যত অত্যাচার
করিয়াছে হিন্দুগণ। আছে মর্ম্মে গাঁথা
বোধি-দ্রুম উৎপাটন, পদাঙ্ক ভঞ্জন,
সঙ্ঘারাম ধ্বংস। তবে, লজ্জাহীন হ'য়ে,
বৌদ্ধের সাহায্য হিন্দু চাহে কোন্ মুখে ?
কেমনে ভুলিলে, বিপ্র ! সঙ্ঘারাম হ'তে
শম-গুণান্বিত মহাস্থবিরে কতই
ডাকি' তর্কযুদ্ধে তব সমধর্ম্মিগণ,
ন্যায়, সত্য অতিক্রমি' লভিয়া বিজয়,
করিয়াছে বিদলিত হস্তিপদতলে,
বধিয়াছে অঙ্গচ্ছেদি' কুঠার আঘাতে,
চূর্ণিয়াছে উদুখলে ? স্মরিলে সে কথা
ঝরে নেত্রে অশ্রুধারা, বহে তপ্ত শ্বাস।
নীরবে সহেছে বৌদ্ধ ; কিন্তু বিধাতার
ন্যায়দণ্ড, এতদিন, ছিল উত্তোলিত,
পড়িবে এবার ; তাই আসিছে তুরুক।
বসে যদি তুর্করাজ দিল্লী-সিংহাসনে,
কি ক্ষতি মোদের তাহে ? সমান উভয়,
পার্থক্য না হেরি মোরা তুয়ারে, তুরুকে।

আসিলাম আমি দেব! পুণ্য ত্রিবেণী-সঙ্গমে
কহিলাম একদিন ;—
"নমঃ সাধুগণ!
আসিছে তুরুক সেনা। এ সঙ্কট কালে
কাতরা ভারত-মাতা ডাকেন সবারে,
দীনা, অশরণা হয়ে। আপনারা সবে
মাতার সুপুত্র; নিজ নিজ শিষ্যগণে
বলুন বুঝায়ে, দেশ, ধর্ম্মরক্ষা তরে,
হইবারে সম্মিলিত। বসিলে তুরুক
আর্য্যাবর্ত্তে, আর্য্যধর্ম্ম না থাকিবে আর।"
রহিলা নীরবে সবে। সাধু একজন,
শিরে কুণ্ডলিত জটা, ভস্মাবৃত তনু,
জিজ্ঞাসিলা ডাকি' মোরে ;—
"কে ভারত-মাতা?
কা'রে উদ্ধারিতে তুমি কহিছ সবায়?"
কহিলাম আমি ;—
"তিনি দেবী দেশমাতা;
যাঁর অঙ্কে আশৈশব লালিত আমরা,
মিলিবে অন্তিমে ভস্ম যাঁ'র দেহ সনে,
বক্ষজাত-শস্যরসে জীবন মোদের
বাঁচান সতত যিনি, জননী যেমতি
স্তন-দুগ্ধ দানে সুতে, শুন, সাধুগণ!
তিনিই ভারত-মাতা; রক্ষুন তাঁহারে।"
কহিলেন সাধু ;—

"মোরা সংসার-বিরাগী
সন্ন্যাসী, সম্বন্ধহীন পৃথিবীর সনে ;
কি ক্ষতি মোদের যদি আসে তুর্ক সেনা ?
নাহি আমাদের গৃহ, নাহি ধন, ভূমি,
কি লইবে তা'রা ? মোরা রয়েছি যেমন
রহিব তেমন (ই)। রবে চন্দ্র, সূর্য্য, তারা,
রবে তরুমূল, রবে পর্ব্বত কন্দর ;
তৃপ্ত, সুখী র'ব তাহে। শিষ্য, ভক্তজনে
রক্তপাতে উত্তেজনা করিব কি হেতু ?
কোন্ পন্থী সাধু তুমি ? শুন নাই কভু
বন্ধমূল কর্ম্ম ? হয়ে মুক্তি মার্গগামী
লব কি বন্ধন বৃথা কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে ?
রাজ্য, ধন, দারা, পুত্র অনিত্য সকল,
ধর্ম্মমাত্র নিত্য ; ত্যজি' পূজা, পাঠ, যোগ
বিসর্জ্জিব নিত্য কিসে অনিত্যের তরে ?"
কহিলা সম্বোধি মোরে সাধু অন্য জন ;—
"মায়া বিজৃম্ভিত বিশ্ব ; কেবা রাজা, প্রজা ?
কেবা জেতা, কেবা জিত ? অভিন্ন উভয়।
মোহবশে মাত্র নর করে ভেদ জ্ঞান,
দ্বৈত অদ্বৈতের মাঝে ; জয়, পরাজয়,
অসত্য, অনিত্য এই জগতের মাঝে,
তুল্য দুই ; না বিচারি' মূঢ় তব গুরু
বৃথা শিক্ষা-দীক্ষা-দানে বঞ্চিয়াছে তোমা'।"
ব্যথিল হৃদয় মম। 'সাধু সাধু' বলি,

সমবেত সর্ব্বজন প্রশংসিলা তাঁরে ;
বুঝি' অভিপ্রায়, আমি লইনু বিদায়।
বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি' কহিলেন গুরু ;—
"বৃথা পাঠ, বৃথা পূজা, বৃথা জপ, ধ্যান,
মানব মানবহিতে উদাসীন যদি।
অজ্ঞতার হীনতার দুর্ভেদ্য তিমিরে
কোটি কোটি নর, নারী সমাচ্ছন্ন যথা,
সে দেশে কি আত্মত্রাণ মন্ত্র মাত্র লয়ে
নিষ্কর্ম্মা রহিবে জ্ঞানী ? নিজে নারায়ণ,
অবতরি' নররূপে, ধর্ম্মরক্ষা তরে,
প্রচারিলা কর্ম্মযোগ যে দেশের মাঝে,
প্রণোদিলা মহারণে বীর ধনঞ্জয়ে,
হায় রে দুর্ভাগ্য ! সেথা নাহি বুঝে লোক
কর্ম্মে, ধর্ম্মে কি সম্বন্ধ ! থাকে ধর্ম্ম যদি
পূজা পাঠে, আছে ধর্ম্ম রণে প্রাণদানে
স্বদেশ, স্বজাতি তরে। বিধির আদেশে
করে কর্ম্ম নর, তবে, কোন্ কর্ম্ম হীন ?
রাজা পালে প্রজা, ভূমি কর্ষে কৃষিজন।
যুদ্ধে যোদ্ধা, মলাকর্ষী বহে মলভার ;
দেখ ভাবি' কা'র কর্ম্ম পারো বর্জ্জিবারে।
হ'ক গুরু, হ'ক লঘু, যে কর্ম্মের মাঝে
জীবের কল্যাণ, তাই বিধাতৃ-বিহিত ;
তা'ই ধর্ম্মমূল। হায় ! অনিত্য সংসার,
এ অসত্য, প্রচারিত কি অশুভক্ষণে ;

অস্থি, মজ্জা মাঝে পশি' ভারতবাসীর,
হরিতেছে মনুষত্ব ! এই যে সংসার,—
রূপ রস গন্ধময়ী এই বসুমতী,
বিধির অপূর্ব্ব সৃষ্টি, পূর্ণ জীবে, জড়ে ;
স্নেহে পূত, প্রেমে স্নিগ্ধ, সমৃদ্ধ সংযমে ;
নহে মায়া মরীচিকা—পুণ্য কর্ম্মভূমি ।
লভি' কর্ম্মেন্দ্রিয় নর, বিধির বিধানে,
প্রেরিত এ কর্ম্মভূমে কর্ম্ম সাধিবারে ;
বহে বন্ধমূল কর্ম্ম ; কর্ম্ম মুক্তিপ্রসূ ।
আসি' এ সংসার মাঝে, যুগ যুগান্তের
হ'য়ে কর্ম্মফলভোগী, উচিত কি কভু
ধর্ম্মালম্বে কর্ম্মত্যাগ ? দেখ বিচারিয়া
ভ্রষ্ট ধর্ম্ম, লুপ্ত বিধি এ ভারত হ'তে ;
আছে মাত্র স্বাধীনতা ; বীর্য্যের প্রসূতী,
মনুষ্যত্ব সহচরী । কু-শিক্ষার বশে,
কর্ম্মে দোষারোপ করি', তা'ও যায় যদি
কি আর রহিবে তবে ? ভ্রান্ত আর্য্যসুত,
বুঝিল না মোহবশে জাতি-পরিণাম,
তাই হেন উদাসীন । কি কহিব আর ?
বল, এবে, অন্য কোথা গিয়াছিলে তুমি ।"
নিবেদিলা শিষ্য ;—
"আমি দেবের আদেশে,
ত্যজি আর্য্যাবর্ত্ত, লভিয়' বিন্ধ্যাচল ভূমি,
প্রবেশিনু দাক্ষিণাত্যে । কি বলিব, দেব !

শতগুণ ঔদাসীন্য হেরিনু তথায়।
তুর্কের বিক্রম, বল, হিন্দুধর্ম্ম-দ্বেষ
না ভাবে, না বুঝে লোক। হয়েছে বিস্মৃত
সোমনাথ-ধ্বংস। গর্ব্বে কহে কোন জন ;-
'কা'র শক্তি বিন্ধ্যগিরি পারে লঙ্ঘিবারে ?
মরিবে তুরুক যদি প্রবেশে এ দেশে'।
কেহ কহে ;—'জাতিগর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্তবাসী
অবজ্ঞা, উপেক্ষা করে দাক্ষিণাত্যজনে ;
কিষ্কিন্ধ্যানিবাসী বলি' করে উপহাস।
যদি হয় নিগৃহীত তুরুকের করে
কি ক্ষতি মোদের তাহে ? ভাঙ্গুক গরব।'
এইরূপে নানাজন কহে নানা কথা ;
উত্তর, দক্ষিণ, মধ্য, পূরব, পশ্চিম
সর্ব্বদেশে সমভাব ; উদাসীন সবে।
স্বদেশ বলিলে বুঝে গ্রাম আপনার ;
স্বজাতি বলিলে বুঝে নিজ সম্প্রদায় ;
সীমাবদ্ধ ভক্তি, প্রেম এ দু'এর মাঝে ;
ভারত সন্তান বলি' নাহি বুঝে কেহ।
রাজা ভাবে নিজ রাজ্য ; প্রজা ভাবে নিজ
শস্যক্ষেত্র ; ভাবে শ্রেষ্ঠী নিজ ব্যবসায়।
আসমুদ্র-হিমাচল স্বদেশ সবার,
আচণ্ডাল-দ্বিজ সবে স্বধর্ম্মী, স্বজাতি,
একের বিধ্বংসে হ'বে ধ্বংস সকলের,
সে কথা বারেক কা'র(ও) না পড়ে স্মরণে।

দেশমাতা শব্দ আমি কহিতাম যবে,
নির্ব্বাক্, বিস্মিত লোক রহিত চাহিয়া।
একদিকে তুরুকের সঙ্কল্প কঠোর,
ধর্ম্মোৎসাহ, সুবিপুল যুদ্ধ-আয়োজন,
অন্য দিকে আমাদের শৈথিল্য, জড়তা,
ধর্ম্মালস্য, অপকর্ষ সময় প্রলয়
দেখি', শুনি' সদা মোর শঙ্কা হয় মনে,
অনিবার্য্য দাস্য, দৈন্য ভারত-মাতার।"
সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ি' কহিলেন গুরু ;—
"বুঝিলাম, বৎস ! দৈববলে প্রতিকূল।
যবনের আয়োজনে নাহি ছিল ভয় ;
ভয় এই দেশব্যাপী ঔদাস্যে হিন্দুর।"

একাদশ অধ্যায়।

নিপীড়িতের নিদ্রাভঙ্গ।

যুগ যুগান্তের নিপীড়িত, পদদলিত, অবজ্ঞাত শ্রেণীর মর্ম্মস্থল হইতে এক অভিনব আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে—"আমরা আর হীনের মত, অধমের মত সকলের পদতলে পড়িয়া থাকিব না"। সে মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ মানবের কি কথা—দিক্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া প্রেমময় ব্রহ্মাণ্ডপতির স্বর্গ সিংহাসন পর্য্যন্ত নড়াইয়া দিয়াছে, সে তপ্ত বক্ষের করুণ আর্ত্তনাদ বিশ্বস্রষ্টার হৃদয় টলাইয়া তুলিয়াছে, সে তপ্ত অশ্রু শ্রীহরির প্রাণ গলাইয়া দিয়াছে। যাহারা স্মরণাতীত কাল হইতে—তথা কথিত অভিজাতবর্গের ও উন্নত শ্রেণীর শ্রীচরণ-পাষাণযন্ত্রের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া পশুর মত পড়িয়া থাকিত; নীরবে তপ্ত বক্ষের উষ্ণ অশ্রুধারায় মুখ বুক ভাসাইয়া দিত, নিজ নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া বিধাতাপুরুষের কেবলই নিন্দা করিত, নবযুগের প্রাণ স্পন্দনে, নবীনযুগের সঞ্জীবন সুধাপূর্ণ মলয়ানীলের সুখস্পর্শে তাহারা আজ অত্যাচারী হিন্দু সমাজের ভিত্তিমূল কাঁপাইয়া তুলিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর জাগরণের আহ্বান, চৈতন্য লাভের বার্ত্তা আজ তাহাদেরও কর্ণমূলে প্রবেশ করিয়াছে। তুই ছোট আমি বড়, তুই নীচ আমি মহৎ, তুই অধম আমি উত্তম, তুই ক্ষুদ্র আমি বৃহৎ, তুই অস্পৃশ্য আমি পবিত্র, তুই শূদ্র আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া এতদিন যাহাদিগকে অবিচার ও অত্যাচারে নিপীড়িত করিয়া পদতলে দলিত করিয়াছি, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও চতুর্ব্বর্ণ-বিভাগের ভুয়া কথার প্রলোভনে এতদিন যাহাদিগকে পোষা কুকুরের মত পায়ের তলে দাবাইয়া রাখিয়াছি, ধর্ম্মের নামে, শাস্ত্রের নামে, ঋষিগণের নামে, এমন কি স্বয়ং প্রেমময় ভগবানের নামে পর্য্যন্ত নিজেরা

শাস্ত্র ও শ্লোক রচনা করিয়া অত্যাচারে অত্যাচারে যাহাদিগকে চলমান শ্মশান সদৃশ করিয়া তুলিয়াছি—আজ তাহারা সমুদয় অত্যাচার অবিচার বুঝিতে পারিয়া—ভগবৎ কৃপাবলে বলীয়ান্ হইয়া—জগতের সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। কার সাধ্য ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ইহার গতিরোধ করিতে পারে। বেদ বেদান্ত পুরাণ সংহিতার নামে আমরা যাহাদিগকে পশুচিত অত্যাচারে জর্জ্জরিত করিয়াছি—আজ তাহারা লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া নিজেরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শাস্ত্রের প্রকৃত রহস্য উদ্ভাবনে সক্ষম হইয়াছে, কে আর তাহাদিগকে শাস্ত্রের কূটার্থ করিয়া অন্ধতমসায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে সক্ষম। সমাজ জননীর সমুদয় সন্তান, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, উত্তম অধম নির্ব্বিশেষে চতুর্দ্দিক হইতে—সমাজের প্রতি কেন্দ্র হইতে—প্রতি অন্ধকার কোণ হইতে—নূতন নূতন অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষায়, নব নব শক্তি সঞ্চয়ের বাসনায়, নূতন নূতন আশার উদ্দীপনায় উৎকুষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে এবং যেখানেই বাধা পাইতেছে সাগরাভিমুখিনী তটিনীর ন্যায় সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া ভীমবলে জাগিয়া উঠিতেছে। বাধা যত গুরুতর হইতেছে জাগিবার আকাঙ্ক্ষা, উত্থানের কামনা ততই বলবতী হইতেছে। এ বিশ্বই ভগবানের পবিত্র লীলাক্ষেত্র। এখানে অবিচার অত্যাচার অন্যায় অসত্য কত কাল চলিতে পারে? তাই অত্যাচারী ব্রাহ্মণ্যকরসঞ্জাত অত্যাচারী ক্ষত্রিয় রাজ্য অকালে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। যুগধর্ম্ম অঘটন ঘটাইতে চিরদিনই সিদ্ধহস্ত। এই যে অনুন্নত শ্রেণীর জাগরণ, ইহাও যুগধর্ম্মের অন্যতম কারণ। এই যে সমাজব্যাপী আন্দোলন—এই যে সমাজব্যাপী আলোড়ন, আলোচনা—যুগধর্ম্মই ইহার মূলীভূত কারণ। সুতরাং ইহাকে আর তাচ্ছিল্য করিবার অথবা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। বারুদের ক্ষণস্থায়ী আগুন বলিয়া ইহাকে আর বিদ্রূপ করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। ইহা অন্ধকার রজনীর ক্ষীণ বিদ্যুৎঝলক নহে। বসন্ত ঋতুর আগমনে যখন মলয় মারুত সারা

দেশের মধ্য দিয়া বহিয়া যায়—তখন যে শুধু ঐশ্বর্য্যশালী ধনবানের কুসুম উদ্যানের পুষ্প তরু গুল্ম লতামঞ্জরীই মঞ্জরিত হইয়া উঠে—তাহা নহে—ছাই ভস্ম শবাস্থিপূর্ণ শ্মশানেও তখনও কুসুমগুচ্ছ স্তবকে স্তবকে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে এবং নানাবিধ জঞ্জাল পরিপূর্ণ ঘৃণিত আস্তাকুড়েও তরু গুল্ম লতা পল্লব গজাইয়া উঠে। প্রকৃতির ইহাই সনাতন নিয়ম। ইহার বিরুদ্ধে কোন শক্তিই কার্য্য করিতে সক্ষম নহে। যে উন্নতিলাভের আকাঙ্ক্ষায় মানব উন্মত্তের মত জ্ঞান বিজ্ঞান মথিত করিয়া সারা বিশ্ব ছুটিয়া বেড়াইতেছেন,—পরিব্রাজকরূপে কত দেশ-দেশান্তর পাহাড় পর্ব্বত সাগর মহাসাগর অতিক্রম করিয়া ধরিত্রী দেবীকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছেন—সে আকাঙ্ক্ষা সে উচ্চাভিলাষ কি অনুন্নত ভ্রাতৃবর্গের হৃদয়ে নব চেতনার সঞ্চার না করিয়া থাকিতে পারে? উন্নতি ও জাগরণের সেই অমৃতস্রাবী বাঁশরীর স্বর দীন দরিদ্র অনাথ কাঙ্গাল অক্ষম দুর্ব্বলের ভগ্ন কুটীর দুয়ারেও যে আসিয়া পঁহুছিয়াছে। সুতরাং ঐ যে দরিদ্র অজ্ঞ কৃষক উন্নতির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে—নীরবে অত্যাচার সহিতে অসম্মতি প্রকাশ করিতেছে—ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। ইহাতে তাহাদিগকে দোষ দিতে পার না,—অথবা "চাষা বেটারা কি সব আরম্ভ করিয়া দিয়াছে" বলিয়া বিদ্রূপ করা উচিত নয়। ইহা এ যুগের যুগমাহাত্ম্য। তুমি আমি নগণ্য রাম শ্যাম,—২।৪ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা ১০।২০ জন অত্যাচারী জমিদার ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াও কিছু করিতে পারিবে না—পারিতেছে না। এ উত্থানের—এ জাগরণের পশ্চাতে অলক্ষ্যে প্রেমময়ের ইঙ্গিত কার্য্য করিতেছে। মানুষের কি সাধ্য ভগবানের কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে পারে? অনন্ত শক্তিশালী বিশ্ব সম্রাটের স্নেহাশীষ ধারা নিয়ত যাহাদিগের মাথার উপর বর্ষিত হইতেছে—ন্যায়পরায়ণ ইংরেজরাজ যাহাদিগকে তুলিবার জন্য সর্ব্বদা যত্নবান্ আছেন—ভারতের সমুদয় জননেতা যাহাদিগকে হাত

ধরিয়া তুলিবার জন্য কত ক্লেশ স্বীকার করিতেছেন, হৃদয়হীন গর্ব্বিত সমাজপতি তাহাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কি করিতে পারিবে? বৈশাখের দারুণ ঝড়ে যেমন শুষ্ক পত্র উড়িয়া যায়—বিরুদ্ধবাদিগণের শক্তিহীন উচ্চ চীৎকার ধ্বনিও তেমনি অনন্ত আকাশে মিলিয়া যাইতেছে;—কোনই অনিষ্ট করিতে পারিতেছে না।

আমাদের এখন নিতান্ত কর্ত্তব্য—এই নব জাগ্রত উন্নতি তৃষ্ণা বা শক্তি সামর্থ্যকে স্নেহের চক্ষে দর্শন করিয়া ধান্য দূর্ব্বা দ্বারা অভিনন্দিত করা—যুগযুগান্তের ঘৃণা বিদ্বেষ অপ্রীতি অনৈক্য হৃদয় হইতে ভ্রাতৃত্বের পূত মন্দাকিনী ধারায় মুছিয়া ফেলিয়া দিয়া বাহুপাশে বক্ষে টানিয়া লওয়া, দূরে পরিত্যক্ত ভ্রাতৃগণকে আপনার করিয়া লওয়া; এই ভদ্র ইতর, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচের মিলনের উপরই সমাজ ও দেশের সমুদয় কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। এতদ্ব্যতীত আমাদের জাতীয় দুর্গতির অবসানের অন্য পথ নাই।

বহুশত বৎসর হইতে আমরা—অভিজাতবর্গ নানাপ্রকারে এই মহৎ প্রাণ নিরক্ষর শ্রমজীবী ও চাষা নামক বিশ্বের ভরণপোষণকারী, সৃষ্টিরক্ষক, সৃষ্টিপালক বিরাট মানবমণ্ডলীকে "ছোটলোক" বলিয়া পদতলে দলিত করিয়া—দাবাইয়া রাখিয়া দিয়াছিলাম। তাই সেই সর্ব্বশক্ত্যাধার ভগবানের বিরাট মূর্ত্তি জনসাধারণ কারাকক্ষে অবস্থিত শৃঙ্খলাবদ্ধ শক্তিহীন সিংহের মত আমাদের পদতলে থাকিয়া আমাদের ইঙ্গিতে আমাদের পদসেবা করিয়াছে, আমাদের ভ্রূকুটি ভ্রূভঙ্গে পরিচালিত হইয়াছে—এতদিন তাহারা প্রকৃত মানুষের ন্যায় জগতের সমক্ষে মাথা তুলিতে সমর্থ হয় নাই। অবাধ বিদ্যা প্রচারের মহিমায় আজ তাহাদের সমুদয় দৌর্ব্বল্য, সমুদয় দৈন্য অবসাদ ঘুচিয়া গিয়াছে। ইংরাজ রাজত্বে, সার্ব্বজনীন শিক্ষা প্রচারে তাহাদের যুগযুগান্তের মালিন্য মুছিয়া গিয়াছে। আশায় তাহাদের বক্ষঃস্থল

প্রসারিত হইয়া উঠিয়াছে—হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হইয়াছে। বিদ্যা শিক্ষারূপ গুরুতর অপরাধে জিহ্বাচ্ছেদ, শরীর ভেদের "দয়াল দণ্ডের" অবসান হইয়াছে। কার সাধ্য এই উন্নতি স্রোত বাধা দিয়া রুদ্ধ করিয়া রাখে। রাজ আইনে শিক্ষার স্রোত বন্ধ করিয়া মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তির হস্তে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার দরুণই ভারতের সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে। দেশশুদ্ধ লোক আইনের বলে মূর্খ থাকিয়া গেল—কয়েকজন মাত্র ব্রাহ্মণ অজ্ঞানাচ্ছন্ন ভারতগগনে জোনাকী পোকার ন্যায় মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। ভারতবর্ষের পতনের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কারণ। জ্ঞান বিস্তারের উপরই এবং জ্ঞান বৃদ্ধিতেই মানুষের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি। জ্ঞানের উপরই মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উন্নতি নির্ভর করে। প্রত্যেক ব্যক্তি বা ব্যষ্টি উন্নত হইলেই সমষ্টি বা সমগ্র দেশবাসী উন্নত হইতে পারে। অবজ্ঞাত প্রপীড়িত জাতির উত্থানও এই শিক্ষা ও জ্ঞানলাভের উপর নির্ভর করিতেছে।

সমগ্র হিন্দুস্থানে সত্য, ধর্ম্মের পবিত্র আলোক জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মিথ্যা ও শঠতার পাপান্ধকার আর কতকাল তিষ্ঠিতে পারে? আর মিথ্যা প্রতারণায় কতকাল লোকের চক্ষু ঢাকিয়া রাখা চলে? দুঃখের অমানিশা রজনী প্রভাত হইয়াছে। সাম্য, প্রেম ও শিক্ষার বিজয় পতাকা লইয়া রাজা রামমোহন ও স্বামী বিবেকানন্দ আজ প্রভাতের কলকণ্ঠ বিহঙ্গের কাকলী ধ্বনির মধ্যে প্রতি গৃহ দ্বারে সমাগত। পরম হিতৈষীরূপে অতিথী-দ্বয়কে বরণ ডালা সাজাইয়া ধান্য দূর্ব্বাদলে মাল্য চন্দনে সম্বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়া লও। হে বিরাট—হে সমাজরূপী হিরণ্যগর্ভ! আর কতকাল দুঃখ দুর্দ্দশার ক্ষীরোদ সাগরে যোগনিদ্রারূপ মোহনিদ্রায় অচেতন থাকিবে। ঐ যে তোমার নাভিকমলোৎপন্ন স্বকর্ম্মোদ্ভব মধু কৈটভরূপ অবিদ্যা ও অপ্রেম অসুর সমাজ দেহরূপী কমলযোনীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। উঠ উঠ

নিদ্রিত বিরাট—, আর কতকাল দুঃখ সাগরে মোহনিদ্রায় ঘুমাইয়া থাকিবে। জাগ, উঠ, অনন্ত সম্মুখ সম্প্রসারিত দৃষ্টি লইয়া সম্মুখে অগ্রসর হও। হিংসায় বিদ্বেষে, স্বার্থপরতা ও অপ্রেমে হিন্দুসমাজ মরিতে বসিয়াছে, ডুবিতে বসিয়াছে। অভিনব আদর্শ লইয়া সমাজ সমক্ষে উপনীত হও দেখি! তোমাদের দেখাদেখি এ পতিত জাতির হিংসা বিদ্বেষের দারুণ বহ্নি—প্রেমের বারিধারায় নির্ব্বাপিত হউক। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। উঠ জাগ। তোমাদের তুলিতে ও উঠাইতে কত কত মহাপ্রাণ নরনারীর উদ্ভব হইয়াছে। প্রেমাবতার শাক্যসিংহ ও শ্রীচৈতন্যদেবের পদরজে এ দেশের ধূলিকণা পর্য্যন্ত পবিত্র হইয়াছে। তোমরা উঠ, জাগ, মানুষ হও—প্রেমিক হও ইহাই তাহাদিগের প্রার্থনা ও কামনা ছিল। প্রার্থনা পরিপূরণে বিমুখ করিও না। বিংশতি কোটি নরনারী পরস্পর প্রেম মন্দাকিনী নীরে স্নান করিয়া জাতীয় কল্যাণসাধন যজ্ঞে হাত ধরাধরি করিয়া ব্রতী হও। সহস্র যুবক ত্যাগ ব্রত গ্রহণ করিয়া বিংশতি কোটি নরনারীর কল্যাণ সাধনে তৎপর হও। সমাজসেবা ভগবৎ সেবারই নামান্তর। তোমাদের আদর্শে সমাজের জড়তা, অবসাদ অপসারিত হউক। সমাজের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যাউক। প্রতি গৃহ হইতে দেব শিশুসকল আবির্ভূত হউক। নন্দনের পারিজাত পুষ্প তোমাদের গৃহে গৃহে ফুটিয়া উঠুক। প্রেম-গঙ্গা তোমাদের গৃহ পরিজন শুদ্ধ ও পবিত্র করিয়া দিক্। সকলে একপ্রাণ, একমন হও। হরিসংকীর্ত্তনের মধুর ঝঙ্কারে প্রতি সন্ধ্যায় গ্রাম গ্রামান্তর মুখরিত হইয়া উঠুক। সমুদয় অপ্রেম মনোমালিন্য—সংকীর্ত্তন বন্যায় ভাসিয়া যাইবে। নিজদিগকে কখনও হীন, অপদার্থ ও দুর্ব্বল ভাবিও না। বিশ্বসম্রাটের সন্তান কেন মরার মত, অধমের মত সকলের পদতলে পড়িয়া থাকিবে? তোমার অপমানে যে পিতারই অপমান। ভয় কি? বল বল—

"যিনি মহারাজা বিশ্ব যাঁর প্রজা জাননারে মন আমি পুত্র তাঁর।
সামান্য ত নই রাজপুত্র হই, পিতার ধনে আমার পূর্ণ অধিকার॥
আমার পিতার রাজ্য সমুদয়, আমাকে কেবা দিতে পারে ভয়,
এ ভব সংসার পিতার পরিবার পিতার রাজ সিংহাসন হৃদয় আমার॥
পিতার ভালবাসায় সবে ভালবাসে বৃক্ষগণ নানা ফল ফুলে তোষে
বায়ু বহে গায়, জলদ জল যোগায়, (তাইতে) রবি শশি নাশে অন্ধকার॥

বিশ্ব সম্রাটের পুত্রের একি জড়তা, একি ভ্রান্তি! চেয়ে দেখ জ্ঞান বিজ্ঞান জগতে কি যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে? এখনও কি তোমাদের নিদ্রা সাজে? শত শত শতাব্দীর অজ্ঞতার মধ্য হইতে নিপীড়িত, পদাঘাতে জর্জ্জরিত, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নরনারী যুবা বৃদ্ধ এমন কি অন্ধ খঞ্জ, মূক বধির পর্য্যন্ত বিধাতার অলক্ষ্য আদেশে—মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। তোমাদের কি এখনও জড়তা শোভা পায়? শীত ঋতুর দারুণ হিমানী-সঙ্কুচিত শুষ্ক-বিটপী শ্রেণী যেমন বসন্তের মলয়-হিল্লোলে নবজীবন লাভ করিয়া সতেজ হইয়া উঠে, যুগ যুগান্তের অত্যাচার নিষ্পেষিত, বিশুষ্ক প্রাণও তেমনি বিংশ শতাব্দীর নব চেতনার সঞ্জীবন-স্পর্শে নব জীবন লাভ করিয়া সতেজে বক্ষ বিস্ফারিত করিয়া জগতের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে। পদাহত ধূলিকণা পর্য্যন্ত যখন অত্যাচারীর শিরোদেশে মস্তকোপরি উত্থিত হইয়া থাকে, তখন বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি মানব সন্তান চিরকাল অবিচার অত্যাচার সহিয়া সহিয়া মড়ার মত পড়িয়া থাকিবে ইহা কি কখন সম্ভব? হিন্দু-সমাজের অবজ্ঞাত শ্রেণীর কি কথা, এই নব জাগরণের যুগে আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত নব জীবন লাভ করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। জাগরণের চিহ্ন সারা বিশ্বজগৎ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মানুষের কি কথা তরু, গুল্মলতা, পাতা, মাটি, পাথর পর্য্যন্ত এ জাগরণে জাগিয়া উঠিয়াছে। সমাজের কেন্দ্রে কেন্দ্রে, পল্লীর গৃহে গৃহে, রাজবাটে গোচারণ মাঠে

শ্রীভগবানের পাঞ্চজন্য মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছে। সে শঙ্খের মধুর শব্দে কোটি কোটি প্রকৃতিপুঞ্জ— কুম্ভকর্ণের মহা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া চক্ষু মেলিয়া তাকাইয়াছে। কেহই আর নিদ্রায় নাই। বৃন্দা বিপিন বিহারী শ্যামল সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের ভুবন মনোমোহন বাঁশরীর তানে মর্ত্ত বৃন্দাবনের ব্রজাঙ্গনাগণ যেমন করিয়া শরতের চাঁদিমা রজনীতে রাস রসোৎসবে নিভৃত নিকুঞ্জে সমবেত হইয়াছিলেন,—দীন বৎসল করুণাময়ের অলক্ষ্য বংশীনাদে এবার তেমনি নিপীড়িত প্রকৃতিপুঞ্জ সাম্যমৈত্রী ও জাগরণের পবিত্র পতাকাতলে আসিয়া সমবেত হইয়াছে। কার সাধ্য ইহাদের গতিরোধ করে। আজ দেশ শুদ্ধ লোকে সকলেই আপন আপন ন্যায্য অধিকার কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইবার জন্য একত্র দলবদ্ধ হইয়া গভীর আন্দোলনে মাতিয়া উঠিয়াছে। কার সাধ্য এ আন্দোলনে বাধা দান করিয়া ইহাদিগকে দাবাইয়া রাখে। কে এমন ভ্রান্ত শ্রীভগবানের কার্য্যে বাধা দিতে অগ্রসর হয়। এ আন্দোলন কখনও ব্যর্থ হইবার নহে। কোন কালে কোন দেশে কখনও হয় নাই। এ আন্দোলন কখনও নিরর্থক উত্থিত হয় নাই, নিরর্থক হইবার নহে। এ আন্দোলন মূলে দীন বৎসল নারায়ণের অদৃশ্য সঙ্কেত দেদীপ্যমান বলিয়া মনস্বীগণ উপলব্ধি করিয়াছেন।

সমুদয় অবজ্ঞাত সমাজ শ্রীভগবানের আদেশে গা ঝাড়া দিয়া উঠিবার আয়োজন করিয়াছে। ভগবানের কৃপাশক্তি বা করুণার ইঙ্গিত না পাইলে সমাজের চির অবজ্ঞাত চির ঘৃণ্যজাতি সকল এমন করিয়া হিন্দুসমাজ শরীর, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিশাল অট্টালিকা কাঁপাইতে সমর্থ হইত না। উত্তরে দক্ষিণে পূর্ব্বে পশ্চিমে অধঃ উর্দ্ধে সমুদয় দিকে শ্রীহরির কল্যাণময়ী বাণী উত্থিত হইয়াছে। সে কল্যাণ-বাণী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বনিত করিয়া— মুখরিত করিয়া নিপীড়িত হৃদয়ের অন্তর তারেও বাজিয়া উঠিয়াছে।

তোমাদের মুষ্টিমেয় জন কয়েকের ক্ষীণকণ্ঠের চীৎকার ধ্বনি, "ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্ম গেল" রব মোটেই সেখানে পঁহুছিবার উপায় নাই। কোটি কোটি জন সংখ্যার তুলনায় জনকয়েক অত্যাচারী অভিজাত ব্যক্তি বিধাতা পুরুষের কার্য্যের বিরুদ্ধে অনর্থক দণ্ডায়মান হইয়া বৃথা চীৎকার করিয়া শক্তি ক্ষয় করিয়া মরিতেছে। ঐ যে বৈদ্য ব্রাহ্মণ হইবার জন্য—নমঃশূদ্র দ্বিজ হইবার জন্য, কায়স্থ, রাজবংশী পোঁার, ঝালমাল, পোঁদ প্রমুখ জাতিসমূহ কেহবা ক্ষত্রিয়, কেহবা পদ্মরাজ, কেহ বা ঝল্লমল্ল ব্রাত্য ক্ষত্রিয় কেহবা পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় হইবার জন্য, ঐ যে তন্তুবায় কর্ম্মকার, বারুজীবী, সুবর্ণ বণিক্, সচ্চাষি, মাহিষ্য, সৎগোপ, সাহা, কপালী, পাটনী, বৈশ্য হইবার জন্য জড়প্রায় সমাজ শরীর, কম্পান্বিত করিয়া গভীর আন্দোলন তুলিয়াছে ইহা কি মানুষের চেষ্টায়—মানুষের প্রেরণায় অনুষ্ঠিত হইতেছে বলিয়া মনে কর? ভুল, তোমাদের বড় ভুল। ইহা মানুষের শক্তিতে মানুষের অনুপ্রেরণায় কদাচ সম্ভব নহে। ইহার মূলে ভগবৎ প্রেরণা—ভগবৎ ক্রিয়া বিদ্যমান! শত শত শতাব্দীর অবিচার ও অত্যাচারের ফলে, শত শত শতাব্দীর পেষণ ও নির্য্যাতনের ফলে, শত শত শতাব্দীর বঞ্চনা প্রতারণার ফলে, শত শত শতাব্দীর পীড়ন ও পদা-ঘাতের ফলে—আজি এই নব জাগরণের সূত্রপাত—নবজীবনের আবির্ভাব,—নবচেতনার উদ্ভব। এই অবিচার ও অত্যাচার দমনের প্রতিকার পন্থা দীনবৎসল—ভগবানই প্রতি মানব হৃদয়ে জাগাইয়া দিয়াছেন। শ্রীহরির স্নেহবিজড়িত প্রেমমাখা আহ্বান বাণী, জাগরণ ধ্বনি, তাহাদিগের কর্ণমূলে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে। মানুষের কি সাধ্য—সমাজপতির কি শক্তি—ইহার গতিরোধ করিতে পারে? মুনি ঋষির নাম লইয়া ভারতের লক্ষ লক্ষ অত্যাচারী ব্রাহ্মণ, লক্ষ লক্ষ ক্ষত্রিয় রাজা ইহাদিগকে শত শত শতাব্দী ধরিয়া দুই পা দিয়া দলন করিয়াছে, ইহাদের ধন অর্থ,

কুসংস্কার ও অজ্ঞতায় আচ্ছাদিত করিয়া মনের সুখে যথেচ্ছারূপে শোষণ করিয়াছে, মনের আনন্দে স্বার্থপরতার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া ইহাদিগের হৃদয় রুধির, বক্ষের শোণিত, স্মৃতি সংহিতাদি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া মনের সুখে পান করিয়াছে। মানবরূপী নারায়ণের জীবন্ত প্রতিমাকে "চলমান শ্মশান", "জঘণ্য প্রভব হি সঃ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। বেদান্তের যাহারা অব্যক্ত ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ সাগরের তরঙ্গস্বরূপ, চিৎসূর্য্য ঈশ্বরের কিরণকণা, প্রজাপতি ব্রহ্মার সন্তান—নারায়ণের যাহারা জীবন্ত বিভূতি—এমন সব লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানব সন্তানকে হীন বৈশ্য শূদ্র—শ্বপচ চণ্ডাল নামে নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদিগকে দুই পা দিয়া দলন করা হইয়াছে। অত্যাচারিগণ ভুলিয়া গিয়াছিল তাহারা কি মহাপাপব্রতে ব্রতী হইয়া অনন্ত নরকের পথ পরিষ্কার করিতেছে। জানিত না এ পাপের কি ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত, কি কঠোর দণ্ড ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। প্রায় সহস্র বর্ষ হইল সেই প্রায়শ্চিত্ত চলিয়াছে। যে অত্যাচারের প্রতিকার কল্পে নরনারায়ণ সারথীবেশে ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইয়া কৃষ্ণগতপ্রাণ ভিখারী পাণ্ডবগণের প্রতি দারুণ অত্যাচারী দুর্য্যোধন দুঃশাসনাদির বুকের রক্তে ধরিত্রীর তর্পণ করিয়াছিলেন, সত্যে নরহরিরূপে আবির্ভূত হইয়া হরিদ্বেষী ভক্তদ্রোহী হিরণ্যকশিপুর বক্ষ-বিদারণ পূর্ব্বক ভক্তচূড়ামণি শিশু প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন, বামনরূপে যিনি বাসববিজয়ী বলীর দর্প চূর্ণ করিয়া তাহাকে পাতালে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, অত্যাচারী ক্ষত্রিয়কুলের মদগর্ব্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার জন্য যিনি পরশুরামরূপে কুঠার হস্তে ধরাতলে আগমন পূর্ব্বক বহুবার ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন, ধর্ম্মের নামে, যাগ যজ্ঞের নামে যখন লক্ষ লক্ষ অনাথ মানব, পশুপক্ষী, ছাগ, মেষ মহিষের পবিত্র রক্তে দেবমন্দির সকল—যজ্ঞভূমিসমূহ রঞ্জিত হইয়া

ভূত প্রেত পিশাচের লীলা নিকেতন হইয়া উঠিয়াছিল, যখন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অবোলা বাক্‌শক্তিবিহীন বলির পশুর প্রাণের বেদনা—হৃদয়ের অস্ফুট আর্ত্তনাদ নিবারণকল্পে যিনি রাজপুত্র বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া "অহিংসা পরম ধর্ম্মের" বিজয়পতাকা ভারত গগনে উড্ডীন করিয়াছিলেন, এবং যে ভগবান্ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নরনারীর কাতর ক্রন্দনে স্থির থাকিতে না পারিয়া ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্র রূপে শ্রীনবদ্বীপে শচীগর্ভ দুগ্ধ সিন্ধুতে উদয় হইয়া জগতে নবযুগের সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন—তিনিই আজ জাতিকুল মদান্ধ অভিজাতবর্গের ঘৃণা ও অবমাননা, উচ্চ জাতিগণের অত্যাচার ও অবিচার, নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনার করাল কবল হইতে তাঁহার আত্মা হইতে প্রিয়তম দীনদরিদ্র, কাঙ্গাল বুভুক্ষিত, অধম অস্পৃশ্য অনাথ আর্ত্ত সন্তানগণের উদ্ধারের জন্য প্রচ্ছন্নভাবে এই সামাজিক আন্দোলন উত্থাপিত করিয়াছেন। কার সাধ্য ভগবৎ ইচ্ছার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়! ভগবানের এই জীব উদ্ধার কার্য্যে বাধা দিতে অগ্রসর হওয়া উন্মাদ ব্যতীত অন্যের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। সমাজপতির সম্পূর্ণ অযোগ্য, স্বজাতিপ্রেমবর্জ্জিত অভিজাতগণ মনে করে না—অত্যাচারীর অত্যাচার দমনের নিমিত্ত উপরে একজন আছেন। তিনি দুর্ব্বলের বল, অনাথের নাথ, তিনি কাঙ্গালের সখা, পতিতের পাবন, তিনি দীন দরিদ্রের চির আশ্রয়, চিরসুহৃদ। তাঁহাকে ফাঁকি দিবার উপায় নাই। তিনি অনেক সহ্য করেন কিন্তু সেই অত্যাচারের মাত্রা বা সীমা দারুণ ভাবে লঙ্ঘিত হইলে তিনি আর স্থির থাকিতে পারেন না। যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া দীন দরিদ্র ধার্ম্মিক সজ্জনগণের রক্ষার জন্য অত্যাচারীগণের পাপ মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলেন। কখন বা নিজে আইসেন, কখন বা স্বীয় অংশ প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করেন। এবার ভগবান্ সাধারণ চক্ষুর বিষয়ীভূত জড়দেহে নরবপু লইয়া আবির্ভূত

না হইয়া তথা কথিত অবজ্ঞাত দীন দরিদ্র নিম্নশ্রেণীস্থ সমুদয় নরনারীর অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে আসিয়া নবজাগরণ রূপে—নূতন চৈতন্যশক্তিরূপে আবির্ভূত ও প্রকাশিত হইয়াছেন।

অবজ্ঞাত নিম্নশ্রেণীর মর্ম্মভেদী কাতর আর্ত্তনাদে ভগবানের স্বর্গ সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিয়াছিল; তাই তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তাহাদের অবিরল নয়নজল মুছাইবার জন্য তিনি এবার কোটি কোটি অংশে বিভক্ত হইয়া নিপীড়িত পদদলিত অত্যাচারে জর্জ্জরিত বুভুক্ষিত জনগণের হৃদয়ের নবচৈতন্যরূপে, নব জাগরণের বাসনা ও আকাঙ্ক্ষারূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। আর কাল বিলম্ব না করিয়া সামগানে,—বেদমন্ত্রে, নানাবিধ মাঙ্গলিক স্তোত্রে ও বন্দনায়—জয় ও শান্তি উচ্চারণপূর্ব্বক বিংশতি কোটি নরনারী তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করুন।

সহস্র সহস্র বৎসর হইতে এমন কি স্মরণাতীত কাল হইতে এই সব অবজ্ঞাত, পদদলিত, নিপীড়িত লক্ষ লক্ষ প্রকৃতপুঞ্জ তথা কথিত হীনকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এই দারুণ অপরাধে—বীণাপণি ভারতী জননীর কৃপাকণা লাভে বঞ্চিত হইয়া জীবন্তে মৃতবৎ জড়বৎ—অজ্ঞান পশুর ন্যায় কালযাপন করিতেছিল। ইংরাজ রাজত্বে, অবাধ বিদ্যা প্রচারে নবযুগের নূতন শিক্ষা প্রভাবে তাহাদের মনের অন্ধকার, গৃহের অন্ধকার দূরে প্রস্থান করিয়াছে। বিদ্যাচর্চ্চার স্বর্ণকিরণে দশদিক আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা এক্ষণে তাহাদের নিজেদের স্বরূপ—নিজেদের অধিকার দাবী দাওয়া ভালরূপই বুঝিতে পারিতেছে। আর তাহাদিগকে অজ্ঞতার আবরণে, কুসংস্কারের প্রাচীরে, মূর্খতার ঘনান্ধকারে ভুলাইয়া রাখে কাহার সাধ্য। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে যেমন পাণ্ডবপক্ষীয় বীরহৃদয় সৈন্যগণ নবীন বলে নূতন উৎসাহে, নব চেতনায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল বর্ত্তমান যুগেও লক্ষ

লক্ষ অবজ্ঞাত জনসাধারণ ভারতী মাতার বীণাধ্বনি শ্রবণে নব উৎসাহে তেমনি জাগিয়া উঠিয়াছে। যে বিদ্যা দুর্ব্বলের বল, নির্ধনের ধন, অন্ধের যষ্টি, বোবার বাক্‌শক্তি, যে বিদ্যা আঁধারের দীপ শিখা—অমানিশা রজনীর ধ্রুব নক্ষত্র, জলমগ্ন নাবিকের আশার তরণী, পথভ্রান্ত পোতাধ্যক্ষের দিক্‌ নির্ণয় যন্ত্র সে বিদ্যা এতদিন ব্রাহ্মণের গুপ্ত গৃহে—মণিময় কৌটায় বঞ্চনা ও কুসংস্কারের দুর্ভেদ্য আবরণে আবদ্ধ ছিল। শূদ্র নামক ধরিত্রী প্রতিপালক—বিশ্বের বরণীয়—সরল শান্ত অকপট সমাজ সেবকগণের নিকট অজ্ঞাত ছিল! আজ নবযুগের মাহাত্ম্যে উহা অভিজাতবর্গের হস্তচ্যুত হইয়া—খুলিয়া গিয়া আচণ্ডালের মধ্যে—আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যে পারিতেছে সেই মুঠ মুঠ ভরিয়া লইয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিতেছে। কাহারও নিষেধ নাই—মানা নাই, বারণ নাই যাহার যত ইচ্ছা, যত শক্তি লইয়া যাইতেছে এবং লইয়া গিয়া আপন আপন গৃহ ভবন সজ্জিত করিতেছে। হিন্দু রাজত্বে যাহা হয় নাই, বৌদ্ধ রাজত্বে যাহা হইতে পারে নাই, মুসলমান রাজত্বেও যাহা স্বপ্নাতীত ছিল ইংরেজ রাজত্বে বর্ত্তমান যুগে তাহাই সম্পন্ন হইল। শূদ্রের জাগরণ এ যুগের সর্ব্বপ্রধান ব্যাপার, চিরস্মরণীয় ঘটনা। ব্রাহ্মণগণ স্মৃতি সংহিতাতে লিখিয়াছিলেন—"যে শূদ্র বেদ উচ্চারণ করিবে—তাহার জিহ্বাচ্ছেদ করিতে হইবে, যে শূদ্র বেদ শ্রবণ করিবে—সুতপ্ত তৈল অথবা গলিত ধাতব পদার্থ তাহার কর্ণরন্ধ্রে ঢালিয়া দিয়া তাহাকে বধ করিতে হইবে। তাঁহারা লিখিয়াছিলেন—"শূদ্রদিগকে কখন জ্ঞানোপদেশ ও ধর্ম্মোপদেশ দিবে না—তাহাদের বেদমন্ত্র স্বাহা স্বধা বষট্‌কারাদি উচ্চারণে অধিকার নাই; শূদ্রগণকে শাস্ত্রশিক্ষা দান করিবে না। বিড়াল, নকুল, ভেক, কুকুর, গাধা, পেচক, কৃকলাশ প্রভৃতি হত্যা করিলে শূদ্র হত্যার সমান প্রায়শ্চিত্ত করিবে।" অত্রিসংহিতার মধ্যে লেখা হইয়াছে—"জপ, তপস্যা,

তীর্থযাত্রা, সন্ন্যাস, মন্ত্র সাধন, দেবতা আরাধন এই ছয়টী কার্য্য স্ত্রী শূদ্রের পাতিত্বজনক। শুধু ইহাই নহে—"জপ হোম প্রভৃতি কর্ম্মনিরত শূদ্রকে বধ করিবেন ইত্যাদি।" এই সকল অত্যাচারের ফলস্বরূপ ভারতে ৬ কোটি মুসলমান ও প্রায় ১ কোটি খৃষ্টানের উদ্ভব এবং সহস্র বৎসরের দাসত্ব। পরধর্ম্ম গ্রহণ করিলে একজন হিন্দুভ্রাতা যে হ্রাস হয়—তাহা নহে; পরন্তু একজন শত্রু বৃদ্ধি হয়। ভগবানের অপার করুণায় অবিচার অত্যাচারের যুগ অতীত হইয়াছে। এই সব মহাপাপের ফল যাহা তাহাত সকলেই হাতে হাতে পাইতেছেন। সহস্র বৎসরের দাসত্বই এই সব গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত নয় কি? পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য জাতি ভারতবাসীকে নিতান্ত হেয় ও ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করেন। শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় ইহারা নানাদেশ হইতে আইনের বলে তাড়িত ও লাঞ্ছিত হইতেছে। তথাপি আমাদের লজ্জা নাই, ঘৃণা নাই, আর্য্য আর্য্য করিয়া চীৎকারপূর্ব্বক আসর মাতাইয়া রাখিতে আমরা বিলক্ষণ মজবুত। আপনাপন জাতীয় গৌরবের স্মৃতিটুকু দেখাইয়া নিজেদের বৃথা গর্ব্বের ঢাক নিজেরাই বাজাইতেছি ও আনন্দে আটখানা হইয়া আর্য্যজাতির ও আর্য্যধর্ম্মের জয় পতাকা উড়াইতেছি। যেমনটি দেখান হইয়াছে—তেমনি পাওয়া যাইতেছে; যাহা দেওয়া হইয়াছে—তাহাই ফিরিয়া আসিয়াছে। চিন্তা করিয়া হৃদয়বান্ মনস্বীগণ বিরলে নয়নজল বর্ষণ করিতেছেন ও ভগবৎ পাদপদ্মে কৃত পাপের ক্ষমা চাহিতেছেন। নিপীড়িতের উত্থানের একমাত্র উপায়—শিক্ষা প্রচার। জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা শিক্ষার সংযোগ না ঘটিলে—এ জাগরণ কুম্ভকর্ণের মত নিরর্থক জাগরণ বলিয়া জানিবে। শিক্ষাবিহীন কত শত সমাজ জাগিয়া—কত কত পত্রিকা বাহির করিল কিন্তু গ্রাহক অভাবে বংশপত্রের অগ্নির মত মুহূর্ত্ত পরই সব শেষ হইয়া গেল। আবার যে নিদ্রা সেই কালনিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িল। বালকবালিকা, যুবাবৃদ্ধ সকলকে

শিক্ষা দান করিতে হইবে। পুথিগত বিদ্যালাভের সময় যাহাদের অতিবাহিত হইয়াছে—তাহাদিগকে মুখে মুখে ইতিহাস, ভূগোল, কৃষি বিজ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা দিতে হইবে। সত্য প্রেম পবিত্রতার মহাপুণ্যপিঠে সকলে সমবেত হইয়া মানুষ হইবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও। নিজেদের অজ্ঞতা মূর্খতা, নিজেদের সংকীর্ণতা কুসংস্কার, নিজেদের অভাব অভিযোগ প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর। সমাজের দুরবস্থা ও শোচনীয় দশা নিরীক্ষণ করিয়া বিরলে নয়ন জল বর্ষণ কর। শ্রীহরির পাদপদ্মে সহায়তা লাভের জন্য নিবেদন ও প্রার্থনা জানাইতে পারিলে সাহায্য আসিবেই আসিবে। স্বজাতি প্রেমের পূত মন্দাকিনী ধারায় পরজাতি বিদ্বেষ ভাব হৃদয় হইতে ধুইয়া ফেল। অন্য জাতির দোষ উদ্‌ঘাটন ও বর্ণনা করিয়া জিহ্বা ও হস্তকে কলুষিত না করিয়া বরং সে সময়টুকু স্বজাতির কল্যাণকর কোন কার্য্যে অতিবাহিত করিতে চেষ্টা কর। পরজাতিবিদ্বেষে জাতির অভ্যুত্থান হইবে না —বরং জাতীয় পতনই ঘটিবে। অন্য জাতির গুণাবলী অনুকরণ করিতে চেষ্টা কর। তাহাদের দোষ কীর্ত্তন করিয়া কালী ও লেখনীকে অযথা কলঙ্কিত করিও না। নিজেদের দৈন্য দুর্ব্বলতা, নিজেদের অধঃপতন শোচনীয়তা চিন্তা করিয়া তাহার প্রতিবিধানে মনোযোগী হও। যাহারা এখনও আলস্য বশতঃ মোহ ঘুম ঘোরে নিদ্রায় নিমগ্ন আছ—তাহারা উঠ, জাগ। এই নব যুগে কেহই আর ঘুমে অচেতন থাকিও না। ঐ যে কলকণ্ঠ বিহঙ্গ কুলের সুমধুর কলধ্বনি শ্রুত হইতেছে—কাল-বিভাবরী অবসান প্রায়। প্রভাত অরুণের কিরণচ্ছটায় সারাবিশ্ব আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে—এখনও কি তোমাদের শয্যায় পড়িয়া ঘুম ঘোরে অচেতন থাকা উচিত ? উঠ উঠ। জগতে মহা কর্ম্মের রোল উঠিয়াছে। যে যাহার কর্ম্মপথে যাত্রা করিয়াছে। তুমিও তাহাদের পশ্চাদনুসরণ কর। অগ্রসর হও। এগিয়ে যাও— এগিয়ে যাও! সম্মুখের পথিককে ধৃত কর। পশ্চাতে কে পড়িল,

কে ডাকিল বা কে রহিল তাকাইও না। উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয়—যাত্রা যদি স্বজাতি কল্যাণদ্যোতক হয়, পথ যদি সত্যালোক উদ্ভাসিত হয় তাহা হইলে শ্রীভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ তোমাদিগকে নিরাপদে সফলতা ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির মণিময় কিরীট সুশোভিত স্বর্ণমন্দিরে উপনীত করিবেই করিবে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পরিণাম ও প্রতিকার।

বর্ত্তমান হিংসা বিদ্বেষমূলক অশাস্ত্রীয় বৈদেশিক জাতিভেদের ফলে ভারতের হিন্দুসমাজের ভবিষ্যৎ পরিণাম যে অতিশয় শোচনীয়, ইহা দেশের সমুদয় মনস্বী ব্যক্তিগণ বুঝিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। শিল্প বাণিজ্য ব্যবসায় কৃষি প্রভৃতি শারীরিক পরিশ্রমজনক কার্য্যসমূহ ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখার ফলে দেশ হইতে দিন দিন হিন্দু শিল্পকারগণের লোপ সাধন হইতেছে। এখন সর্ব্বসাধারণের মনে অভিজাতবর্গের দেখাদেখি একটা দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে ঐ কার্য্যগুলি বাস্তবিকই হীন কার্য্য, উহা করিলে সমাজে ছোট হইয়া থাকিতে হয়। শাস্ত্রকারগণ দিবারাত্র শাস্ত্রের বচন আওড়াইয়া আমাদিগের এই ধারণা শিথিল না করিয়া বরং আরও বাড়াইয়া দিয়াছেন। শিল্প বাণিজ্যের প্রতি কেন এই অস্বাভাবিক ঘৃণা, এই প্রশ্নের সমাধান করিতে যাইয়া দেখিলাম মনু প্রভৃতি সংহিতাযুগের শাস্ত্রবাক্যই ইহার মূলীভূত কারণ। সংহিতাদি শাস্ত্রকারগণের কঠোর আদেশই কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতির বিলোপের অন্যতম কারণ। সংহিতাযুগে রাজা, শাস্ত্রকার ব্রাহ্মণগণের হস্তের ক্রীড়নক স্বরূপ ছিলেন; ব্যবহারিক আইনপ্রণেতা ব্রাহ্মণগণ আইন লিখিতেন এবং উহা রাজাজ্ঞায় প্রতিপালিত হইত। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিদ্যা-জ্ঞান-চর্চ্চাদি ব্রাহ্মণগণই করিতেন, পরে উহা বংশানুক্রমিক হওয়ায় ব্রাহ্মণপুত্রগণই বিদ্যাচর্চ্চা করিতেন, বৈশ্য শূদ্রগণ উহা হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়াছিল। কাজেই ক্ষত্রিয় রাজগণের শাসনদণ্ডের অমিত প্রতাপে সংহিতাদি শাস্ত্র-বাক্যের

প্রভাব অত্যল্পকাল মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চাবিহীন বৈশ্য-শূদ্রসন্তানগণের হৃদয়ে সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিল। দেশের সর্ব্বনাশকর ঐ সব অযৌক্তিক শাস্ত্র-বাক্যের প্রতিবাদ করিতে পারে কার সাধ্য! ব্রাহ্মণগণ আপন আপন স্বার্থ ও খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া যা তা লিখিলেন এবং উহাই শাস্ত্রের নামে, সংহিতাদির নামে ভগবৎ আদেশরূপে সমাজে অনায়াসে প্রচলিত আইন বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইল। সংহিতাদিযুগকে বৈশ্য ও শূদ্র নিগ্রহের যুগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই যুগে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়গণ বৈশ্য ও শূদ্রগণের সর্ব্বপ্রকার সামাজিক আধ্যাত্মিক অধিকার কাড়িয়া লইতে উদ্যত ও প্রাণপণ সচেষ্ট। শ্লোকের পর শ্লোক, শাস্ত্রের পর শাস্ত্র, গ্রন্থের পর গ্রন্থ লিখিয়া বৈশ্য শূদ্রগণকে নড়নচড়ন রহিত ও নিয়মের সুদৃঢ় জালে মাকড়সার মত আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। রক্তের সম্বন্ধ, ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ, দেশের কল্যাণ, সমাজের মঙ্গল এইখানেই নৃশংসভাবে আভিজাত্য-গর্ব্ব ও আত্মম্ভরিতার সুতীক্ষ্ণ খড়্গে বলি প্রদত্ত হইল। ইহার পরিচয় নবম অধ্যায়ে কথঞ্চিৎ প্রদত্ত হইয়াছে, এস্থলেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। কৃষি-কার্য্যের উপর সমগ্র মানবজাতির জীবন নির্ভর করে। কৃষিই আর্য্যদিগের আদিম যুগে একমাত্র উপজীবিকা ছিল। যে কার্য্যের উপর মনুষ্যজাতির জীবনধারণ নির্ভর করে, শাস্ত্রকার তাহাকে অতি হীন চিত্রে চিত্রিত করিলেন। শাস্ত্রকার লিখিলেন :—"মৎস্য ব্যবসায়ীর সমগ্র বৎসরের মৎস্য নিধনরূপ পাপ লাঙ্গলীর (লাঙ্গলবাহক কৃষকের) এক দিনের পাপের সমান।" কৃষিকার্য্য করিতে হইলে হল দ্বারা মৃত্তিকা মধ্যস্থ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী বধ হয়, একারণ নিয়ম করিলেন, কৃষিকার্য্য অতি হেয়—মৎস্য ধরা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ও পাপজনক কার্য্য। এইখানেই কৃষিকার্য্যের মুণ্ডপাত করা হইল! চাষা শব্দ তিরস্কারের মধ্যে গণ্য হইল!

শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধেও মনুর সুকঠোর আদেশ :—

মনু বলেন :—

শিল্পেন ব্যবহারেন * * *

* * * কৃষ্যা রাজোপ সেবয়া ॥৬৪

* * * * *

কুলান্যাশু বিনশ্যন্তি যানি হীনানি মন্ত্রতঃ ॥৬৫ ; তৃতীয় অধ্যায়।

"বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি শিল্প কার্য্য * * * কৃষি, রাজসেবা * * * বেদহীন হওয়া এই সকল কারণে কুল শীল অপকৃষ্ট হইয়া যায়।"

মনু এইরূপে ক্রমশঃ ইক্ষু প্রভৃতি রসবিক্রেতা (১), বাস্ত বিদ্যাজীবী, স্বয়ংকৃত কৃষিজীবী (২), বণিক বৃত্তিজীবী (৩), লৌহবিক্রয়ী (৪) প্রভৃতিকে অত্যন্ত হীন চিত্রে চিত্রিত করিয়া ঐ সমস্ত ব্যবসা ও ব্যবসায়ীকে সর্ব্বজন সমক্ষে ঘৃণিত করিয়াছেন।

যে কৃষি শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিতে দেশ, দেশ বলিয়া পরিচিত, যাহা জাতীয় জীবন গঠনের সর্ব্বপ্রধান উপকরণ এবং যাহা সামাজিক উন্নতির মুখ্য উপায়স্বরূপ, অপরিণামদর্শী শাস্ত্রকারগণ দুই চারিটী শ্লোক রচনা করিয়া চিরকালের জন্য তাহার মূলে ভীষণ কুঠারাঘাত করিয়াছেন। এই স্থানেই হিন্দুসমাজের মৃত্যুবীজ উপ্ত হইয়াছে, এই কারণেই প্রাচীন ভারতের গগনস্পর্শী উন্নত শির আজ ধূল্যবলুণ্ঠিত!

যে আয়ুর্ব্বেদ বেদের উপাঙ্গ স্বরূপ, জগতে বরেণ্য ও আদর্শ সেই আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যার চর্চ্চাকারী চিকিৎসককে মনু মাংসবিক্রেতা ও সুরাবিক্রেতাদিগের সমশ্রেণীভুক্ত করিয়া চিকিৎসাবিদ্যার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন।

---

(১) ১৫৯ শ্লোক, তৃতীয় অধ্যায়, বিষ্ণুসংহিতা।
(২) ১৬৫ ঐ ঐ ঐ
(৩) ১৮১ ঐ ঐ ঐ
(৪) ২২০ ঐ চতুর্থ অধ্যায়, ঐ

মনু বলেন :—সোম বিক্রয়িণে বিষ্ঠা ভিষজে পূয শোণিতম্।

১৮০।৩য় অধ্যায়, মনু।

"সোমলতা বিক্রেতাকে যাহা দান করা যায়, তাহা বিষ্ঠাবৎ; চিকিৎসক ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণকে যাহা দেওয়া যায়, তাহা পূঁয ও শোণিতবৎ ত্যাজ্য।"

চিকিৎসকস্য মৃগয়োঃ ক্রূর স্যোচ্ছিষ্ট ভোজিনঃ। ২১২, চতুর্থ অধ্যায়।

—মনুসংহিতা।

"চিকিৎসকের, মৃগাদি পশুহন্তা ব্যাধের, ক্রূর ব্যক্তির * * * অন্নভোজন করিবে না।"

মনু, শব স্পর্শ করা অত্যন্ত অপরাধজনক ও দোষাবহ বলিয়া বহুস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহা দ্বারাই শব ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ও অস্ত্রপ্রয়োগ বিদ্যা আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান হইতে তিরোহিত হইল।

ইহার উপর যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, বিদেশ ও সমুদ্রযাত্রা-নিষেধ-বিধি রচনা করিয়া তাহারও সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন। সমুদ্রযাত্রার উপর বাণিজ্য ব্যাপার, দেশের সমৃদ্ধি, সমাজের বল, বৈদেশিক সংশ্রবজনিত অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এই বাণিজ্য বিষয়ে পশ্চাৎপদ থাকার দরুণই ভারত ভূমি দিন দিন সম্পদহীন অর্থহীন হইয়া পড়িতেছে। বাণিজ্যের সহিত দেশের শক্তিস্বরূপ অর্থ, অর্থের উপর সমাজ, সমাজের সহিত দেশের ও জাতির ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। সুতরাং সমাজ ও দেশের কল্যাণ করিতে হইলেই সমুদ্রে গমনাগমনপূর্ব্বক বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। প্রাচীন আর্য্যগণের উন্নতির সময় সমুদ্রযাত্রা অবাধে প্রচলিত ছিল। ফলতঃ এই সমস্ত বিধি নিষেধ আমাদের প্রাচীন বরেণ্য আর্য্যজাতির উদ্ভাবিত নহে—"উহা পরবর্ত্তী একদল অযোগ্য স্বার্থপর ব্যক্তির মস্তিষ্ক কল্পিত মাত্র।" ভারতের উন্নতির সুখসূর্য্য যখন অস্তগমনোন্মুখ, তখন হিংসা বিদ্বেষ আত্ম-কলহ প্রতারণা শঠতা চতুরতায় ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজ জর্জ্জরিত। কে

কাহাকে কিরূপে দমন করিবে, নিগ্রহ করিবে, অপদস্থ করিবে এই চিন্তায় সতত উদ্‌গ্রীব। কুরুক্ষেত্রের কালসমরে ভারতের ক্ষত্রিয়কুল পূর্ব্বেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া ভারতীয় হিন্দুসমাজকে মেরুদণ্ডহীন করিয়া তুলিয়াছিল এবং তৎপরে বৈশ্য শক্তি যাহা অবশিষ্ট ছিল ব্রাহ্মণ কবিগণ লেখনী ধারণ করিয়া শাস্ত্রের নামে তাহাও ধ্বংসের করালগ্রাসে নিক্ষেপ করিলেন।

শাস্ত্র বলিতেছে :—কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবতম্। গীতা

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিকপথং কুশীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥

গো-পালন কৃষি শিল্প বাণিজ্য কুশীদ প্রভৃতি ব্যবসায়িগণ সকলেই এক বিরাট বৈশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত বৈশ্যজাতীয়। সৎগোপ, মাহিষ্য, সচ্চাষী, কর্ম্মকার, সুবর্ণবণিক, সাহা, তাম্বুল বণিক, শঙ্খ বণিক, গন্ধ বণিক, মোদক, তিলি, কুম্ভকার, বারুজীবী, সূত্রধর, কপালী প্রভৃতি জাতিগণ সকলেই শাস্ত্র অনুসারে বৈশ্য, কিন্তু এই বিরাট শক্তিশালী বৈশ্য জাতিকে সঙ্করবর্ণান্তর্গত পৃথক পৃথক জাতিতে বিভক্ত করিয়া ঋষি নামধেয় ব্রাহ্মণ লেখকগণ গৃহে গৃহে ধ্বংসের করাল বহ্নি জ্বালাইয়া দিলেন; অপ্রেম স্বার্থপরতা স্বজাতি-বিদ্বেষ আত্ম প্রতারণার লক্ লক্ শিখা মুখব্যাদন করিয়া উঠিল। এই জাতিবিদ্বেষের ও জাতি বিভাগের বিষময় ফলস্বরূপ বিভিন্ন ব্যবসায়ী একই বিরাট বৈশ্য জাতি সঙ্করবর্ণান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন জাতি উপজাতি সম্প্রদায় উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িল। শাস্ত্রকারের অভিসন্ধি সিদ্ধ হইল। বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানালোকে যদিও এখন এই সমস্ত সম্প্রদায় আপন আপন বংশ পরিচয় পূর্ব্বেতিহাস কতকটা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে, তথাপি তাহাদের মধ্য হইতে পরস্পর বিদ্বেষভাব, উচ্চ নীচ, বড় ছোট ভাব আজিও তিরোহিত হইতেছে না। আর্য্যজাতি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত, এতদ্ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই। যদি

ইহারা সকলেই বৈশ্য সন্তান হয়, তবে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি ভ্রাতৃভাব পোষণ করিবে না কেন? ভ্রাতৃভাব পোষণ করা ত দূরের কথা, এক ভাই অন্য ভাইয়ের স্পৃষ্টজল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে অসম্মত! ইহাতে দেশের কি আশা করা যাইতে পারে? একেই ত শাস্ত্রবাক্য, তার উপর আবার বল্লালী কৌলীন্য! কুজন্মের উপর পৃষ্ঠব্রণ! সমাজ দেবতা আর কত সহ্য করিবেন! যে বল্লাল নিজে লম্পট, চরিত্রহীন, ব্যভিচারী, তিনিই হইলেন সমাজের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষ। মণিদত্ত নামক জনৈক সুবর্ণবণিক সন্তানের সুবর্ণ ধেনুর প্রতারণা ও চৌর্য্যাপরাধে বল্লালসেন সমগ্র স্বর্ণকার ও সুবর্ণবণিকদিগকে পাতিত করিয়া কহিলেন "অদ্যাবধি এই সুবর্ণবণিকেরা বিষ্ঠার কৃমি অপেক্ষাও অপকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইবে।" তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া নির্ব্বাসিত করিলেন। জরাজীর্ণ হিন্দুসমাজ পাপাত্মা বল্লালের এই সম্পূর্ণ অন্যায় আদেশ মস্তক অবনত করিয়া গ্রহণ করিল।

এইরূপে সম্প্রদায়গত, জাতিগত, ব্যবসায়গত হিংসা দ্বিষে পরিবর্দ্ধিত আকার ধারণ করিয়া হিন্দুসমাজ ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইতেছে। বাঙ্গলার হিন্দুসমাজ প্রায় ৫০০ শত জাতি উপজাতি সম্প্রদায় উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। একই ব্রাহ্মণ পিতার সন্তান কত শত ভাগে, একই একই ক্ষত্রিয় পিতার সন্তান কত শত ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যাহারা এক পিতামাতার শুক্রশোণিতে উৎপন্ন হইয়া একই পিতৃমাতৃ ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াছে, একই ক্রীড়াভূমিতে খেলা করিয়া বেড়াইয়াছে আজ তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন। এক ভাই অন্য ভাইয়ের প্রদত্ত জল পান করিতে কুণ্ঠিত—আহারে অসম্মত! একই স্নেহময়ী মাতার স্তন্যদুগ্ধে জীবনধারণ করিয়া একই মায়ের কোলে নাচিয়া খেলিয়া তিলি সৎগোপ তন্তুবায় কর্ম্মকার প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ সাহা সুবর্ণবণিক প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের জলটুকু গ্রহণেও কুণ্ঠিত,

অসম্মত! সুতরাং কেমন করিয়া সমাজ-শরীর পুষ্টতা লাভ করিবে, বলশালী হইবে, পৃথিবীর জীবিত জাতিগণের সহিত প্রতিযোগীতায় সাহসী হইবে?

যেখানে ভ্রাতৃস্নেহ, প্রেম, প্রীতি, প্রণয়, সহানুভূতি, একতার একান্ত অভাব সেখানে কিরূপে উন্নতি সম্ভব? এই স্নেহহীনতা, এই সামাজিক অবিচার অত্যাচার নির্য্যাতন, এই ঘৃণা অবমাননার পরিণাম একটিবার চিন্তা করিয়া দেখ। বিগত প্রায় সহস্র বৎসরে ৪০ কোটি হিন্দুসন্তান লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। বিগত ২৫।৩০ বৎসরেই প্রায় ৪ কোটি হিন্দুর লোপ সংঘটন হইয়াছে। বিগত ২৫।৩০ বৎসরে বহু লক্ষ হিন্দুসন্তান সামাজিক অত্যাচারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের আশায় খৃষ্টধর্ম্মের শীতল ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছে। ঘৃণা অবমাননার ফলস্বরূপ এই কয়েক শত বৎসরে কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হিন্দুসন্তান ঐরূপ ভাবে মুসলমান ধর্ম্ম আলিঙ্গন করিয়াছে ও দিন দিন করিতেছে। কিন্তু হায়! সমাজপতিগণের এদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই! যাহারা এসব কথা বলে তাহারা তাঁহাদের চক্ষে ভ্রান্ত অবিবেকী ধর্ম্মভ্রষ্ট কদাচারী সমাজ-দানব। যেরূপ অনুপাতে হিন্দুর লোকসংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে তাহাতে অনুমান হয়, আর কয়েক শতাব্দীর পর একটি হিন্দুও হিন্দুর নাম রক্ষার জন্য জীবিত থাকিবে না। হিন্দুধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম করিয়া দেশবাসী পাগল, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম যে কি পদার্থ তাহা অনেকেই জানেন না ও জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারেন না। স্ত্রী-আচার, দেশাচার, লোকাচার নামক কতকগুলি পদার্থ ধর্ম্মের পবিত্র স্বর্ণ সিংহাসনে বসিয়া সমাজ শাসনে ব্যাপৃত আছে। লোকে কতকগুলি সামাজিক আচার ব্যবহার যথারীতি পালন করিয়াই ধার্ম্মিক আখ্যায় আখ্যাত হইতেছে। ওদিকে দেশ সমাজ দিন দিন ধ্বংসের মুখে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

ষ্টিমারের অখাদ্য আহারে সমাজপতি বাবুগণের জাতি যায় না, বিদ্যা-

শিক্ষার্থ সমুদ্রযাত্রা করিলে জাতি যায়; বিধবার ব্যভিচারে জাতি যায় না, কিন্তু বিধবার বিবাহে জাতি যায়, কুলে কলঙ্ক হয়; সুরাপানে জাতি যায় না, পতিত হইতে হয় না, সুরা বিক্রয়ে জাতি যায়, পতিত হইতে হয়; গরু বাছুর কুকুর বিড়াল সাপ প্রভৃতির চর্ব্বি-মিশ্রিত ঘৃত সেবনে জাতি যায় না, কলের জল, সোডা, লেমনেড্, বরফ মুসলমান ও সাহেব বাড়ীর পাঁউরুটী, বিস্কুট, জমাট দুগ্ধ সেবনে জাতি যায় না, সাহা সুবর্ণবণিক সূত্রধর নমঃশূদ্র প্রভৃতি আচারনিষ্ঠ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী দেব দ্বিজে ভক্তিমান অতিথিপরায়ণ স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের প্রদত্ত জলপানে জলস্পর্শে জাতি যায়; অনাচরণীয় হিন্দু ভ্রাতার জল অপব্যবহার্য্য কিন্তু জলমিশ্রিত, অশুদ্ধ ভাণ্ডে আনীত বাজারের মুসলমানের দুগ্ধ ব্যবহার্য্য; ভাতেরই অন্যতম সংস্করণ সিদ্ধ তণ্ডুল অবাধে প্রচলিত। এই সব সামাজিক অবিচার বিষের ন্যায় সমাজ শরীর জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে। ভগবানের রাজ্যে অত্যাচার অবিচার কতদিন সহ্য হয়! হে বঙ্গের ভবিষ্যৎ আশাস্থল যুবকগণ! তোমরা কোথায়? এই অবিচার ও সামাজিক নির্য্যাতনের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তোমাদিগকে ভগবানের নামে আহ্বান করিতেছি। সহস্র সহস্র বৎসরের সামাজিক পেষণের ফলে যাহারা প্রায় পশু পদবীতে উপনীত হইয়াছে, যাহারা ভারতীয় হিন্দুসমাজের অজ্ঞাত মেরুদণ্ড, তাহাদিগকে তুলিবার জন্য—মূর্খতা ও কুসংস্কারের মহাপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তোমাদের বলিষ্ঠ বাহু কি অগ্রসর হইবে না? তোমাদেরই বুকের রক্ত, প্রাণের প্রাণ, দেহের জীবন স্বদেশবাসী ভাই হইয়া তাহারা কি চিরকাল এইরূপ হীন অপদার্থ অবজ্ঞাত ভাবে জীবন অতিবাহিত করিবে? বিশ্বের সংবাদ, জগতের মঙ্গল বার্ত্তা, বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান ও সভ্যতা, আশা ও ভরসা কি তাহাদের দ্বার-দেশে কখন পঁহুছিবে না? তাহাদের হৃদয়দ্বার কি চিরকালই রুদ্ধ থাকিবে? উহার কি কখন উন্মোচন হইবে না? এস, কে আছ হৃদয়বান! কে আছ

প্রেমিক! উহাদিগকে উঠাও, তোল, মানুষ কর! প্রেমামৃত ধারায় সহস্র সহস্র বৎসরের জাতিগত বিদ্বেষ-বহ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া দাও। ইহাদিগের মধ্যে জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক-বর্ত্তিকা লইয়া উপস্থিত হও। দরিদ্রের পর্ণ-কুটীরে, পাঠশালার বাণীমণ্ডপে, রাখালের গোচারণ মাঠে, পল্লীবাসীর গৃহে গৃহে যাত্রা কর। তাহাদের সহস্র বর্ষের অন্ধকার গৃহ বিদ্যার বিমল আলোকে আলোকিত হইয়া উঠুক। ঐ দেখ তোমার একই মাতৃ অঙ্কের ভ্রাতৃবৃন্দ রোগক্লিষ্ট, অবসন্ন দেহ, উৎসাহহীন, উদ্যমহীন, স্ফূর্ত্তিহীন, আনন্দবিহীন—একটীবার তাহাদের দিকে সপ্রেম নয়নে করুণার দৃষ্টিতে অবলোকন কর, একটীবার তাহাদিগকে বাহুপাশে টানিয়া লও। সমাজের সর্ব্বস্ব কোটি কোটি অনুন্নত ভ্রাতৃগণের উন্নতির জন্য তোমরা কি সহায়তা করিবে না, যত্নবান হইবে না? তাহাদিগকে কি ন্যায্য সামাজিক অধিকার প্রদান করিবে না? সমাজ-পতিগণের নিকট অল্পই আশা রাখিও। আর কতকাল তাঁহাদের কৃপার আশার মুখপানে তাকাইয়া থাকিবে? সহস্র সহস্র বৎসরের সামাজিক কুসংস্কারের মধ্যে উঁহাদের জন্ম। দেশের কথা, সমাজের কল্যাণ চিন্তা করিবার তাঁহাদের মোটেই অবসর নাই। তোমরাই সর্ব্বস্ব, তোমরাই আশা, তোমরাই ভরসা। ভিন্নধর্ম্মী মুসলমান ও খৃষ্টানগণ, ধোপা, নরসুন্দর বেহারা পাইবে, আর তোমার স্বধর্ম্মী, তোমার ভগবতী মার আদরের সন্তান, তোমার দয়াল হরির স্নেহের ভক্ত, তোমার অনুন্নত ভাই পাইবে না? একি ঘোর অবিচার নহে? কোন হিন্দু সন্তান হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম বা খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করিলে সে ধোপা, নরসুন্দর ও বাহক পাইবে, কিন্তু স্বধর্ম্মে থাকিলে পাইবে না এ কেমন কথা? তবে কি হিন্দুধর্ম্মই এই নীচতার কারণ বুঝিতে হইবে? আবার বলি, করযোড়ে গললগ্নীকৃতবাসে করুণ কণ্ঠে বলি, হে বঙ্গের ভবিষ্যৎ সমাজপতি সহৃদয় যুবকগণ, কালবিলম্ব করিও না। ঐ যে শ্রীভগবান্ মঙ্গল মধুর স্নেহবিজড়িত কণ্ঠে তাঁহার প্রাণপ্রিয় দীন দরিদ্র

অভাজন অনুন্নত সন্তানগণের উন্নয়নের জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন —এস, এই মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন কর—তাহাদিগকে হাত ধরিয়া তোল—উঠাও। তুমি আমি দুই চারিজন ভদ্রলোক লইয়া সমাজ নহে, সর্ব্বসাধারণকে লইয়া সমাজ, ব্যষ্টির উন্নতিতে উন্নতি নহে—সমষ্টির উন্নতিতেই উন্নতি,—সমাজের মঙ্গল। সহস্রভাগে বিচ্ছিন্ন হিন্দুসমাজকে উন্নত করিতে হইলে উহার প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন অংশকে উন্নত করিয়া লইতে হইবে। শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সতেজ ও পুষ্ট না হইলে দেহ যেমন সতেজ ও পুষ্ট হয় না, তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের উন্নতি না হইলে হিন্দু সমাজের উন্নতি অসম্ভব। কেহ কাহাকে ত্যাগ করিয়া কিম্বা বাদ দিয়া উঠিবার উপায় নাই। একের উন্নতি অন্যের উন্নতিসাপেক্ষ। শিক্ষায় দীক্ষায়, চরিত্রে ধর্ম্মে তাহাদিগকে আপনাদের নিজেদের মত উন্নত করিতে হইবে। দেশের সেবায় তাহাদিগকে পার্শ্বে রাখিতে হইবে, সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যে তাহাদিগকে আহ্বান করিতে হইবে, না আসিলে নিজে যাইয়া বাড়ী হইতে ডাকিয়া আনিতে হইবে। স্মরণ রাখিও, অবজ্ঞাত জনসাধারণই প্রকৃতপক্ষে দেশের শক্তি, সমাজের বল, জাতির মেরুদণ্ড, উন্নতির নিদান, মাতৃপূজা যজ্ঞের পবিত্র হবিঃ। উহাদিগকে চাই-ই। শতকরা ৫৮ জন অস্পৃশ্য, সমাজ-দেহের অর্দ্ধ অঙ্গ অচল, অবশ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত। যতদিন না বঙ্গের অভিজাত সন্তান আপন হৃদয় প্রেমানলে দ্রবীভূত করিয়া সমাজের প্রত্যেক নরনারী বালক বালিকা, যুবা বৃদ্ধ, জাতি বর্ণ সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে আচণ্ডালের জন্য ঢালিয়া না দিবে, ততদিন সমাজের কল্যাণ নাই। যে দিন সকলে ভ্রাতৃভাবে পরস্পর পরস্পরের হস্ত ধারণ করিবে, ব্রাহ্মণ সন্তান জাত্যভিমান বিসর্জ্জন দিয়া চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া যাইবেন, যে দিন সমাজস্থ এক জনের দুঃখ কষ্ট সকলের প্রাণে ঝঙ্কার দিয়া উঠিবে, একজনের অপমানে —এক জনের নিগ্রহে সকলে সমভাবে অপমানিত ও নিগৃহীত মনে

করিবে—সেই দিন দেশের উন্নতি, সমাজের উন্নতি। যাহারা সমাজের মঙ্গলার্থ আপন আপন সুখ-সুবিধা, স্বার্থ-কল্যাণ, ভোগস্পৃহা বলিদান করিয়া তোমাদের সেবায় নিমগ্ন আছে; যাহাদিগের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের উপর ধনবানের ঐশ্বর্য্য, মানীর সম্মান,—অভিজাতবর্গের ভোগের অন্ন, বিলাসের সামগ্রী, উন্নত স্বর্ণখচিত মেঘস্পর্শী মর্ম্মর প্রাসাদ, পরিধেয় বসন ভূষণ, খাদ্যসম্ভার নির্ভর করে, যাহাদিগের বিন্দু বিন্দু হৃদয়-রুধিরে বড় লোকের বিশাল অট্টালিকার এক একখানি ইট পাথর গাঁথা—তাহাদিগের সংবাদ কয়জন রাখেন? কয়জন তাহাদের চিন্তায় বিরলে নয়নজল বর্ষণ করেন? বঙ্গীয় যুবক! তোমরাও কি নিষ্ঠুর পাষাণ থাকিবে—স্নেহ মমতা বিসর্জ্জন দিবে—আপন স্বার্থচিন্তায় বিব্রত থাকবে? এস, ইহারা উঠিবার জন্য ঐ যে হাত বাড়াইয়া দিয়াছে—ঐ যে করুণনেত্রে দয়া ভিক্ষা করিতেছে; উহাদের হাত ধরিয়া তোল, উঠাও, উহাদের কাতর-ক্রন্দনে মনোনিবেশ কর, উহাদের অশ্রুজলে আপন নয়নজল মিশাও—অধিকার দাও—আভিজাত্যভিমান বিসর্জ্জন দিয়া সামাজিক দারুণ বন্ধন খুলিয়া দাও—উহারাও তোমাদের মত মানুষ হউক—উন্নত হউক—ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুসমাজে নবজীবন সঞ্চার করুক—প্রতি পল্লীগৃহে মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠুক—আনন্দ কোলাহলে প্রতি গৃহ মুখরিত হইয়া উঠুক।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

জলচল ও অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন।

অস্পৃশ্যতা ভারতের এক মহাপাপ। যে সমুদয় গুরুতর পাপে ভারতের অধঃপতন হইয়াছে, অস্পৃশ্যতা তন্মধ্যে অন্যতম। অস্পৃশ্যতা ৬০ কোটি হিন্দু অধ্যুসিত হিন্দুস্থানকে ভিন্ন ধর্ম্মীর পদানত করিয়াছে, হিন্দুর গৌরব-ভাস্করকে অবমাননা ও লাঞ্ছনার ঘন কৃষ্ণ মেঘে আবৃত করিয়াছে, বেদ বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবাদ অতলতলে ডুবাইয়া দিয়াছে। অস্পৃশ্যতা আমাদিগকে স্বর্গের নন্দন কানন হইতে নরকের ন্যক্কারজনক স্থানে নিমগ্ন ও অবনমিত করিয়াছে। আমাদের শিক্ষা দীক্ষা, আমাদের আন্দোলন আলোচনা, আমাদের শাস্ত্রপুরাণ এই অস্পৃশ্যতার পাপ শক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছে। বাক্যে আমরা মহা সাম্যবাদী, কার্য্যে আমরা মহা ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন। ধর্ম্ম ও পুণ্য হানিকর নিকৃষ্ট কর্ম্ম হইতে এই অস্পৃশ্যতার জন্ম। কিন্তু ইহা এখন দেশকাল পাত্রকে অতিক্রম করিয়া, ন্যায় সত্য অগ্রাহ্য করিয়া অবিচলিত ভাবে যথেচ্ছাচার চালাইয়াছে। ইহাকে বাধা দিবার সামর্থ যেন কাহারও নাই। কোনও মহাপুরুষ এক সময় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"জ্ঞানমার্গ, যোগমার্গ, ভক্তিমার্গ সব পলায়ন, এখন আছে কেবল ছুৎমার্গ, আমায় ছুঁওনা আমায় ছুঁওনা, দুনিয়া মহা অপবিত্র কেবল আমিই পবিত্র। ব্রহ্ম এখন ব্রহ্মলোকেও নাই, গোলোকেও নাই, ব্রহ্ম এখন যাগ যজ্ঞে ব্রতঃ

তপস্যায় নাই, ব্রহ্ম এখন মুনিকাননে—তীর্থক্ষেত্রে, বেদ বেদান্তে নাই—ব্রহ্ম এখন রান্নাঘরে, ব্রহ্ম এখন ভাতের হাঁড়িতে।”

আমরা ভারতের সমাজপতিগণ ৭ কোটি নর-নারীকে, ভাই-ভগিনীকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছি। বাঙ্গলায় শতকরা ৫৮ জনই অস্পৃশ্য,—অবশিষ্ট ৪২ জন আমরা তাহাদিগকে পশু পক্ষীরও অধম করিয়া রাখিয়াছি। আমরা তাহাদিগকে ছুঁইনা—দূর দূর করিয়া ঘৃণায় তাড়াইয়া দেই। মানুষ হইয়া মানুষকে—হিন্দু হইয়া হিন্দুকে, ভাই হইয়া ভাইকে আমরা দিনরাত্রি দুই পা দিয়া দলন করিতেছি, পশুর অধম ঘৃণা করিতেছি। হিন্দুসমাজে পশু পক্ষীরও যে অধিকার আছে, পশু পক্ষীরাও যে আদর যত্ন সোহাগ ভালবাসা পায়, আমাদের অস্পৃশ্য-অনাচরণীয় ভ্রাতারা সেটুকুও পায় না। ঘৃণায় ঘৃণায় আমরা তাহাদের মনুষ্যত্ব হরণ করিয়া লইয়াছি। যুগ যুগান্তর হইতে ঘৃণা অবজ্ঞা, অপমান লাঞ্ছনা, অবিচার অত্যাচার ভোগ করিয়া করিয়া মনুষ্যত্বহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ‘তোরা ছোটলোক, তোরা অপবিত্র, তোরা অস্পৃশ্য, তোরা নীচ জাত, তোরা ইতর, অধম’ এই কথা হাজার হাজার বৎসর হইতে শুনিয়া শুনিয়া তাহাদের হৃদয়স্থিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সত্যই সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে, তাহারা যে মানুষ, সমদর্শী ভগবানের স্নেহের সন্তান, শ্রেষ্ঠপিতা পরমেশ্বরের সর্ব্বগুণান্বিত আদরের পুত্র কন্যা, এ কথা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। তাহারাও যে সচ্চিদানন্দ সাগর শ্রীভগবানের এক একটী তরঙ্গস্বরূপ, চিৎসূর্য্যের এক একটী কিরণতুল্য, তাহারাও যে অদ্বৈতবাদের এক একটী মূর্ত্ত ব্রহ্ম, এ কথা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। তাহারা জানে উচ্চ জাতিদের সেবা পরিচর্য্যা, কাজকর্ম্ম দাসত্ব গোলামী করিবার জন্যই তাহাদের জন্ম এবং তাহারা শত শত শতাব্দী ধরিয়া তাহাই করিয়া আসিতেছে। তাহাতে তাহাদের অরুচি নাই, ঘৃণা নাই, তাহাতে তাহাদের অপমান নাই—অবমাননা বোধ নাই।

শাস্ত্র বলে আত্মহত্যা মহাপাপ।" লোকে ফাঁসিকাষ্ঠে, বিষ পানে, গলায় ছুরি বসাইয়া আত্মহত্যা করে। আমরা সকলে তাহাকে নিন্দা করি। কিন্তু আমরা বলি—ইহা প্রকৃত আত্মহত্যা নহে, ইহা প্রাণত্যাগ মাত্র। ইহাতে আত্মার হত্যা হয় না। আত্মার হত্যা সেখানে, যেখানে আত্মারূপী ভগবান্—অত্যাচারে অবিচারে, অনাদরে অবহেলায়, ঘৃণায় অবমাননায়—মৃতবৎ—জড়বৎ অবস্থান করিতেছে। নিত্য চিৎস্বরূপ যেখানে শূদ্ররূপে দাসরূপে অধম অস্পৃশ্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে সেখানেই প্রকৃত আত্মহত্যা—আত্মার হত্যা হইতেছে। আর তাহার পরিণাম!! পরিণাম হাতে হাতে, সহস্র বৎসরের পরাধীনতা ও দাসত্ব।

এই মনুষ্যত্ব হরণকারী মহাপাপ মূর্ত্তি অস্পৃশ্যতা দূর না হইলে ভারতে স্বরাজ লাভ সম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে না। ইহার বিষে যে কেবল উচ্চ জাতীয়েরাই জরাজীর্ণ, এই জাত্-সর্পের বিষে যে কেবল অভিজাতবর্গেরই মহানিষ্ট সাধিত হইয়াছে—এমন নহে; ইহার বিষে উচ্চ নীচ (?) ধনী দরিদ্র, উত্তম অধম, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য সকলেই জর্জ্জরিত। এই গুরুতর কারণেই এই পাপ সমান ভাবে রাজ্য পরিচালন করিয়া আসিতেছে। কিছুতেই ইহার ধ্বংস হইতেছে না। তথাকথিত উচ্চ জাতিগণ তথাকথিত নীচ জাতিগণকে ঘৃণা করিতেছে এবং নিম্ন জাতিগণ আবার তথাকথিত তন্নিম্ন জাতিগণকে ঘৃণা করিতেছে। এক অস্পৃশ্য অন্য অস্পৃশ্যকে, এক অধম অন্য অধমকে, এক নিপীড়িত অন্য নিপীড়িতকে, এক দাস অন্য দাসকে ঘৃণা করিতেছে, এক অবমানিত লাঞ্ছিত পদদলিত ভাই অন্য এক লাঞ্ছিত পদদলিত ভাইকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিতেছে এবং এই জন্যই ভারতের উর্ব্বর বক্ষে ইহা এমন করিয়া শিকড় গজাইতে সমর্থ হইয়াছে। এই জন্যই ঘৃণা অবজ্ঞার এমন তাণ্ডবী লীলা অনায়াসে চলিতে পারিতেছে। একটু দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটাকে সহজবোধ্য করা যাউক। ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ আদি তথাকথিত উচ্চ জাতি কামার কুমার

তিলি তাম্বুলী গোপ গন্ধবণিক প্রভৃতি নবশাখ সম্প্রদায়ভুক্ত ভাইগণকে কতকটা অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন—বলা বাহুল্য ইঁহারা সকলেই জলাচরণীয় জাতি। তাঁহারা সে অবজ্ঞার ঝাল সাহা সুবর্ণবণিক সূত্রধর কৈবর্ত্ত ভ্রাতৃগণের উপর ঝাড়িয়া সেই অবজ্ঞার ক্ষোভ দূর করিতে চেষ্টা করেন। আবার সাহা সুবর্ণবণিক প্রভৃতি জাতিগণ উচ্চ (?) দুই শ্রেণীর অবজ্ঞার ঝাল পোদ নমঃশূদ্র মালী ঢুলি প্রভৃতি ছোট ভাইদের উপর ডবল মাত্রায় ঝাড়িয়া স্বীয় অপমানবিক্ষুব্ধ মর্ম্ম-জ্বালা দূর করিতে প্রয়াস পান। এইরূপে নমঃশূদ্র পোদ ভ্রাতারাও পাটনী কোনাই প্রভৃতি ভাইগণকে সমান মূল্যে ঘৃণা করেন এবং তাঁহারা আবার (পাটনী কোনাই প্রভৃতি) চর্ম্মকার ডোম ম্যাথরকে প্রাণ ভরিয়া ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিয়া সর্ব্ব জাতির অবমাননার জ্বালা দূর করিতে চেষ্টা করেন। এই প্রকারে—এ জাতি সে জাতিকে, এ সম্প্রদায় সে সম্প্রদায়কে, এ শ্রেণী সে শ্রেণীকে ঘৃণা করিয়া করিয়া ভারতে ঘৃণা অবজ্ঞার বিরাট রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জাতি বিদ্বেষের এই বিরাট হিমাচল কিছু দুই-দশ দিনে, দুই-দশ জনের, দুই-দশ জাতির দোষে গড়িয়া উঠে নাই। কেবল উচ্চ জাতির দোষে এই পাপ এত বড় হইয়াছে বলিলে সত্যের অবমাননা করা হইবে। এজন্য উচ্চ নীচ বড় ছোট ধনী দরিদ্র ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলেই অল্পাধিক দোষী এবং দায়ী। অনেকে কেবলই ব্রাহ্মণগণের দোষ দিয়া থাকেন, কিন্তু আমি বলি—এ ভারতে ব্রাহ্মণ কয় জন? ২২ কোটি হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ ১ কোটি মাত্র। এই ২১ কোটি নির্য্যাতিত ও ব্রাহ্মণ অত্যাচারে জর্জ্জরিত হিন্দু ভ্রাতৃগণ মুষ্টিমেয় ১ কোটি ব্রাহ্মণকে বাদ দিয়া বয়কট করিয়া অত্যাচার-বর্জ্জিত বিরাট বিশুদ্ধ হিন্দুসমাজ স্থাপন করুন না কেন? ব্রাহ্মণ বাঙ্গলায় কয় জন? শতকরা প্রায় ৬ জন মাত্র; বাকী ৯৪ জন ত ব্রাহ্মণ্য অত্যাচারে জর্জ্জরিত ব্রাহ্মণেতর জাতি। তাঁহারা সকলে মিলিয়া এই সাম্যবিরোধী ব্রাহ্মণ্য শক্তিভ্রষ্ট গোটা কয়েক গর্ব্বিত ব্রাহ্মণকে বাদ

দিয়া এই বাঙ্গালায় একটা সাম্যবাদী হিন্দুসমাজ গড়িয়া তুলুন না কেন? সে শক্তি কাহারও আছে কি? কেহ কেহ আবার ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ এই তিনটী তথাকথিত উচ্চ জাতিকেই হিন্দুসমাজের যত অনিষ্টের মূল বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মত এই যে, এই তিন গর্ব্বিত উচ্চ জাতিই বাঙ্গলার হিন্দুসমাজে সাম্যবাদ প্রচলনের বিষম পরিপন্থীস্বরূপ। যত ঘৃণা অবজ্ঞা তাচ্ছিল্য নাকি এই তিন জাতির নিকট হইতেই আমদানি। তাঁহা-দিগকেও বলি, বাঙ্গালায় ইঁহারা কয়জন? বাঙ্গলার প্রতি ১০০ জন হিন্দুর মধ্যে ইঁহারা ১৩ জন মাত্র। বাকী ৮৭ জন অবজ্ঞাত ও লাঞ্ছিত ভ্রাতারা ইঁহাদিগকে বয়কট্ বা বর্জ্জন করিয়া তাঁহাদের মনঃমত নূতন একটা সাম্যবাদী হিন্দুসমাজ গড়িয়া তুলুন। আমরা জানি ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি তথাকথিত তিন উচ্চ জাতিকে বাদ দিয়া নূতন বিশুদ্ধ সমাজ সঙ্ঘ গঠন করিবার শক্তি কাহারও নাই। দোষ যে অল্প বিস্তর সকলেরই। কিন্তু কেহই আপন আপন সমাজের সমাজপতিগণের দোষ দেখিতে পাইতেছেন না; নিজেদের সঙ্কীর্ণতা, নিজেদের নীচতা হীনতা, নিজেদের দুর্ব্বলতা কেহই দেখিতে পাইতেছেন না। সকলেই উচ্চ জাতিদের দোষ দেখাইয়া দিয়াই খালাস্। অস্পৃশ্যতা দোষ সমাজের সর্ব্বজাতির মধ্যে অঙ্কুর গজাইয়া বসিয়াছে। অস্পৃশ্যদের মধ্যেই অস্পৃশ্যতার ব্যাধি বেশী করিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ভাত খাওয়া দূরে থাকুক—সাহা সুবর্ণবণিক সূত্রধর কাপালী যোগী কৈবর্ত্ত কি কখন নমঃশূদ্র বা পোদের জল পান করেন? নমঃশূদ্রগণ কি ঢুলি পাটনি মুচির জল খান? না তাঁহাদের কুয়া ছুঁইতে দেন অথবা দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে দেন? দর্পণে যেমনটী দেখান যায়, দর্পণ তেমনই দেখাইয়া থাকে। ঘৃণার বিনিময়ে প্রেমের আশা করা কি অন্যায় নয়? উন্নতির অস্পৃশ্য ভ্রাতারা উচ্চ জাতিদের দোষ দেন—তাঁহারা তাহাদিগকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া কিন্তু তাঁহারা নিজেরা যে নিম্নতর অস্পৃশ্য ভাইদিগকে অস্পৃশ্য করিয়া

রাখিয়াছেন—তাহাদের জল তাঁহারা ছোন না—ইহা কি অন্যায় নহে, ইহা কোন্ সাম্যবাদের অন্তর্গত ? সেইজন্য বলি—সকলে একযোগে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করা ব্যতীত এই মহাপাপ-মহীরুহের উচ্ছেদসাধন সম্ভবপর হইবে না। কেবল উচ্চজাতির উদারতা সাম্যবাদ ও ভ্রাতৃত্বের উপর নির্ভর না করিয়া নিজেদের অপেক্ষা ছোট ও নীচ (?) ভাইদের উপর উদারতা—সাম্যবাদ ও ভ্রাতৃত্ব দেখাইতে হইবে। নিজেরা কথায় ও কার্য্যে—মনঃপ্রাণে সাম্যবাদী হইয়া অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিয়া উচ্চ জাতিগণকে সাম্যবাদী হইবার দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে। সহস্রবার বলি অস্পৃশ্যতার জন্য ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতি বহু প্রকারে দায়ী, কিন্তু একথাও না বলিলে মিথ্যা বলা হইবে যে, বর্ত্তমান-অস্পৃশ্যতার জন্য ব্রাহ্মণেতর জাতিগণও অল্প দায়ী ও সামান্য দোষী নহেন।

আব্রহ্ম পেশোয়া, আসিন্ধু হিমালয় সর্ব্বত্র স্বরাজের গগন পবন মুখরিত কারী বিজয় ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে। আসুন আমরা সকলে, সর্ব্ব জাতি সর্ব্ব সম্প্রদায় মিলিয়া মিশিয়া অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনপূর্ব্বক ভারতে এক বিরাট হিন্দুসমাজ—সাম্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করি যার যা কিছু ত্রুটী ও দোষ, গলদ ও অপরাধ আছে সরলভাবে স্বীকার ও পরিহার করিয়া সকলে একত্র মিলিত হই। সকলে সমবেত চেষ্টা করিয়া অস্পৃশ্যতা দোষ দূর করিতে অগ্রসর হই। এ সময়ে যেন আমরা কেহ কাহারও দোষ দিয়া, এক জাতি অন্য জাতির ঘাড়ে সমুদয় অপরাধের বোঝা চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে পরাজিত বিদ্বেষ প্রচারে মনোযোগী না হই। পরাধীনতার এই সহস্র বৎসরে আমরা পরস্পর বহু ঝগড়া বিবাদ, বহু নিন্দা তিরস্কার করিয়াছি। তাহাতে অস্পৃশ্যতা দূর হয় নাই কিম্বা পরাধীনতার লৌহশৃঙ্খল কিছুমাত্র নরম বা শিথিল হয় নাই। এই অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থকে যেমন ভাবে পরিশ্রম করিতে হইবে, কামার কুমার তিলি তাম্বুলি সাহা সুবর্ণবণিক কপালী সুতার পোদ নমঃশূদ্রকেও ঠিক তেমনি ভাবে খাটিতে হইবে। প্রত্যেক জাতি

প্রত্যেক জাতির প্রতি প্রেম-প্রবণ হইতে হইবে। প্রত্যেক জাতি প্রত্যেক জাতিকে সহোদর ভাইএর মত জ্ঞান করিতে হইবে। প্রত্যেক জাতিকেই স্বীয় স্বীয় জাত্যভিমান বিসর্জ্জন দিয়া তন্নিম্ন বা তাঁহাদের অপেক্ষা নীচ (?) জাতীয় ভাইগণকে আপনার ভাইএর ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবে। সকলকেই নিজ নিজ নীচ (?) জাতীয়—কনিষ্ঠ ভাইদের—ছোট ভাইদের জল-চল করিয়া লইতে হইবে। কেবল উচ্চ জাতিদের দোষ দিলে এবং উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাদের গালাগালি দিলে কিম্বা নিন্দা করিলে অস্পৃশ্যতা দোষ দূরীভূত হইবে না। স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেম বোধ জাগাইতে না পারিলে কিছুতেই ভারত বক্ষ হইতে এই মহা পাপ সমূলে উৎপাটিত করিতে পারা যাইবে না। বেদ ও উপনিষদের শিক্ষায়, ভাগবত ও গীতার শিক্ষায়, তন্ত্র ও পুরাণের শিক্ষায় আমাদের বিশেষ কিছু হয় নাই। এমন কি দয়ার অবতার ভগবান্ বুদ্ধের সাম্যবাদ প্রচারে, শঙ্করাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদে, রামানুজ মধ্বাচার্য্য নিম্বার্ক তুকারামের ভক্তিবাদে, প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের পাষাণ গলান প্রেম সঙ্কীর্ত্তনেও এই পাপ বিনষ্ট হয় নাই।

সমধর্ম্মাবলম্বী ভাইদের মধ্যে, ২২ কোটি হিন্দুর নরনারীর মধ্যে প্রথমতঃ এই চেষ্টা সফল ও সার্থক করিয়া তারপর ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ভাইদের মধ্যে জল-চলের প্রচলনের চেষ্টা করিতে হইবে। ক্ষণিক আবেগ ও উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া কিম্বা হঠাৎ ভাব-প্রাণোদিত হইয়া অথবা সাম্যবাদের মিথ্যা ধুয়া ধরিয়া ইহার বিপরীত আচরণ করিলে তাহার ফল হিন্দুসমাজ মধ্যে কখনই ভাল হইবে না। তুমি আমি কোন্ ছার—নগণ্য, আধুনিক যুগের যুগাবতার মহাত্মা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন—দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মনীষিগণও এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং আর্য্য ও শিখ সমাজে এ বিষয়ে জোর করিতে যাইয়া হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক হইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন।

তাঁহাদের চেষ্টা সুফলপ্রসূ হয় নাই। আর যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন—হিন্দু সমাজের সঙ্গে সমুদয় সংস্রব ও সম্বন্ধ তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া ছাড়িতে হইয়াছে। বিরাট হিন্দু সমাজের বিস্তৃত বক্ষে নাস্তিকের স্থান হইয়াছে কিন্তু ইঁহাদের স্থান হয় নাই। ইহাতে হিন্দু সমাজের কতখানি ক্ষতি বা লাভ হইয়াছে—সে বিচার আমরা এখানে করিতে চাই না। আমরা শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, প্রাচীন সনাতন পন্থী হিন্দু সমাজে বলপূর্ব্বক কোন বিধি প্রচলিত হয় নাই। বর্ণাশ্রমবাদী হিন্দু একাকারের নামে শিহরিয়া উঠে। সেই জন্য বলি, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী স্বতন্ত্র সমাজের লোকদের সঙ্গে আচার ব্যবহারে খাওয়া পরায় বিশেষ সাবধানতা সহকারে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে হইবে। খেয়াল বশে কিম্বা জেদের বশবর্ত্তী হইয়া সাম্যের নামে অন্যায় ঘা দিলে অচলায়তন সমাজ তাহা সহ্য করিবে না। সমাজের শতকরা প্রায় ৯৫ জন নিরক্ষর; এবং নিরক্ষরগণ প্রায়ই ধর্ম্মান্ধ হন। এমতাবস্থায় তুমি আমি রাম শ্যাম যদু হরি এবং এইরূপ কয়েকজন সাম্যবাদী সাম্যবাদের নামে অনাচার ও কদাচার করিতে আরম্ভ করিলে সমাজ তাহা অনুমোদন করিবে না—এবং শুধু তাহাই নহে, সহ্যও করিবে না। শিশুর অজ্ঞতা, বালকের চপলতা ও যুবকের উচ্ছৃঙ্খলতা লইয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে পদে পদে সমাজের অনিষ্টই করিবে—কল্যাণ কিছুমাত্র হইবে না। অন্য সমাজের কল্যাণ চিন্তা কিছু দিনের জন্য ত্যাগ করিয়া হিন্দু তুমি, আগে হিন্দু সমাজের ন্যায় অন্যায়—মঙ্গলামঙ্গল—ভাল মন্দের ভাবনা ভাবিতে শেখ। হিন্দুর সন্তান তুমি, হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তার দোষ দূর করিতে মনোযোগী হও। অন্য সমাজের ভাবনা পরে ভাবিও। তাহারা কি তোমাদের সমাজের ভাল মন্দ ভাবিয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিতে বসিয়াছে? নিজের ভাই ভগ্নী মাতা পিতার মুখে ক্ষুধার অন্ন—পিপাসার জল না দিয়া রুশিয়ার দুর্ভিক্ষে অর্থ প্রেরণ করা মহা সাম্যবাদ ও মহা উদারতার পরিচায়ক

হইলেও উহা সুভ্রাতা কিম্বা সুপুত্রের উপযুক্ত কর্ম্ম নহে। অগ্রে নিজ নিজ গৃহ পরিবারের, নিজ নিজ সমাজের জাতির স্বীয় স্বধর্ম্মাবলম্বী ভাই ভগিনীগণের সংস্কার সাধন করিয়া,—নিজের ভাইকে ভাই বলিয়া স্বীকার ও গ্রহণ করিয়া তারপর বিমাতার পুত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ দৃঢ় করিতে হইবে। আমার দেহের সমরক্ত সহোদর ভাইদের ত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে লাথি মারিয়া দূরে সরাইয়া দিয়া, ঘৃণা অবজ্ঞায় অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিয়া, গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়া পাড়াপ্রতিবাসীদের লইয়া ঘর করিতে,—উদার সাম্যবাদী হইতে কে উপদেশ দিবে? সাহা সুবর্ণবণিক কাপালী নমঃশূদ্র পাটনী পোদভাইদের আমরা জল-চল করিয়া না লইয়া—দূর সম্পর্কিত বিদেশাগত ভাইদের একেবারে ভাত-চল করিতে গেলে পণ্ডশ্রম হইবে মাত্র,—লাভ কিছুই হইবে না। কোন ধীর স্থির বুদ্ধিমান ব্যক্তিই ইহা সমর্থন করিবেন না। ইহাতে ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ হইয়া দাঁড়াইবে। আমরা সাম্যবাদী হঠাৎ দেশভক্ত ভাইদের জিজ্ঞাসা করি—তোমরা তোমাদের পাড়া-প্রতিবাসী স্বধর্ম্মাবলম্বী গো বিপ্ররক্ষক—গো বিষ্ণুপূজক সাহা সুবর্ণবণিক কাপালী কৈবর্ত্ত-ভাইদের দূরের কথা—তাহাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণের জল-চল করিয়া লইতে পারিয়াছ কি? তোমার বাড়ীর কাছের গ্রহ বিপ্র দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে কুয়া ছুঁইবার অধিকার দিতে পারিয়াছ কি? সমাজের এই বীভৎস অন্যায়ের বিরুদ্ধে জীবনে কখনও দল বাঁধিয়া তুমুল আন্দোলন উত্থাপিত করিয়াছ কি? সে সাহস—সে শক্তি—সে মনোবল—সে উদারতা—সে স্বধর্ম্ম ও স্বজাতীয়ত্ব বোধ তোমাদের আছে কি? নীরব রহিলে কেন, উত্তর দাও। বুঝিয়াছি তোমাদের কাহারও সে ক্ষমতা নাই। থাকিলে হিন্দু সমাজের তথা হিন্দুস্থান ভারতবর্ষের এ দশা ঘটিত না।

আর এক কথা অস্পৃশ্যতা দূরকরণ অর্থে কেহ যেন—কোন পণ্ডিত যেন একেবারে ভাত-চল হওয়া বুঝিয়া না বসেন। ভাত চল হওয়ার ঢের

দেরী। দু'দশ শতাব্দী অন্তে যদি হয় তাহা হইলেই যথেষ্ট মনে করিবেন। শত শত শতাব্দী অতীত হইয়াছে—তথাপি বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ ও কামার কুমার তিলি তাম্বুলি গোপ নাপিত প্রভৃতি পরস্পর জল-চল বিশিষ্ট জাতিগণের মধ্যে ভাত-চল হয় নাই। অন্য জাতির মধ্যে দূরে থাকুক এক প্রদেশের ব্রাহ্মণের মধ্যে অন্য প্রদেশের ব্রাহ্মণের ভাত-চল নাই। শীঘ্র যে সে সম্ভাবনা আছে—তাহারও কোন লক্ষণ বা সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। সে জন্য বলি—আপাততঃ ভাত-চলের আশা ও আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে স্থান না দিয়া—সেরূপ কোন মহৎ চেষ্টায় মাথা না ঘামাইয়া বঙ্গের বা ভারতের অনাচরণীয় ভাইদের অগ্রে জলাচরণীয় করিয়া লইবার জন্য সকলে দলবদ্ধ ভাবে ভারতের সমুদয় হিন্দুজাতি চেষ্টিত হউন, ইহাই প্রার্থনা !!

অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধি বলিয়াছেন—

"ভারতে হিন্দুয়ানির নামে স্পর্শদোষের দোহাই দিয়া ঘোর পাপাচার চলিতেছে। এই সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান যতদিন না হয়, ততদিন ভারতবাসী কোনরূপ স্বায়ত্তশাসন লাভের উপযুক্ত হইবে না। আমি হিন্দুধর্ম্মের অনুশাসন ও ভারতবাসীর আচার-পদ্ধতি নিবিষ্টভাবে অনুবর্ত্তন করি এবং সনাতন হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মানিয়া চলি। ফলে বিবেকবুদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, প্রকৃত আনুষ্ঠানিক (orthodox) হিন্দু, স্পর্শদোষ না মানিয়াও নিজের ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বজায় রাখিতে পারেন। হিন্দু সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে পরস্পরে বৈবাহিক আদান প্রদান বা একত্রে পান ভোজন, হিন্দুত্বের উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শানুযায়ী নিষিদ্ধ হইলেও, কাহাকে অস্পৃশ্য মনে করা পাপজনক; অথচ এই পাপ হিন্দু সমাজে অবাধে চলিয়াছে। পরলোকগত মনিষী গোখলে বলিতেন যে, হিন্দুরা স্বদেশে জাতভাইদের ঘৃণা করিয়া যে দারুণ পাপ অর্জ্জন করে, তাহার প্রতিফল দক্ষিণ আফ্রিকায় ও অন্যান্য উপনিবেশে সুদে আসলে উশুল

হয়। আমি ভারতের নিগৃহীত ও নিগ্রহকারী—এই উভয় সম্প্রদায়ের লোকদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, তাঁহারা এযাবৎ অনুষ্ঠিত অস্পৃশ্যতা পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এই আত্মশুদ্ধিমূলক মহান্দোলনে—এই আত্মোন্নতির চেষ্টায় অগ্রসর হউন ; নচেৎ পরিত্রাণ নাই।"

(মহাত্মা গান্ধীর জীবনী ১০৮ পৃষ্ঠা)

তিনি আরও বলিয়াছেন—"যাদের পতিত বলিয়া, অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে রাখিয়াছ তাদের কাছে ডাক, ভাই বলিয়া আলিঙ্গন কর, সমগ্র ভেদ দূর কর।"

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় লিখিয়াছেন—"যদি হিন্দু সমাজ অস্পৃশ্য ও জল অনাচরণীয় জাতিগুলিকে পাংক্তেয় করিয়া না লয়, যদি হিন্দুরা তাহাদের সমাজভুক্ত অস্পৃশ্য জাতিগুলিকে বহুকালের অবজ্ঞা ও ঘৃণার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া তুলিয়া না ধরে, তাহা হইলে এক বৎসরেই বল—আর ১০০ বৎসরেই বল, স্বরাজ আমরা লাভ করিতে পারিব না।"

"আমরা যতদিন আমাদেরই দেশের কতকগুলি লোককে এই ভাবে মানব সমাজের বহির্ভূত বলিয়া মনে করিব, তাহাদের অঙ্গস্পর্শে নিজদিগকে অপবিত্র জ্ঞান করিতে থাকিব, ততদিন আমাদের স্বরাজের পথে উন্নতিলাভের আশা নাই। আমাদের এই কপট ব্যবহারের জন্যই আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই দুর্ভোগ ভুগিতেছি।

অস্পৃশ্যতা ধর্ম্মের অঙ্গ নহে, এ শয়তানী। শয়তানী করিয়া শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রের আসন ন্যায় ও সত্যের উপরে নহে। শাস্ত্র কেবল যুক্তিকে পবিত্র ও সত্যকে আরও সপ্রকাশ করিবার জন্যই।

অস্পৃশ্যতা চালাইতে দিয়া হিন্দুধর্ম্ম পাপগ্রস্ত হইয়াছে। ইহা আমাদিগকে অবনত করিয়াছে, আমাদিগকে সাম্রাজ্যের পারিয়া করিয়া দিয়াছে। আশ্চর্য্য মুসলমানগণও আমাদের নিকট হইতে এই সংক্রামক পাপটি পাইয়াছেন।

তাই দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব্ব আফ্রিকা ও কানাডায় হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই পারিয়ার মত ব্যবহৃত হইতেছে।

এই অস্পৃশ্যতা পাপ দূর না হইলে স্বরাজ পাওয়া যাইবে না। যুধিষ্ঠির তাঁহার কুকুরটিকে ছাড়িয়া স্বর্গে যাইতে চাহেন নাই। আজ যুধিষ্ঠিরের বংশধরেরা অস্পৃশ্যদিগকে বাদ দিয়া কিরূপে স্বরাজলাভ করিবার আশা করেন?

আমরা আমাদের ভাইদের চাপিয়া রাখিবার অপরাধে অপরাধী। আমরা তাহাদিগকে বুকে হাঁটাইতেছি, নাকে খৎ দেওয়াইতেছি। আমরা রক্ত চক্ষু দেখাইয়া তাহাদিগকে রেলের কামরা হইতে ঠেলিয়া দিই। বৃটিশ শাসনে ইহার বেশী কি আমাদের করিয়াছে? আমাদিগকে এ পাপ প্রথা পরিত্যাগ করিতে হইবে। এ দোষ দূর করিতে না পারিলে আমরা স্বরাজ পাইয়াও রাখিতে পারিব না। আমরা আমাদের দুর্ব্বল ভাইদের প্রতি অবিচার করিয়াছি, তাহার প্রতিকার না করা পর্য্যন্ত আমরা পশুর মধ্যেই গণ্য থাকিব। স্বরাজ পাইবার পূর্ব্বেই আমাদিগকে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

এই অস্পৃশ্যতা ধর্ম্ম জগতে বিষম অন্তরায়, রাজনীতি-ক্ষেত্রে আত্মহত্যার মত এবং ঐতিহাসিক হিসাবে একটা মিথ্যা বস্তু। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, আর্য্যরক্ত অন্ত্যজদের মিশিতে দেওয়া ঠিক নহে; কিন্তু সে পবিত্র আর্য্য আজ কোথায়?

এই মিথ্যা অস্পৃশ্যতা আবার শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বজায় রাখিবার চেষ্টা করা হয়। যদি আমরা জাতীয়তা ক্ষেত্রে প্রকৃতই কিছু করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি, তাহা হইলে এ দূষিত ক্ষতস্থান আরোগ্য করিতেই হইবে।*"

* গুজরাট বিদ্যাপীঠের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অভিভাষণ।—দৈনিক বসুমতী।

"জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতার দ্বারা এদেশের অধঃপতন যে কত দূরে গিয়া পৌঁছিয়াছে, সম্প্রতি মান্দ্রাজের একটি ব্যাপারের ভিতর দিয়া তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ত্রিচূড়ের সংবাদে প্রকাশ, পুদুকোটা গ্রামের জনৈক নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ মহিলার একজন নায়ার চাকর ছিল। একদিন এই চাকরের মাথা হইতে তিনি একটি তরিতরকারীর ঝাঁকা নামাইয়া লইয়াছিলেন, এই অপরাধে সমাজ তাঁহাকে জাতিচ্যুত করে। এরূপ খামখেয়ালি অনুদার সমাজের নমুনা জগতের আর কোথাও মেলে না। আর এইটাই সমাজের বিশিষ্টতা মনে করিয়া আমাদের ধর্ম্মধ্বজীরা গর্ব্ব করেন। নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ মহিলাটি সমাজের এই অন্যায় কষাঘাতকে অগ্রাহ্য করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহাদের মন স্বাধীন তাঁহারা কখনো এই সব অত্যাচার বরদাস্ত করিতে পারেন না। হিন্দু সমাজ তাহার অচলায়তনের প্রাচীরটা সঙ্কীর্ণতার দ্বারা যতই উঁচু করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে, তাহার জন-বল ততই কমার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। * * * তথাপি এদিকে সমাজের কোন হুঁস নাই। *"

"উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সর্ব্বদা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের উপর অযথা উৎপীড়ন করিয়া থাকেন এবং তাহাদের ঘৃণার চক্ষেও দেখেন। এমন কি কোন হিন্দু নাপিত অথবা ধোপা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের কাজ করে না; অথচ ইহারাই মুসলমান বা খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে হিন্দু ধোপা ও নাপিতগণ বিনা আপত্তিতে তাহাদের সেবা করিবার জন্য উদগ্রীব হয়। হিন্দু সমাজের এই আত্মঘাতী নীতির ফলে দিন দিন হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে এবং নিম্ন শ্রেণীর বহু হিন্দু অনন্যোপায় হইয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। আমাদের ধারণা ছিল যে, মান্দ্রাজে উচ্চ বর্ণ ও নিম্ন বর্ণের ভেদ বাঙ্গলা দেশ হইতে অধিক। এই বিষয়ে বাঙ্গলাও মাদ্রাজ হইতে পশ্চাৎপদ নহে।

* অস্পৃশ্যতার অত্যাচার, প্রবাসী মাঘ, ১৩২৯।

আমরা অন্যত্র এই সংবাদটী প্রকাশিত করিলাম। পাঠক দেখিবেন, আমাদেরই অনুদারতার ফলে দিন দিন হিন্দু সমাজের কি সর্ব্বনাশ হইতেছে।

বাঙ্গালী নাপিত ও ধোপা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলের কার্য্যই করে, কিন্তু করে না কেবল ইহাদের। একজন হৈহয় ক্ষত্রিয় যতক্ষণ হিন্দু থাকিবে, ততক্ষণ কোন নাপিত তাহাকে কামাইবে না; কোন ধোবা তাহার কাপড় কাচিবে না; কিন্তু যেই সে খৃষ্টান কিম্বা মুসলমান হয়, অমনি তাহার পক্ষে নাপিত ধোপা পাওয়ায় আর বিঘ্ন থাকে না। বর্ত্তমানে ধোপা, নাপিত, বাদ্যকর, পুরোহিত, দেবমন্দির—সকল হইতেই হৈহয় ক্ষত্রিয় বঞ্চিত। ব্রাহ্মণ ইহাদের পৌরহিত্য করিলে সে ব্রাহ্মণের হাতের জল অস্পৃশ্য বিবেচিত হয়, হৈহয় ক্ষত্রিয় জুতা খড়ম পায় দিয়া উচ্চবর্ণের হিন্দুর বাড়ীতে গেলে তাহা নিতান্ত অসহনীয় হয়। হিন্দুর প্রতি হিন্দুর এই প্রকার অবজ্ঞা, তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ফলে বহুলোক ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছে;—মুসলমান ও খৃষ্টান হইতেছে। কুড়িগ্রাম পোষ্টের অধীন ভোট জাতীয় সমস্ত হিন্দুরা মাত্র দুই বৎসর পূর্ব্বে একদিন একযোগে সকলে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।*"

"আহার, জলপানসম্পর্কে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, মনুষ্যত্বকে অপমান না করিয়া, প্রয়োজন মত পন্থা অনুসরণ করিলেই হইল; আমাদের মনে হয়, বাঙ্গলার কোন জাতিকে জল অনাচরণীয় ও অস্পৃশ্য বলিয়া কোন জাতির ঠেকাইয়া রাখা উচিত নহে। তা' ব্রাহ্মণোত্তমই হউক, আর চণ্ডালাধমই হউক—মানুষের নিকট মানুষের ব্যবহার পাইবার দাবী ও অধিকার এ যুগে সকলেরই আছে—ইহাই যুগধর্ম্ম। কালপুরুষের ইঙ্গিত—বাঙ্গলার হিন্দু সমাজের অধিকাংশ জাতি আর পতিত-পর্য্যায়ভুক্ত থাকিবেন না। স্ব স্ব বর্ণোচিত শিক্ষা ও দীক্ষা আয়ত্ত করিবার যে উৎসাহোচ্ছ্বাস

* 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ফাল্গুন ১৩২৯।

উদ্যম তাঁহাদের মধ্যে জাগিয়াছে,—কোন হাস্যকর মূঢ়তা তাহা বাধা দিতে পারিবে না। আমরা সেই ভরসাতেই বাঙ্গলার হৃদয়বান যুবক-শক্তিকে পুনঃ পুনঃ জাতীয়-চরিত্র হইতে ছুঁৎমার্গের জঘন্য লজ্জা চিরতরে মুছিয়া ফেলিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। আভিজাত্য ও কাঞ্চনকৌলিন্যের ঝুঁটা অহঙ্কার ভূলুণ্ঠিত হউক, বাঙ্গলার বুকে মনুষ্যত্বের মহিমা অভ্রভেদী শির তুলিয়া গৌরবগর্ব্বে দণ্ডায়মান হউক। সকলের শুভ ইচ্ছা এই শুভদিনকে নিকটবর্ত্তী করুক। আমরা প্রপীড়িত মনুষ্যত্বের মুক্তি ও ন্যায়ধর্ম্মের জগত-উপপ্লাবী মহালীলা প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হই, কৃতার্থ হই।" *

অস্পৃশ্যতারূপ মহাপাপ ভারতবর্ষ হিন্দুস্থানকে ডুবাইয়াছে, মুষ্টিমেয় বিদেশী বিজাতি ও বিধর্ম্মী ৩৩ কোটি নরনারীর উপর একাধিপত্য করিতে সক্ষম হইতেছে। অস্পৃশ্যতার মহাপাপ কোটি কোটি হিন্দুকে পরাজিত ও পরাধীন করিয়াছে এবং দিন দিন ধ্বংস করিতেছে। বিগত সাত শত বৎসরে ৬০ কোটি হিন্দু ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এবং কমিয়া ২২ কোটিতে পরিণত হইয়াছে এবং ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। বিগত ৫০ বৎসরে ৫০ লক্ষ ভিন্ন ধর্ম্মী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং ৫০ লক্ষ হিন্দু সন্তান এই বঙ্গদেশে—কমিয়া গিয়াছে। হিন্দু সমাজপতিগণের অত্যাচারে জর্জ্জরিত ও উৎপীড়িত হইয়া লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারী খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে এবং প্রতি দিন গড়ে ৩৫২ জন করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। হিন্দু সমাজের মনস্বী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ হিন্দুর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আকুল। বিরাট হিন্দু জাতিকে এই ক্ষয় ও ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিগত ভাদ্র মাসে (১৩৩০) পুণ্যভূমি কাশীধামে ভারতের সর্ব্ব প্রদেশের হিন্দু নেতৃবর্গ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মণ্ডলী একত্র হইয়াছিলেন—হিন্দু মহাসভার সপ্তম অধিবেশনে। পুনরায় গত ২রা ফেব্রুয়ারী (১৯২৪ সালে) তীর্থরাজ প্রয়াগধামে অখিল ভারতীয়

* আনন্দবাজার পত্রিকা।

হিন্দু মহাসভার বিশেষ অধিবেশনে ভারতের সকল প্রদেশের সাধু সন্ন্যাসী, প্রধান প্রধান মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলী এবং হিন্দু সমাজের অগ্রণী, প্রতিনিধি ও নেতৃবর্গ একত্রিত হইয়া অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ও শুদ্ধি বিষয়ক প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণপূর্ব্বক সকলকে অবজ্ঞাত শ্রেণীর নর-নারায়ণ-দের বিদ্যালয়ে ও দেব মন্দিরে প্রবেশাধিকার দান এবং ছুঁৎমার্গ পরিহার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি আজ ৪ বৎসর ধরিয়া অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন প্রস্তাব প্রতি বর্ষে গ্রহণ করিতেছে এবং সকলকে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনে আত্মনিয়োগ করিতে অনুরোধ করিতেছে। রাষ্ট্রীয় সমিতির কর্ম্মী ও স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রত্যেকেই আপন আপন জীবন ও আচরণ দ্বারা অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। ভারতের সহর ও নগর হইতে অস্পৃশ্যতা তিরোহিত হইয়াছে উহা দূর পল্লীতে মাত্র আছে। আমরা আশা করি প্রত্যেক পল্লী হইতেই এই পাপ অচিরাৎ পলায়ন করিবে। ভারতের সপ্ত কোটি অস্পৃশ্য ভ্রাতা ভগিনীগণের মর্ম্মন্তুদ বেদনা দয়াল হরির স্বর্গ সিংহাসনে পৌঁছিয়া তাঁহার কোমল প্রাণকে দ্রবীভূত করিয়াছে। এই বার সর্ব্ব দুঃখের অবসান, সর্ব্ব তাপের প্রশমন ও সর্ব্ব বেদনার নিবৃত্তি। এই সাত কোটি নরনারীকে মানবের জন্মগত স্বাভাবিক অধিকার দান করিয়া তাহাদিগকে ভাই ভগিনী বলিয়া গ্রহণ করতঃ আমরা নব বলে নূতন শক্তিতে স্বরাজ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। অধিকার না দিলে অধিকার পাইবার কোন আশা নাই। দেওয়া এবং পাওয়া ইহাই সনাতন নিয়ম। আমরা অধিকার দিব না, অধিকার পাইব? এক গ্লাস জল দানের, একটা শব্দ উচ্চারণের, একখানা পুস্তক পাঠের তুচ্ছ অধিকার আমরা দিব না—আর বিদেশী বিধর্ম্মী বিজাতি ইংরাজ গোটা ভারত রাজ্যের অধিকার আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন—এরূপ আশা করা কি পাগলামি নহে। অস্পৃশ্যতা ও বর্ত্তমান অন্যায় অন্যায্য জাতিভেদের মহাপাপে এ দেশ ডুবিয়াছে। ইহার

আশু প্রতিকার চাই। নমঃশূদ্র, পোদ, মালী, পাটনা প্রভৃতি সমাজের ও জাতির অশেষ উপকারী, নিত্য সেবাপরায়ণ সরল অকপট ভাইদিগকে ধোপা, নাপিত, বেহারা দিতে হইবে। সকলকে ভাই বলিয়া টানিয়া তুলিতে হইবে। কাহাকেও বাদ দিয়া স্বরাজ সংগ্রামে জয়ের আশা নাই। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ব্যতীত ২২ কোটি স্বজাতীয় হিন্দু নরনারীর মধ্যে প্রকৃত জাতিয়ত্ব ও আপন বুদ্ধি জাগ্রত হইবে না। হিন্দু জাতির এই ঘোর দুর্দ্দিনে প্রত্যেক জাতিকে আপন আপন জাত্যাভিমান ত্যাগ করিয়া পরবর্ত্তী ছোট ভাইদের জলচল করিয়া লইতে হইবে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, কামার, কুমার, তিলি, তাম্বুলি, নাপিত, মোদক, গন্ধ বণিক প্রভৃতি জলাচরণীয়গণ এই দণ্ডে সুবর্ণ বণিক, সাহা, কপালী, মাহিষ্য, (আদি কৈবর্ত্ত ঝালমাল, সূত্রধর প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের জলচল করিয়া লইবেন এবং সুবর্ণ বণিক, সাহা, মাহিষ্য আদি কৈবর্ত্ত) কাপালিকগণও আবার এই দণ্ডে,—সঙ্গে সঙ্গে নমঃশূদ্র, পোদ, পাটনী, মালী, রজক প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের জলচল করিয়া লইবেন। এইরূপ ভাবে নমঃশূদ্র, পোদ, পাটনী, মালী, রজক, ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের অপেক্ষা অনুন্নত ও অবনত—লাঞ্ছিত ও অবজ্ঞাত কোনাই. বেহারা, ঢুলি, চর্ম্মকার ও হাড়ি ভাইদের জলচল করিয়া লইবেন। এমনি করিয়াই সমুদয় অচল জাতির জলচল করিয়া লইতে হইবে। যদি কোন সম্প্রদায় তন্নিম্ন সম্প্রদায়স্থ ভ্রাতৃগণের জলপানে অসম্মত ও কুণ্ঠিত হন—তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে উচ্চ জাতিগণের নিকট জলচলের দাবী করা সঙ্গত ও শোভন হইবে কি? তাঁহারা এই কথাটা নিজেরাই ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। অধিকার না দিলে অধিকার মিলিবে না—অধিকার দিলে তবে অধিকার পাওয়া যাইবে। ভারত জননীর সুসন্তানগণ কোটি কোটি অস্পৃশ্য ভাইদের তুলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন সর্ব্ব জাতির উত্থান ও মুক্তির উপরই ভারতের অভ্যুত্থান ও মুক্তি নির্ভর করিতেছে। কারণ কাহাকেও বাদ দিয়া—পরিত্যাগ করিয়া কাহারও

উঠিবার সাধ্য নাই। ভারত শুধু উচ্চ জাতিরই নহে—ভারত আচণ্ডালের ভারত।

অতএব নিবেদন, এই দণ্ডে—এই মুহূর্ত্ত হইতে ইহাকে সমাজ হইতে দূর করিতে হইবে। কোন দোহাই, কোন যুক্তি, কোন শাস্ত্র আমরা শুনিব না। ইহার অনুকূলে কোন যুক্তি ও ন্যায় থাকিতে পারে না। ইহা জীব-ব্রহ্ম, নর-নারায়ণবাদ অতল সাগরে ডুবাইয়া দিয়াছে, শাস্ত্রের মহিমা ও মর্য্যাদা ধ্বংস করিয়াছে—অস্পৃশ্যতা হিন্দু সমাজকে স্বর্গের নন্দন কানন হইতে নরকে নিক্ষেপ করিয়াছে। মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে—সকলের জলই সকলে খাইতে পারে, ইহাতে কোন দোষ বা পাপ নাই। আসুন, আমরা সকল জাতি—সমগ্র হিন্দু সমাজ মিলিয়া এই পাপ প্রথা উঠাইয়া দেই, সকলের হাতের জল সকলে খাই। এই প্রকারে ভারত হইতে জাতিদ্বেষ—জাতি হিংসা—দূর করি। যাহারা এ বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তাহারা দেশের শত্রু, জাতির শত্রু, স্বাধীনতার শত্রু।

ঘরে বিড়াল, বেজী, সাপ, কুকুর গেলে, ছাগল, ভেড়া, ইন্দুর গেলে কৈ কাহারও ত ভাত ডাল দ্রব্য জল নষ্ট হয় না,—আর মানুষ গেলে নষ্ট হইবে? মানুষ কি তবে ছাগল ভেড়া বিড়াল বেজি অপেক্ষাও অপবিত্র, ঘৃণিত ও দূষিত? দেবমন্দিরে পশু পক্ষী গেলে দেবতা অশুদ্ধ হয় না—কিন্তু মানুষ গেলে দেবতা অশুদ্ধ, অপবিত্র হয়,—শালগ্রামকেও পঞ্চগব্যে শুদ্ধ করিতে হয়। তবে কি বুঝিব, মানুষ পশু পক্ষী অপেক্ষাও অধম, হীন অপবিত্র? ভাই সকল, এই সব পাপাচারেই হিন্দু জাতি ডুবিয়াছে। পদাঘাতে এই সব পাপাচার, দেশাচার, অনাচার, অত্যাচার, স্ত্রী-আচার, লোকাচার ভাঙ্গিতে হইবে। "ধর্ম্ম মার্গ, জ্ঞান মার্গ, যোগ মার্গ, ভক্তি মার্গ সব পলায়ন, আছে কেবল ছুঁৎমার্গ; আমায় ছুঁওনা—আমায় ছুঁও না রব। ব্রহ্ম এখন ব্রহ্মলোকেও নাই, গোলকেও নাই, মুনি ঋষির হৃদয়কন্দরেও নাই—যাগ যজ্ঞ

তপস্যায় নাই! ব্রহ্ম এখন রান্নাঘরে, ব্রহ্ম এখন ভাতের হাঁড়িতে।" কে বড়, কে ছোট, কে উচ্চ কে নীচ, কে শ্রেষ্ঠ কে নিকৃষ্ট—সকলেই ভগবানের সন্তান—বিরাট পুরুষের দেহজ—আত্মজ। কাহাদের ঘৃণা করিব? যাহাদের না হইলে সমাজের এক দণ্ড চলে না, যাহাদের হাড়ভাঙ্গা কঠিন পরিশ্রমের উপর আহার বিহার, অন্ন জল, ভোগ বিলাস নির্ভর করিতেছে,—যাহারা দেশের মেরুদণ্ড, রক্ত মাংস মেদ অস্থি—যাহারা দেশের সর্ব্বস্ব, প্রাণ, আত্মা, তাহাদিগকে কি আমরা ঘৃণা করিতে পারি? স্বজাতি, স্বধর্ম্মাবলম্বী এবং স্বদেশবাসী ভাই ভগিনীগণকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করার মহাপাপেই না ভারত ডুবিয়াছে। ভারতবর্ষের যাহারা শ্রেষ্ঠ পুরুষ,—ভারত জননীর যাহারা শ্রেষ্ঠ সন্তান—সেই মহাত্মা গান্ধী—তিলক, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ঘোষ সকলেই অস্পৃশ্যতার ঘোর বিরোধী। আমরা কাহার কথা শুনিব? মহা মনীষি মদন মোহন মালব্য, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের কথা শুনিব, না তর্কবাগীশ তর্করত্নের কথা শুনিব? তর্করত্নের যুগ গিয়াছে,—এখন ন্যায়রত্নের যুগ। এ যুগে অন্যায়, অসত্য, কাপট্য, ভণ্ডামী চলিবে না। তোমার তলে তলে সব চলে,—আর প্রকাশ্যে জলটুকু চলিবে না? এখন আর কপট হিন্দুয়ানী চলিবে না। ভণ্ড আর্য্যামীর যুগ গিয়াছে। এখন সত্য ও যুক্তির যুগ। এই বঙ্গদেশে ২ কোটি হিন্দুর মধ্যে ৫০ লক্ষ মাত্র—আচরণীয়; অবশিষ্ট দেড় কোটিই অনাচরণীয়; ৪ ভাগের ৩ ভাগকেই আমরা পশুর অধম করিয়া পায়ের নীচে দাবাইয়া রাখিয়াছি। এই এক কোটি ৫০ লক্ষ লোককে বাদ দিয়া—হীন করিয়া রাখিয়া আমরা কিছুতেই বড় হইতে,—বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না। ইহাদিগকে এই দণ্ডে বুকে তুলিয়া লইতে হইবে,—শ্রীবুদ্ধ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম লইয়া ইহাদের দ্বারে দ্বারে যাইয়া—ইহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। প্রেমের অমৃত প্রলেপে যুগ যুগান্তরের ঘৃণাবমাননা হিংসা দ্বেষে ক্ষত বিক্ষত প্রাণের ব্যথা, বেদনা

দূর করিয়া—আরোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে। ২২ কোটি হিন্দুকে এক করিতে হইবে। কাজ শক্ত,—পথ কণ্টকাকীর্ণ, বাধা বিঘ্ন পদে পদে—তবু আমরা এই পথেই যাত্রা করিব। পার্থ সারথী আমাদের পশ্চাতেই আছেন—তিনিই আমাদের পথপ্রদর্শক,—নেতা, পরিচালক এবং এই ন্যায় সত্য ও ধর্ম্ম-যুদ্ধের সেনাপতি। মানুষের—সমাজপতিগণের কি সাধ্য আমাদের গতিরোধ করে। দেশকে আমরা তুলিবই তুলিব, ভারতের মুক্তি আনিবই আনিব। আমরা জ্যোতির সন্তান, আমরা কাহাকে ভয় করিব—গ্রাহ্য করিব।

অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন কথাটা শুনিয়াই হয়ত অনেকে চমকিয়া উঠিবেন, নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, লেখককে কালাপাহাড় বলিয়া ঘোর কলির আগমনের স্বপ্ন দেখিবেন। অনাচরণীয়ের জল পান করা দেশাচার ও লোকাচার বিরুদ্ধ হইলেও অশাস্ত্রীয় নহে। আমরা শাস্ত্র শাস্ত্র করিয়া চীৎকার করিলেও প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রকে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ভক্তি করি না। স্বার্থ বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে শাস্ত্রের শ্লোক আওড়াইয়া থাকি মাত্র, ফলতঃ শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস আমাদের অনুমাত্রও নাই। শাস্ত্র অপেক্ষা লোকাচার, স্ত্রী-আচার, দেশাচার ও অন্যায় আচার অবিচারের আমরা অধিক ভক্ত—লোকাচার ও দেশাচারের দাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ শাস্ত্রের দোহাই সকলেই দিতেছে। সংহিতাদির মধ্যে মনুসংহিতা শ্রেষ্ঠ। মনুর নামে সমাজপতিগণের মুখে জল আইসে, কণ্ঠ গদ্গদ হইয়া উঠে। সেই মনু মহারাজ জলকে সচল করিয়া গিয়াছেন। মনু বলিতেছেন:—

এধোদকং মূলফলমন্নমভ্যুদ্যতঞ্চ যৎ।
সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্ণীয়ান্মধ্বথা ভয় দক্ষিণাম॥২৪৭
শয্যাং গৃহান্ কুশান্ গন্ধানপঃ পুষ্পং মনীন্ দধি।
ধানা মৎস্যান্পয়ো মাংসং শাকঞ্চৈব ন নির্নুদেৎ॥২৫০

(চতুর্থ অধ্যায়; মনুসংহিতা।)

"কাষ্ঠ, জল, মূল, ফল ও খাদ্য যাহা অযাচিতভাবে আপনা আপনি উপস্থিত হয়, এই সকল এবং মধু ও অভয় দান, সকলের নিকট হইতেই প্রতিগ্রহ করা যায়।" "শয্যা, গৃহ, কুশ, কর্পূরাদি, গন্ধদ্রব্য, জল, পুষ্প, মণি, দধি, ধান্য, মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ ও শাক এ সমুদায়ও অযাচিতভাবে উপস্থিত হইলে প্রত্যাখ্যান করিবে না।"

শাস্ত্রসর্ব্বস্ব, বচনবাগীশগণ, মনুর বচন মানিতে প্রস্তুত আছেন ত? শাস্ত্র বলেন—মদ্যপায়ী এবং মদ্যপায়ীর সংস্রবকারিগণ মহাপাপী, দণ্ড—প্রাণদণ্ড। "পাচক (রাঁধুনী) ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজনে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত।" (অত্রি সংহিতা ৯২) শূদ্র সেবায় (ম্লেচ্ছের ত কথাই নাই) চান্দ্রায়ণ যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা)। লশুন, পলাণ্ডু ভোজনে চান্দ্রায়ণ। হংস, কপোত, মৎস্য, মাংস ভোজনে দ্বাদশাহ উপবাস (উশনঃ সংহিতা, নবম অধ্যায়)। এই ত শাস্ত্রের আদেশ ও উক্তি। আপনারা যখন শাস্ত্রের কোন আদেশই পালন করিতে সমর্থ নহেন—তখন বাড়াবাড়ি না করিয়া দেশের এই ঘোর সঙ্কট সময়ে সপ্ত কোটি অস্পৃশ্য ভাইদের বাহুপাশে বুকে টানিয়া আনুন। অস্পৃশ্যতারূপী মহাপাপ ভারত মহাসাগরে ডুবাইয়া দিন।

এই অস্পৃশ্যতার মহাপাপ সম্বন্ধে পৃথ্বীরাজের মহাকবি অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে গাহিয়াছেন—

"কহিলা মহর্ষি; বৎস! অস্পৃশ্য পারিয়া।
বিপ্রগ্রামে বাপী-স্পর্শে নাহি অধিকার;
তাই ছুটিয়াছে নারী নদী-জল পানে।
পাপিনীর পাপদৃষ্টি শ্রাদ্ধদ্রব্যে যদি
পড়ে দৈবে, অপবিত্র হইবে সকল;
তাই উত্তেজিত বিপ্র খেদাইল তা'রে।
জান কি এ পারিয়ায়? এই জাতি মাঝে

জন্মেছিল তিরুবল্ল, জ্ঞানে ঋষিসম ;
এই জাতি সমুদ্ভূতা, ভক্তি মূর্ত্তিমতী,
আবেয়া, কবিতামৃত বিতরি' দ্রবিড়
করেছিল মধুময় ; তবু দশা হেন ।
'দয়া মূল ধর্ম্ম' এই শাস্ত্রের বচন ;
কিন্তু বল, কোথা দয়া ? কুক্কুর-ভোজন
নহে দূষ্য ; দূষ্য নরশিশুর ভোজন !
বিশ্ববন্ধু বিপ্র, হের ব্যবহার তা'র ।
আছে শাস্ত্রবাণী, সত্য, গুণ কর্ম্মবশে
জাতি-সৃষ্টি ; বিচারিয়া কিন্তু বল তুমি
জাতি-দর্প, জাতি-দ্বেষ কোন্ শাস্ত্রবাণী ?
কোন ঋষি হেন শাস্ত্র করিলা প্রচার ?
নিজে নর নারায়ণ বিঘোষিলা যথা
অবিভেদে সমদৃষ্টি ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে
জ্ঞানীর লক্ষণ, সেথা বর্ব্বরতা হেন ?
উচ্চ ধর্ম্মনীতি হেন প্রচারিত যথা,
এই নীচ আচরণ সাজে কি তথায় ?
ভুলিয়াছে আর্য্যসুত, দেব রঘুমণি
চণ্ডালে বাঁধিয়াছিলা প্রেম-আলিঙ্গনে ;
ভুলিয়াছে বুদ্ধরূপী প্রভু বিশ্বম্ভর
উচ্চ নীচ, দ্বিজ শূদ্র, সবে সমভাবে
শিখাইয়া ছিলা নীতি, ধর্ম্ম, সদাচার ।
সর্ব্ব জীবে আত্মারূপে বিরাজিত যিনি,
দেখ ভাবি', কি বেদনা লাগে তাঁ'র প্রাণে

হেন বৃথা জাতিদর্পে, নির্ম্মম আচারে।
দর্পহারী তিনি, বৎস! মহা গদা তাঁ'র,
হয় ত, কথন্ আসি' পড়িবে সহসা
চূর্ণিতে দর্পীরে, বংশ-পরম্পরাক্রমে।"

পারিয়াদিগকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করার প্রতিফল—হিন্দুস্থান ও গর্ব্বিত ভারতবাসী হাতে হাতে পাইয়াছে।

হিন্দুর প্রতি হিন্দুর, স্বজাতীয়ের প্রতি স্বজাতির এই দলন ও পীড়ন, নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া সুচতুর ইংরেজ বীর ক্লাইভ তাহাদিগকে সেনাদলভুক্ত করিয়া ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়া ভারতবাসী দ্বারা ভারতবাসীকে দলনকরতঃ পলাসীর যুদ্ধে হিন্দুর মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছিলেন। * অন্ত্যজ পীড়নের সূত্র ধরিয়া ভগবান্ ইংরাজকে হাত ধরিয়া ভারত সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন—অন্ত্যজের হাতে উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ জাতিগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া। অন্ত্যজ পারিয়া নারায়ণের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞার ফল—ভারত এখন হাড়ে হাড়েই উপলব্ধি করিতেছে। ভারতবাসী, উচ্চ জাতিত্বের বৃথা দাবী ও গর্ব্বকারিগণ সাবধান হও। তথাকথিত অন্ত্যজ-ভ্রাতার বাড়ী বাড়ী গিয়া তাহাদিগকে বুকে তুলিয়া লইয়া—ভাই বলিয়া ক্রোড়ে ধারণ করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর,—শ্রীভগবানের কৃপাশীর্ব্বাদ এই পতিত জাতি ও পতিত দেশের উপর বর্ষিত হউক।

---

* The Pariahs supplied a notable proportion of Clive's sepoys, and are, still enlisted in the Madras sappers and miners.

Encyclopaedia Britanica Vol. XX. P. 802

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সমাজপতি ব্রাহ্মণের প্রতি নিবেদন।

সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের পরিপোষক 'কলির দেবতা' হে পূজনীয় সমাজপতি ব্রাহ্মণগণ! উপসংহারে আপনাদের শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বশেষে এ দীন সমাজ সেবকের কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে। প্রথমতঃ আদ্যোপান্ত এই পুস্তকখানি পাঠ করিবেন, তারপর ধীরভাবে ইহার প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, দুই চারি পাতা পড়িয়াই ধৈর্য্যহীন হইয়া পড়িবেন না। ক্রোধে অধীর হইলে চলিবে না, ধীর স্থির ভাবে হিন্দুজাতি সম্বন্ধে চিন্তা করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সমাজপতি হওয়া কেবল মুখের কথা নহে, ইহার জন্য প্রচুর পরিমাণ হৃদয় শোণিত দানের প্রয়োজন। ফাঁকি দিয়া সমাজপতি হওয়া চলে না। স্বার্থত্যাগ এবং আত্মত্যাগ ভিন্ন কেহ কোন কালে কোন দেশে সমাজপতি হইতে পারেন নাই। আপনাদের সে 'ত্যাগ' কোথায়? কাজের মধ্যে দিবারাত্র কেবল শাস্ত্র শাস্ত্র বলিয়া উচ্চ চীৎকার করিয়া শক্তিক্ষয় করিতেছেন মাত্র। শাস্ত্রের প্রমাণ ভিন্ন আপনারা অন্য কোন কথা, কোন যুক্তি কানে তুলিতে চাহেন না। জিজ্ঞাসা করি, শাস্ত্র কিছু প্রকৃতরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন কি? দেশের কল্যাণ বাসনা, সমাজের হিতচিন্তা লইয়া সমগ্র হিন্দু সমাজের স্বার্থ স্মরণ করিয়া হৃদয় দিয়া হিন্দুশাস্ত্র কখন আলোচনা করিয়াছেন কি? যদি না করিয়া থাকেন, বুঝিব শাস্ত্র পাঠ আপনাদের পণ্ডশ্রম হইয়াছে মাত্র! শুধু, 'দক্ষিণামেতৎ কাঞ্চনমূল্যং' এর জন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন

করিলে চলিবে না, শুধু 'অন্নারম্ভ', 'চূড়াকরণ', 'বিবাহ', 'শ্রাদ্ধ', 'দোল-দুর্গোৎসব' করাইয়া দশটা টাকা উপার্জ্জন করিলে চলিবে না, শুধু বিরাট গীতা রাস মহাভারত পড়িয়া, দুই দশখানা প্রায়শ্চিত্তের পাঁতি লিখিয়া দিয়া কিছু আদায় করাই সমাজপতির পক্ষে যথেষ্ট নহে। এগুলি সমাজপতির কার্য্য নহে, এগুলি ব্যবসাদারের কার্য্য! সমাজপতিত্ব,—গ্রহণে নয় দানে, ভোগে নয় ত্যাগে, ঘৃণায় নয় প্রেমে, বর্জ্জনে নয় আলিঙ্গনের উপর নির্ভর করে। আপনাদের মুখে অনবরত শাস্ত্রের দোহাই, অনুষ্টুপ ছন্দোবদ্ধ শ্লোকের ছড়াছড়ি, ঘটত্ব পটত্বের বাগ্‌বিতণ্ডা শ্রবণ করিয়া যুগপৎ ক্ষোভে ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া যাই! আপনারাই কি সেই প্রাচীন ঋষিগণের সন্তান? সত্যযুগের ধ্যান-স্তিমিত-নেত্র ত্রিজগতের কল্যাণকামী সত্য জ্ঞানময় বপুঃ সর্ব্বজীবের অহৈতুক কৃপাপরায়ণ ইহলোকের আদর্শ পরলোক-দ্রষ্টা দিব্য-চক্ষুষ্মান্ আপনারাই কি সেই ব্রাহ্মণ? তবে কৈ আপনাদের যোগ তপস্যা, যাগ যজ্ঞ, কৈ আপনাদের হিংসা-বিদ্বেষ-পরিশূন্য পবিত্র মুনিকানন ঋষির আশ্রম? কৈ আপনাদের সামগান মুখরিত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম দণ্ডকমণ্ডলু কাষায় কৌপীন, বেদ বেদান্তে অগাধ পাণ্ডিত্য এবং কৈ আপনাদের সর্ব্বোপরি উন্নত ললাট বিশাল উদার বক্ষঃস্থল! আপনাদের জ্ঞান বিদ্যায়, সংযম সাধনায়, আপনাদের শিক্ষায় দীক্ষায়, শাসন সঞ্চালনায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যজাতির কি উন্নতিই না সাধিত হইয়াছিল? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি সম্প্রদায়ের সমভাবে সর্ব্ববিধ উন্নতি বিধান করিতে আপনাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষগণ—পূতচরিত্র ঋষিগণ—কতই না প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন! জলে স্থলে, অনলে অনিলে, চন্দ্রে সূর্য্যে, গ্রহে নক্ষত্রে, ভূচরে খেচরে, কীটে পতঙ্গে যাঁহারা বিশ্বেশ্বর শ্রীভগবানের অপরূপ রূপমাধুরী সন্দর্শনপূর্ব্বক ভাবাবেশে তন্ময়চিত্তে কত কথাই না বলিয়া গিয়াছেন, কত শ্লোকই না লিখিয়া গিয়াছেন,

সঙ্গীতের সুর লহরীতে কত সামগানই না গাহিয়া গিয়াছেন! সেই সুপবিত্র ব্রাহ্মণ বংশে, ঋষি বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া মর্ত্তমন্দাকিনী ভাগীরথীর পবিত্র তটে বসবাস করিয়া আপনারা—হে আমার পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ, মনে মনে আর্য্য ম্লেচ্ছ উত্তম অধম ব্রাহ্মণ শূদ্র দ্বিজ চণ্ডাল প্রভৃতি কি জঘন্য, কি নারকী ভাবই না পোষণ করিতেছেন, কি জঘন্য যুক্তি দ্বারা উহার সমর্থন করিতে যাইয়া জগতের মনিষীবৃন্দের সমক্ষে হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িতেছেন! বেদান্তের অদ্বৈতবাদ পড়িয়া এত দ্বৈধ ভাব, এত হীন বুদ্ধি কেন? ব্রাহ্মণ! কৈ সে আপনাদের সমুদ্রের ন্যায় বিশাল বিস্তৃত অপার অনন্ত হৃদয়, কৈ সে চন্দ্র সূর্য্য বায়ু বরুণের ন্যায় আচণ্ডালে সমদৃষ্টি সমপ্রাণতা, কৈ সে ধরণীর মঙ্গল সাধনায় উৎসর্গীকৃত নিঃস্বার্থ প্রাণ! অসীম সাগরে সঙ্কীর্ণতা কেন? ঋষি বংশধরগণের হৃদয়ে এত ভেদবুদ্ধি, এত নারকী প্রবৃত্তি কেন? মহা সাম্যবাদের প্রচারকগণের বংশধর আজ নরকের ঘৃণা বিদ্বেষ, প্রবঞ্চনা প্রতারণা, ভীষণ বৈষম্যবাদ প্রচারে উন্মত্ত! জ্ঞান, বিদ্যা, বিবেক-বুদ্ধি, সাধনা, পুণ্য আজ পদদলিত! হায় ব্রাহ্মণ! আপনারাই না একদিন সমগ্র বিশ্ববাসীকে "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" অমৃতের সন্তান অমৃতের অধিকারী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন? আপনারাই না বিশ্ববাসীকে উপনিষদের কণ্ঠে সঞ্জীবনী মন্ত্র শুনাইয়া অভয় প্রদান করিয়াছিলেন? জগতের প্রতি অণু পরমাণুতে জগৎপাতার মহিমা—তাঁহার সত্তা তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি সন্দর্শন ও অনুভব করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন? কিন্তু আজ কি পরিবর্ত্তন! সে সব ঋষি ও ঋষিবাণী আজ কোথায়? পূর্ব্ব পিতৃ পিতামহগণের সে সব মহামূল্য সত্য, পবিত্র জ্ঞান ও বেদবাণী আপনারা আজি বিস্মৃত এবং তজ্জন্যই আপনাদের এই শোচনীয় পরিণাম! এই মর্ম্মস্পর্শী অধঃপতন!! হে ব্রাহ্মণ, হে চতুর্ব্বর্ণের চির আরাধ্য চির বন্দনীয় সমাজপতি ব্রাহ্মণ! একবার পূর্ব্বপুরুষগণের

গৌরব, আত্মস্বরূপ চিন্তা করিয়া হৃদয়ের কালিমা, মনের অন্ধকার, চিত্তের দুর্ব্বলতা, অপসারিত করিয়া দিন। একদিন জগতের পূজার্হ ছিলেন—আবার পূজার্হ হউন। হৃদয়কে প্রশস্ত করুন, বৈষম্য ভাব দূর করিয়া ব্রাহ্মণ চণ্ডালের ভেদাভেদ বোধ ভারত মহাসাগরে ডুবাইয়া দিন। শুধু যজ্ঞোপবীত সর্ব্বস্ব হইলেই চলিবে না, শুধু বচনের দোহাই দিয়াই নিষ্কৃতি পাইবেন না, শুধু ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব্ব করিলেই আপনাদের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া আসিবে না। সে দিন—সে যুগ অতল কাল-সিন্ধুতে ডুবিয়া গিয়াছে। সে বর্ব্বর যুগ এখন আর নাই। ইহা বিজ্ঞানের যুগ, বেদান্তের যুগ। স্মৃতি সংহিতার শ্লোক ভুলিতে চেষ্টা করুন, আপনাদের সেকেলে পুঁথি পাতড়ার কথা শিকায় তুলিয়া রাখুন, অধিকার অনধিকারের টীকায় শক্তিক্ষয় করিয়া আর লাভ নাই। টীকা টীপ্পনী ভাষ্য তত্ত্বাষ্যের ক্ষমতার কথা, উহার পাঠ ও আলোচনার ফল, হাজার বৎসরের দাসত্বে আমরা বিলক্ষণই অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছি। উহাতে আর মন ভেজে না, প্রাণ গলে না। শাস্ত্রের দোহাই দ্বারা বচনের আবৃত্তি দ্বারা আধিপত্য করিবার কাল আপনাদের অতীত হইয়াছে। ধর্ম্মবলে বলীয়ান হউন। আচণ্ডালে আলিঙ্গন দিয়া তাহাদিগকে প্রণব ওঁকার মন্ত্রে দীক্ষিত করুন, গৃহে গৃহে শঙ্খ ঘণ্টার মঙ্গল মধুর ঝঙ্কার উত্থিত হউক। প্রাতঃ সন্ধ্যায় আবার নীরব পল্লীভবন মুখরিত হইয়া শিশুর কণ্ঠে পাখীর কলতানে কল্লোলিনীর তরঙ্গ ভঙ্গে সামগান উদ্গীত হউক। ব্রাহ্মণ! আবার সেই ব্রাহ্মণ হউন, আবার ঋষিত্ব লাভ করুন।

ব্রাহ্মণের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া আপনাদের শাস্ত্রকারই বলিয়াছেন:—

শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জবং।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণং॥

ভাগবত।

ক্ষান্তং দান্তং জিত-ক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্।
তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥

গৌতম সংহিতা।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—এই এতগুলি লক্ষণের মধ্যে আপনারা কতটীর অধিকারী। পিতামাতার গুণ পুত্রে বর্ত্তে, এই যে এক ধুয়া ধরিয়া আছেন, পিতৃ পিতামহগত সাত্ত্বিকভাব পুত্রে না আসিয়াই পারে না, এই যে বলিতেছেন, করযোড়ে নিবেদন করি, পিতৃ পিতামহগত এই সব গুণাবলীর মধ্যে বংশানুক্রমিক জন্মগত ভাবে আপনারা কোন্‌টী পাইয়াছেন? বংশানুক্রমিক গুণই স্বীকার করিলে কঠোর ভাবে বলিতে হয়, আপনারাই প্রকৃত শূদ্রপদবাচ্য—নতুবা শূদ্রজনোচিত তমঃ ও রজোগুণ এত অধিক পরিমাণে আপনাদের মধ্যে দেখিতে পাইব কেন? কেবল কি শূদ্রগুণেই পরিপূর্ণ হইয়াছেন, শরীরের যে বর্ণ উহাও শূদ্র তনয়ের মত কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। কৃষ্ণবর্ণ ত কখন ব্রাহ্মণের শরীরের রং হইতে পারে না। শাস্ত্রকার বলিতেছেন :—

ব্রাহ্মণানাং সিতোবর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চলোহিতঃ।
বৈশ্যানাং পীতকো বর্ণঃ শূদ্রাণামাসিতস্তথা॥

মহাভারত; শান্তিপর্ব্ব, ১৮৭ অধ্যায়।

"ব্রাহ্মণের শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয়ের রক্তবর্ণ, বৈশ্যের পীতবর্ণ ও শূদ্রের কৃষ্ণবর্ণ শরীরে সাধারণ রং"। বহু ব্রাহ্মণ কেবল যে বর্ণ সম্বন্ধেই শূদ্রবৎ হইয়াছেন তাহা নহে, ক্রিয়া বিষয়েও শূদ্রতুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ আর এখন সেরূপ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মপ্রাণ যোগনিরত নহেন, ব্রাহ্মণ আর এখন অধ্যয়ন অধ্যাপনামগ্ন হিংসা দ্বেষ বিবর্জ্জিত ধ্যান ধারণা-পরায়ণ বেদপাঠী নহেন। অধিকাংশ ব্রাহ্মণই এখন হিংসা, লোভ, কাম, ক্রোধে পূর্ণ, বিষয় প্রমত্ত, ধনলুব্ধ, অনৃতভাষী এবং অন্তঃ বহিঃ শৌচাচার

বিহীন। তাঁহাদিগের বৃত্তির স্থিরতা নাই। ব্রাহ্মণ সন্তান এখন হোটেল খুলিয়াছেন, দোকান দিয়াছেন, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক, কেরানী, ব্যবসায়ী সবই হইয়াছেন, বড় বড় মহামহোপাধ্যায়গণ বেতন-ভোগী হইয়া অধ্যাপনায় নিযুক্ত; ব্রাহ্মণ এখন সুরাপায়ী; লবণ তৈল মাংসবিক্রেতা। এমন কাজ নাই, যাহা ব্রাহ্মণসন্তান গ্রহণ করেন নাই। শূদ্রান্ন, ম্লেচ্ছান্ন (?), যবনান্ন (?) কোন অন্নই আর বাকি রাখিতেছেন না। অথচ ইঁহারাই আবার ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব্ব করেন, শ্লোক আওড়াইয়া শাস্ত্রের দোহাই দেন, পুরাণ সংহিতা ভিন্ন কোন কথা শুনিতে চাহেন না। ইহার কোন্‌টী শাস্ত্রসম্মত? মহর্ষি মনু ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কোন্ পৃষ্ঠায় কোন্ শ্লোকে ইহার সমর্থন করিয়াছেন? মনু, অত্রি, যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখ সংহিতাকারগণ যে সব বিধি নিষেধ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন সেগুলি যথাযথ পালন করিয়া শাস্ত্রের প্রতি অগাধ বিশ্বাস প্রতিপন্ন করিবার শক্তি আপনাদের আছে কি? বর্ত্তমান যুগে হিন্দুশাস্ত্রের বিধি আদেশ প্রতি পালিত হইতে পারে কি? শাস্ত্রকার ত বলিতেছেন :—

স্বভাবাদ্ যত্র বিচরেৎ কৃষ্ণসারঃ সদামৃগঃ।
ধর্ম্ম্যদেশঃ স বিজ্ঞেয়ো দ্বিজানাং ধর্ম্মসাধনম্ ॥৪

সংবর্ত্ত সংহিতা।

যস্মিন্ দেশে মৃগঃ কৃষ্ণস্তস্মিন্ ধর্ম্মান্নিবোধত ॥২

প্রথম অধ্যায়; যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

"কৃষ্ণসার মৃগ সর্ব্বদা যে দেশে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিচরণ করে, সে সকল দেশ দ্বিজগণের (বেদোক্ত) ধর্ম্মসমূহ সাধনের যোগ্য স্থান॥"

এক্ষণে বক্তব্য এই যে, কৃষ্ণসার মৃগ কি স্বাধীন ভাবে সর্ব্বদা দেশের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে? যদি না করে, তবে শাস্ত্রজ্ঞ ও শাস্ত্রসর্ব্বস্ব, পূজ্যপাদ পুরোহিতগণ বেদোক্ত ক্রিয়া কলাপ কিরূপে সম্পাদন করাইয়া

থাকেন ? শাস্ত্রাদেশ পালন করিতে হইলে ত এদেশে সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া কলাপ বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত ? হিন্দুশাস্ত্র অন্যত্র স্পষ্টভাবে আদেশ জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছেন :—

ন ম্লেচ্ছ বিষয়ে শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ ॥১॥

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ; বিষ্ণুসংহিতা

"ম্লেচ্ছ ভূমিতে শ্রাদ্ধ করিবে না।"

ম্লেচ্ছদেশে তথা রাত্রৌ সন্ধ্যয়োশ্চ বিশেষতঃ।
ন শ্রাদ্ধমাচরেৎ প্রাজ্ঞো ম্লেচ্ছদেশে ন চ ব্রজেৎ ॥৪

১৪শ অধ্যায় ; শঙ্খ সংহিতা।

"ম্লেচ্ছদেশে * * * বুদ্ধিমান ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিবে না এবং ম্লেচ্ছদেশে গমন করিবে না।" ম্লেচ্ছদেশ কাহাকে বলে ?

উত্তর :—চাতুর্ব্বণ্য ব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।
স ম্লেচ্ছদেশো বিজ্ঞেয় আর্য্যাবর্ত্তস্ততঃ পরঃ ॥৪

(চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ; বিষ্ণুসংহিতা।)

"যে দেশে চতুর্ব্বণ্য ব্যবস্থা নাই, তাহাকে ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া জানিবে, তদতিরিক্ত দেশ আর্য্যাবর্ত্ত।"

এদেশ ত চতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থাবিহীন ; বিশেষতঃ আপনাদেরই নিত্য কথিত সদা সর্ব্বদা আলোচিত ম্লেচ্ছাধিকৃত ভূমি। এ ম্লেচ্ছাধিকৃত দেশে আপনারা পিতৃ-পিতামহগণের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য কিরূপে করিতেছেন ও করাইতেছেন। শাস্ত্রমতে ত এ শ্রাদ্ধ অসিদ্ধ। ক্রিয়া কলাপ ভিন্ন ও ম্লেচ্ছ (?) অধিকৃত দেশে বাস করিতে শাস্ত্রকারের নিষেধ আজ্ঞা। মনু বলিতেছেন :—

ন শূদ্ররাজ্যে নিবসেন্নাধার্ম্মিক জনাবৃতে।
ন পাষণ্ডিগণাক্রান্তে নোপসৃষ্টেঽন্ত্যজৈর্নৃভিঃ ॥৬১

(চতুর্থ অধ্যায় ; মনুসংহিতা।)

শূদ্রবশবর্ত্তী রাজ্যে বাস করিবে না ; অধার্ম্মিক বহুলদেশে, বেদবহির্ভূত পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত দেশে এবং চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতিকর্ত্তৃক উপদ্রুত দেশে বাস করিবে না।"

তথাকথিত ম্লেচ্ছাধিকৃত দেশে বাস করা ত দূরের কথা, শূদ্রবশবর্ত্তী দেশে বাস করিতেও মনুর নিষেধ।

রজতখণ্ডের প্রলোভনে অশাস্ত্রীয়—আপনাদেরই কথিত ম্লেচ্ছ (?) অধিকৃত দেশে চির অধিষ্ঠিত থাকিয়া শ্রাদ্ধ শান্তি ক্রিয়া কলাপ করাইতে পারেন আর বিদ্যার্থী দেশের কল্যাণকারী প্রবাসী ম্লেচ্ছদেশাগত ভারতমাতার মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানগণকে গ্রহণ করিতে পারেন না? তাহাতে শাস্ত্রের নিষেধ! অধর্ম্ম ভয়!! না সেখানে বুঝি দক্ষিণার ব্যবস্থা নাই বলিয়া?

শূদ্রের দান গ্রহণ সম্বন্ধে সমুদয় শাস্ত্রকারগণের একবাক্যে নিষেধ আজ্ঞা। শূদ্রের অন্ন ত রক্ততুল্য হেয়। অত্রি বলেন—"ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃত, ক্ষত্রিয়ের অন্ন দুগ্ধবৎ, বৈশ্যান্ন অন্নমাত্র এবং শূদ্রান্ন রুধিরবৎ অভক্ষ্য" (১) আর তাহা ভোজনে :—* * * নিশ্চয়ই নরক প্রাপ্তি হইয়া থাকে।" (২)

"শূদ্রান্ন ভোজন, শূদ্রের সহিত বিশেষ সংসর্গ, শূদ্রের সহিত একত্র থাকা এবং শূদ্রের নিকট হইতে কোনরূপ জ্ঞানোপার্জ্জন, ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন ব্রাহ্মণকেও পতিত করে।" (৩)

"যে দ্বিজ শূদ্রান্ন ভোজী হইয়া পুত্র উৎপাদন করে, সেই দ্বিজের

(১) অনুবাদ—৩৬১। অত্রিসংহিতা।

(২) অনুবাদ—৫৬। প্রথম অধ্যায় ; অঙ্গিরঃ সংহিতা।

(৩) অনুবাদ—১৯ শ্লোক ; প্রথম অধ্যায় ; অঙ্গিরঃ সংহিতা।

উৎপাদিত সেই সকল পুত্রগণ প্রকৃত পক্ষে যাহার অন্ন তাহারই—কেননা, অন্ন হইতেই শুক্রের উৎপত্তি।" (১)

এই ত গেল শূদ্রের অন্ন ভোজনের কথা। শূদ্রের চিড়ামুড়ি ভোজন সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলেন :—শুষ্কমন্নমবিপ্রস্য ভুক্ত্বা সপ্তাহমৃচ্ছতি। ৪৬। প্রথম অধ্যায়; ঐ

"ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের (শূদ্রের) শুষ্কান্ন (চিপিটকাদি) ভোজন করিলে সপ্তাহ ব্রত করিবে।"

অতঃপর হোটেলাদির অন্নভোজন সম্বন্ধে শাস্ত্রকারের মত উদ্ধৃত করিতেছি। "মিলিত জন সমূহের ('মেছ', হোটেলাদির) অন্ন * * * ভোজনে কর্ম্মান্তরার্জ্জিত স্বর্গাদি লোক হইতেও ভ্রষ্ট হইতে হয়। ২১৯। চিকিৎসকের অন্নভোজন পূয সমান, * * * বৃদ্ধি উপজীবির (সুদখোর মহাজনের) অন্ন ভোজন বিষ্ঠা ভোজনের সমান ও লৌহ বিক্রয়ীর অন্ন-ভোজন শ্লেষ্মাভোজন তুল্য ঘৃণিত জানিবে।" ২২০। (২)

ঢাকা, কলিকাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন শূন্য বড় বড় সহরে বা নিঃসম্পর্কিত বিদেশে কার্য্যব্যপদেশে যাতায়াত করেন, কিন্তু হোটেলে বা মেছে খান না, এমন ব্রাহ্মণ সন্তান বাঙ্গালায় কয়জন আছেন? যাঁহারা আছেন তাঁহারা নগণ্য মুষ্টিমেয়। তাঁহাদের দুই চারিজন লইয়া সমাজ নহে। কত উপাধিধারী টোলের অধ্যাপকের কথা জানি যাঁহারা বিদেশে হোটেলাদির অন্ন নির্ব্বিচারে—নিরাপত্তিতে আহার করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া আবার সমাজপতির আসন গ্রহণপূর্ব্বক সমাজ শাসনে প্রবৃত্ত আছেন। মেছ হোটেলে রসুয়ে ঠাকুরের অন্ন ত দূরের কথা, প্রতিদিন রেলে ষ্টিমারে বাবুর্চ্চির তৈয়ারী অন্ন ব্যঞ্জন কুক্কুট মাংস নির্ম্মিত কালিয়া

(১) অনুবাদ—৪৩ শ্লোক ; প্রথম অঃ ঐ।

(২) অনুবাদ—৪র্থ অধ্যায় ; মনুসংহিতা।

কোর্ম্মা, চপ্, কট্‌লেট শত শত ব্রাহ্মণ সন্তান মনু রঘুনন্দনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া, যথেচ্ছারূপে গলাধঃকরণ করিতেছেন। কলিকাতা ও ঢাকার কত বাবু ব্রাহ্মণগণের কথা জানি যাঁহারা প্রায় প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে মুসলমানের দোকান হইতে কুক্কুট মাংস আনিয়া জিহ্বার তৃপ্তিসাধন ও ভগ্ন স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করিতেছেন! বঙ্গদেশের প্রায় সমুদয় ছাত্রাবাসে বিশেষতঃ কলিকাতা ও ঢাকাতে মুসলমানের পাউরুটি বিস্কুট ত নিত্য নিয়মিত ব্যবহৃত খাদ্য। বড় বড় ছাত্রাবাসের সংবাদ যাঁহারা কিছুমাত্র রাখেন, তাঁহারাই জানেন, রসুয়ে বামন ২।৪।১০ দিনের জন্ম কার্য্যগতিকে অন্যত্র গেলে বা অসুস্থ হইয়া পড়িলে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, তিলি, তন্তুবায় প্রভৃতি ছাত্রগণ পর্য্যায়ক্রমে এবেলা ওবেলা দিনের পর দিন রন্ধনাদির কার্য্য উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তির সহিত নির্ব্বাহ করিয়া সকলে মহানন্দে একত্র—কোথাও বা একপাত্রে ২।৩ জন ভোজন করিয়া সে কয়েক দিন অতিবাহিত করিয়া দেন। কত ব্রাহ্মণের সন্তান ষ্টীমারে কেরাণীগিরি করিয়া মুসলমান বাবুর্চ্চির অন্ন, কত প্রকার হিন্দুর অখাদ্য মাংস প্রতিদিন আহার করিতেছেন, সমাজে তাহাতে কথাটী মাত্র নাই। বরং শিক্ষাপ্রাপ্ত চাকুরে ছেলে বাটী গেলে পিতামাতার কত সন্তোষ, কত আনন্দ! সহরের অধিকাংশ মিঠাইএর দোকান শূদ্রদের স্থাপিত। তথা হইতে পয়সা দিয়া কত সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ সন্তান প্রতিদিন লুচি, কচুড়ি, আলুরদোম তরকারী ও কত প্রকার ভাজা দ্রব্য কিনিয়া লইয়া আহার করিতেছেন এবং বাসাস্থ পিতামাতা, ভ্রাতা ভগিনী, আত্মীয় স্বজন নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের জন্য লইয়া যাইতেছেন। যাহার যা অভিরুচি সে তাহাই করিতেছে—তাহাই খাইতেছে; যে ভাবে খুসি সেই ভাবে চলাফেরা করিতেছে। সমাজে সমুদয় শাসন অগ্রাহ্য করিয়া অনায়াসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যাইতেছে।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ যেন ইঙ্গিতে বলিয়া দিয়াছে—যার যা খুসি কর, খাও দাও মজা লোট—কেবল কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে—নিতান্ত সুশীল, সুবোধ, ভাল মানুষের মত জবাব দিতে হইবে—'না,—আমি ত করি নাই—আমি ত সেই বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানি না।' বাস্!—তবেই হইয়া গেল। আর কোন গণ্ডগোল নাই—কোন সামাজিক শাসনের অধিকার নাই। কেবল কোনরূপে কষ্টে স্বষ্টে যো সো করিয়া "না" কথাটি বলিতে পারিলেই হইল! এই ত হতভাগ্য হিন্দুসমাজের সমাজ শাসন!

শূদ্রের চিড়া মুড়ি ত এখন ডাল ভাতের মধ্যে গণ্য। সিদ্ধ অন্নও অবাধে প্রচলিত। অথচ এগুলি শাস্ত্রানুযায়ী ব্রাহ্মণের অখাদ্য ও অব্যবহার্য্য! যাঁহারা অত্যন্ত গোঁড়া পণ্ডিত তাঁহারাও স্নাতা, ধৌতবস্ত্র-পরিহিতা, আচারনিষ্ঠা শূদ্রা বিধবার প্রস্তুত চিড়া প্রভৃতি ব্যবহারে দ্বিধা বোধ করেন না। এজন্য কিন্তু সাত দিন ব্রত করার বিধান আছে। তা থাকিলই বা, তাহাতে কি আইসে যায়? এ হইতেছে ব্রাহ্মণের খাওয়া দাওয়ার কথা, এখানে শাস্ত্রের কথা কেন? খাওয়া দাওয়া, টাকা পয়সা, ভোগ বিলাসের কাছে কি শাস্ত্র? এখানে কে শাস্ত্রের বিধি পালন করিয়া কষ্ট পাইতে যাইবে? শাস্ত্র হইতেছে অন্যকে উপদেশ দিবার বেলায়, শূদ্র-শাসনের বেলায়,—শাস্ত্র হইতেছে বিচার বিতর্কের বেলায়, শূদ্রদের নিকট হইতে টাকা পয়সা দক্ষিণা লইবার বেলায়! সকলেই সকল করিতেছে, কেবল বাহিরে একটা নীচ আর্য্যামির আবরণ আছে মাত্র! একটা সুন্দর গল্প আছে। একজন গোঁড়া পুরোহিত ব্রাহ্মণ কার্য্যব্যপদেশে দূরবর্ত্তী কোন স্থানে যাত্রা করেন। সারা দিন হাঁটিয়া পথশ্রমে, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া আশ্রয় অভাবে সায়ংকালে অগত্যা এক হিন্দুমুচিবাড়ী আতিথ্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন। সরল-

হৃদয় ধর্ম্মপরায়ণ মুচি পরম ভক্তিভরে তাঁহার পরিচর্য্যায় রত হইল। চাউল, দাইল, তরকারী প্রভৃতি দিয়া পাকের আয়োজন করিয়া দিতে চাহিল, কিন্তু ব্রাহ্মণের শরীর নিতান্ত ক্লান্ত, শ্রান্ত, অবসন্ন হওয়ায়, বিশেষতঃ মুচিবাড়ী রন্ধন করিয়া আহার করিলে লোকে কি বলিবে, এই আশঙ্কায় রন্ধন করিতে অসম্মত হইলেন এবং জলখাবার কিছু আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। গৃহস্থ বহু অনুসন্ধানে দেড় পোয়া পরিমিত পুরাতন চিড়া আনয়নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের সম্মুখে উপস্থিত করিল। চিড়া ত বহু কষ্টে পাওয়া গেল, এখন উহা খান্ কি দিয়া? দরিদ্র পল্লী, নিকটে দোকান পসার কিছুই নাই, গৃহেও মিষ্ট দ্রব্যের অভাব। ওদিকে ব্রাহ্মণও ক্ষুধায় আকুল, বিলম্ব সহ্য হয় না। ডাকিয়া বলিলেন—'খুঁজিয়া দেখ আর কিছু পাও কি না।' মুচি তখন কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া সাহসে ভর করিয়া করযোড়ে বলিল—'গৃহে কাসুন্দ আছে—প্রভুর আজ্ঞা পাইলে তাহাই দিতে পারি।' ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ কি করেন—এদিক ওদিক তাকাইয়া বলিলেন—'হাঁ নিয়ে এস।'

"লেখা আছে পুথির কোনে।
দোষ নাই কাসুন্দের সনে॥"

বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণগণের শাস্ত্রের প্রতি ত এইরূপ অগাধ বিশ্বাস! এই-রূপ ঘটনা নিত্য ঘটিতেছে। ভিতরে ঘোর মালিন্য, জঘন্য পুতিগন্ধ, বাহিরে লোক দেখান ধর্ম্মাচরণ।

চিকিৎসকের অন্ন ও কুসীদজীবী মহাজনের অন্ন সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। ডাক্তার, কবিরাজ ও মহাজনদের কৃপাভিখারী কে নয়? সমাজে ইঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি অসীম। ধনী দরিদ্র, জমিদার মধ্যবিত্ত, মূর্খ পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই ইঁহাদের দ্বারস্থ। ডাক্তার কবিরাজ ও প্রভূত ধনশালী কুসীদজীবী নিমন্ত্রণ করিলে কোন্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কয়জন

সমাজপতি আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করেন না? অর্থের ক্ষমতায়, উজ্জ্বল টঙ্ক-ঝঙ্কারের নিকট শাস্ত্রের সমুদয় বিধি ব্যবস্থা কম্পবান—স্মৃতি সংহিতা কেঁচো প্রায়, মনু রঘুনন্দন করযোড়ে তটস্থ। যেখানে দারিদ্র্য—দৌর্ব্বল্য—অজ্ঞতা—শক্তিহীনতা, সেইখানেই তাহাদের সিংহতুল্য বিক্রম প্রদর্শন! এই ত সমাজের অবস্থা।

তারপর সুরাপানের কথা। শিশুকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি—"মদ খাওয়া, মহা পাপ, অনন্ত নরক, এমন পাপ আর নাই।" কার্য্যতঃ কিন্তু অন্যরূপ দেখিতাম। অনেককেই তাহাদের মদ্য পানের কথা সগৌরবে ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে শুনিয়াছি—মদ্যপানে যে কত আনন্দ, কত স্ফূর্ত্তি—তাই তাহারা বলিত। তাহাদের কথা শুনিয়া মনে ভাবিতাম, এ বুঝি অশিক্ষিত শূদ্রেরাই খায়, বিদ্বান লোক ও ব্রাহ্মণাদি জাতি বোধ হয় ইহা খায় না। পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সহরে পড়িতে গেলাম। সেখানে যাইয়া যাহা শুনিলাম ও দেখিলাম, তাহাতে অবাক্ হইয়া গেলাম।

যেই দিনই অধিক রাত্রিতে বাহিরে সদর রাস্তায় বাহির হইয়াছি, সেই দিনই মদ্যপায়ীগণের বিকট কোলাহল এবং উচ্চ হাস্য শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি! কে উহারা জানিবার জন্য যখন আর একটু অগ্রসর হইয়াছি, তখনই কতকগুলি পরিচিত মুখ দেখিয়াছি ও অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিয়াছি, ইঁহাদের অধিকাংশই আমাদের প্রতিবাসী এবং আত্মীয়। পদগৌরব এবং বিদ্যাবুদ্ধিতে ইঁহাদের কেহ এম-এ, বি-এল, ; কেহ বি-এল, কেহ বি-এ পাস করিয়া স্কুল শিক্ষক। এবং এইরূপ আরও অনেক পদস্থ ব্যক্তি। ক্রমে অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম সহরের প্রায় চৌদ্দ আনাই ইহাদের দলভুক্ত। শুধু কি এইখানেই পর্য্যবসান, ইহার সঙ্গে বারবণিতার সংমিশ্রণ। সহরে সভাসমিতি প্রায়ই হয়, ছোটবেলা হইতে সভাসমিতিতে যাওয়া একটা রোগ, কাজেই যেখানেই সভা হইত সেইখানেই আমি প্রায়

সকলের আগে যাইয়া উপস্থিত হইতাম। একে একে সভাপতি, বক্তা, প্রবন্ধলেখক ও শ্রোতৃগণ আসিতেন। সভাগৃহ লোকারণ্য হইয়া উঠিত। তারপর প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা হইত। সে প্রবন্ধে, সে বক্তৃতায় কত যে নীতির কথা, কত যে ধর্ম্মের কথা, কত যে সমাজ-সংস্কারের কথা, কত যে দেশ উদ্ধারের কথা বাহির হইত তাহার সংখ্যা নাই। লোকে ধন্য ধন্য করিত, খুব করতালি ধ্বনি করিত। দেখিয়া শুনিয়া আমিত অবাক্! আমার মনে হইত যাহারা নিজেরা মদ্যপায়ী, ব্যভিচারী, চরিত্রহীন, তাহারা সমাজ সংস্কারের কথা কেমন করিয়া বলে? তাহারা লোক শিক্ষা দিতে চায় কোন্ সাহসে? তাহারা দেশের কথা মুখে আনে কেমন করিয়া? মনে হইত, এ সভাসমিতি নয়, পণ্ডশ্রম মাত্র। হতাশ প্রাণে অবসন্ন মনে বাসায় ফিরিতাম। এইরূপ ভাবে দেখিয়া দেখিয়া এখন অনেকটা অভ্যস্থ হইয়া গিয়াছি। সে সব পাপ দৃশ্যে এখন আর হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে না। কত সহরে বাস করিলাম, সর্ব্বত্রই ঐ এক ভাব, এক দৃশ্য। ভদ্রলোক-দের মধ্যে বার আনা—চৌদ্দ আনাই মাতাল ও ব্যভিচারী। তারপর ক্রমে যতই অভিজ্ঞতা বাড়িতে লাগিল এবং অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম ততই গুপ্ত রহস্য ব্যক্ত হইতে লাগিল। ক্রমে জানিতে পারিলাম, শুধু উকীল মোক্তার নহে, শুধু শিক্ষক ও অন্যান্য কর্ম্মচারী নহে, এ অমৃতরূপ মদ্য হলাহল-পানে প্রায় সকলেই অভ্যস্থ। জমিদার, তালুকদার, বড় লোক, বিদ্বান লোক এবং এমন কি সমাজপতি বঙ্গ বিখ্যাত গুরুবংশেও এ হলাহল প্রবেশ করিয়াছে; কুলোপুরোহিতগণ পর্য্যন্ত মদ্যপান আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এ দৃশ্য দেখিবার নয়, এ কথা শুনিবার নয়। মনে হয় ইহারাই কি পরম পবিত্র আর্য্যবংশের কুল-প্রদীপ? মনে হয় ইহারাই কি ঋষিগণ প্রদর্শিত বিধি ব্যবস্থার একমাত্র নায়ক? হায় বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ! ভারত মহাসাগর এখনও তোমাকে স্বীয় গভীর গর্ভে গ্রহণ করেন নাই কেন?

শাস্ত্রে সুরাপায়ী মহাপাতকীর মধ্যে পরিগণিত।

উশনঃ সংহিতা বলেন :—

ব্রহ্মহামদ্যপঃ স্তেনো গুরুতল্পগ এব চ।

মহা পাতকিন স্ত্বেতে যঃ স তৈঃ সহ সংবসেৎ ॥১, ৮ম, অঃ।

"ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, চৌর অর্থাৎ ব্রাহ্মণস্বামিক অশীতি রক্তিকার অনূ্যন সুবর্ণাপহারী, বিমাতৃগামী এবং যে ব্যক্তি ইহাদিগের (অন্যতমের সহিত) সংসর্গ করে সে—ইহারা অর্থাৎ এই পঞ্চবিধ ব্যক্তিগণ মহাপাতকী॥

মনু বলেন :—

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।

মহান্তি পাপকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ ॥৫৫

একাদশ অধ্যায়; মনু সংহিতা।

বিষ্ণু সংহিতা বলিতেছেন :—

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং ব্রাহ্মণসুবর্ণ-হরণং গুরুদার-গমনমিতি মহাপাতকানি ॥১॥

তৎ সংযোগশ্চ ॥২॥ সংবৎসরেণ পততি পতিতেন সহ চরন্ ॥৩॥

একযান ভোজনাশনশয়নৈঃ ॥৪॥ যৌন স্রোবমৌখ সম্বন্ধাৎ সদ্য এব ॥৫॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অত্রি বলেন :—

ব্রহ্মহা প্রথমশ্চৈব দ্বিতীয়ং গুরুতল্পগঃ

তৃতীয়স্তু সুরাযোঽয়ং চতুর্থং স্তেয়মুচ্যতে।

পাপনাশ্চৈব সংসর্গঃ পঞ্চমং পাতকং মহৎ ।১৬৪ অত্রি সংহিতা।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন :—

ব্রহ্মহা মদ্যপঃ স্তেনো গুরুতল্পগ এব চ।

এতে মহাপাতকিনো যশ্চ তৈঃ সহ সংবসেৎ ॥২২৭

তৃতীয় অধ্যায়; যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

গৌতম সংহিতা বলেন :—

ব্রহ্মহঃসুরাপ গুরুতল্পগ মাতৃপিতৃযোনিসম্বন্ধস্তেন নাস্তিক নিন্দিত কর্ম্মাভ্যাসি পতিতাত্যাগ্য পতিতত্যাগিনঃ পাতকসংযোজকাশ্চ তৈশ্চাব্দং সমাচরন্।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

বশিষ্ঠ সংহিতা বলিতেছেন :—

পঞ্চ মহাপাতকান্যাচক্ষতে গুরুতল্পং সুরাপানং ভ্রূণহত্যাং
ব্রাহ্মণসুবর্ণহরণং পতিত-সম্প্রয়োগঞ্চ ব্রাহ্মেণ বা যৌনেন বা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

এই ত গেল সুরাপানরূপ মহাপাতকের কথা। এখন উহার প্রায়শ্চিত্তের কথা উল্লেখ করিব। প্রথমতঃ অজ্ঞানকৃত সুরাপানের প্রায়শ্চিত্তের কথাই শ্রবণ করুন—

ভগবান্ বিষ্ণু বলিতেছেন :—

অশ্বমেধেন শুধ্যেয়ুর্ম্মহাপাতকিনস্ত্বিমে।
পৃথিব্যাং সর্ব্বতীর্থানাং তথানুসরণেন বা ॥৬॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ—বিষ্ণু সংহিতা।

"এই সকল মহাপাতকিগণ, অশ্বমেধ যজ্ঞ বা পৃথিবীস্থ যাবতীয় তীর্থে পর্য্যটন করিলে শুদ্ধ হইতে পারে। ইহা অজ্ঞানকৃত মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত।"

এক্ষণে জ্ঞানকৃত সুরাপানের কথা বলা যাইতেছে :—

সুরাপস্য ব্রাহ্মণ স্যোষ্ণামাসিঞ্চেয়ুঃ সুরামাস্যে মৃতঃশুধ্যেৎ।

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়—গৌতম সংহিতা।

"মদ্যপ ব্রাহ্মণের মুখে উষ্ণ মদ্য নিক্ষেপ করিবে; তাহাতে মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে উহার পাপ ক্ষয় হয়।"

সুরাপস্তু সুরাং তপ্তামগ্নিবর্ণাং পিবেৎ তদা।
নির্দ্দগ্ধকায়ঃ স তয়া মুচ্যতে চ দ্বিজোত্তমঃ ॥১২
গোমূত্রমগ্নিবর্ণং বা গোশকৃদ্‌দ্রবমেব বা।
পয়ো ঘৃতং জলং বাথ মুচ্যতে পাতকাৎ ততঃ ॥১৩

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ—উশনঃ সংহিতা।

সুরাম্বুঘৃত গোমূত্রপয়সামগ্নি সন্নিভম্।
সুরাপোঽন্যতমং পীত্বা মরণাচ্ছুদ্ধিমৃচ্ছতি ॥২৫২॥

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

সর্ব্বশেষে ব্যবস্থাকারের সম্রাট মনুর উক্তি উদ্ধৃত হইতেছে।

মনু সুরাপান সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

সুরাং পীত্বা দ্বিজো মোহাদগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ।
তয়া স্বকায়ে নির্দগ্ধে মুচ্যতে কিল্বিষাত্ততঃ ॥৯১
গোমূত্রমগ্নিবর্ণং বা পিবেদুদকমেব বা।
পয়ো ঘৃতং বা মরণাদ্গোশাকৃদ্রসমেব বা ॥৯২

একাদশঃ অধ্যায়ঃ—মনুসংহিতা।

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জ্ঞানপূর্ব্বক সুরাপান করিলে, ঐ পাপ ক্ষয়ার্থ অগ্নিবর্ণ জলন্ত সুরা পান করিবে; ঐ সুরার দ্বারা শরীর একেবারে দগ্ধ হইলে পর তবে পাপের নিষ্কৃতি হয়।৯১। অগ্নিবর্ণ জলন্ত গোমূত্র বা জল, দুগ্ধ, ঘৃত বা গোময় জল, যতক্ষণ না মৃত্যু হয়, ততক্ষণ পান করিবে। এইরূপে মরিলেই উক্ত পাপের নিষ্কৃতি ॥৯২।"

প্রায় সমুদয় হিন্দুরই বিশ্বাস গোমাংস ভক্ষণ তুল্য আর পাপ নাই, কিন্তু শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, শাস্ত্রকারগণ গোমাংস ভক্ষণও সুরাপান অপেক্ষা অল্প পাতকজনক বলিয়াছেন।

ভগবান্ বিষ্ণু বলিতেছেন :—

অভক্ষ্যেণ ব্রাহ্মণ দূষয়িতা ষোড়শ সুবর্ণান্॥৯৭॥

জাত্যপহারিণা শতম্॥৯৮॥ সুরয়া বধ্যঃ॥৯৯

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ—বিষ্ণুসংহিতা।

"অভক্ষ্য দ্বারা ব্রাহ্মণকে দূষিত করিলে, ষোড়শ সুবর্ণ অর্থদণ্ড (অর্থাৎ ভোক্তা ব্রাহ্মণের অজ্ঞাতসারে তাহাকে সামান্য অভক্ষ্য ভোজন করাইলে উক্ত দণ্ড); জাতিনাশক অভক্ষ্য গোমাংসাদি দ্বারা দূষিত করিলে, শত সুবর্ণ অর্থদণ্ড; আর সুরাদ্বারা দূষিত করিলে বধ দণ্ড।"

মহাপাতকিগণের পরিচয় এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত যথাশাস্ত্র উল্লেখিত হইল। এক্ষণে তদপেক্ষা অল্প পাতকী উপপাতকগণের পরিচয় এবং উহার প্রায়শ্চিত্তাদির কথা উল্লেখ করিব।

"গোহত্যা, অযাজ্য যাজন, (শূদ্রযাজন) পরস্ত্রীগমন, * * * বৃদ্ধি দ্বারা জীবিকা; বেতন গ্রহণ করিয়া বেদাধ্যাপন; বেতনগ্রাহী অধ্যাপকের নিকট বেদাধ্যয়ন; রাজাজ্ঞায় সুবর্ণাদি খনিতে কাজ করা; বৃহৎ সেতু প্রভৃতিতে কাজ করা; ওষধি নষ্ট করা; জ্বালানি কাষ্ঠের জন্য অশুষ্ক বৃক্ষের ছেদন; দেবপিত্রাদির উদ্দেশে নয়—পরন্তু আপনার জন্য পাকানুষ্ঠান; লশুনাদি নিন্দিত খাদ্যের ভক্ষণ; সুবর্ণ ব্যতীত অপর দ্রব্যের চুরি, শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ অসৎ শাস্ত্রের আলোচনা; নৃত্যগীত বাদিত্রোপ সেবন; স্ত্রীহত্যা, বৈশ্যহত্যা, শূদ্রহত্যা এবং নাস্তিকতা এই সকলের প্রত্যেককে উপপাতক বলা যায়" (৬০—৬৭ শ্লোক, একাদশ অধ্যায়, অনুবাদ মনুসংহিতা)।

উপপাতকীদের সম্বন্ধে ভগবান্ বিষ্ণু বলিতেছেন :—

গুরুর অলীক-নিন্দা করা, বেদনিন্দা; অধীত-বেদ-বিস্মরণ, অভোজ্যান্ন ভোজন (অর্থাৎ চাণ্ডালাদির অন্নভোজন), অভক্ষ্য-ভক্ষণ (অর্থাৎ লশুনাদি

ণ), পরস্বাপরণ, পরদারগমন, অনুচিত কর্ম্ম (ব্রাহ্মণের পক্ষে বৈশ্য শূদ্রের কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করা) অসৎ প্রতিগ্রহ, ক্ষত্রিয় হত্যা, বৈশ্যহত্যা, শূদ্রহত্যা, গোহত্যা অবিক্রেয় (অর্থাৎ লবণাদির) বিক্রয় * * * দ্রুম গুল্ম লতা ও ওষধির বিনাশন, * * * দেবাদি উদ্দেশ না করিয়া কেবল আপনার জন্য পাকাদি অনুষ্ঠান, দেবঋণ, ঋষিঋণ এবং পিতৃঋণ পরিশোধ না করা, (যজ্ঞাদি দ্বারা দেবঋণ, ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা ঋষিঋণ ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে হয়), চার্ব্বাকাদি অসৎ শাস্ত্র চর্চ্চা, নাস্তিকতা, নীচবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ * * * এই সকল উপপাতক। এই সকল উপপাতকী মনুষ্যবৃন্দ চান্দ্রায়ণ অথবা পরাক্‌ব্রত কিম্বা গোমেধযজ্ঞ করিবে। এই প্রায়শ্চিত্তত্রয় স্থানভেদে ব্যবস্থা করিয়া লইবে।" (অনুবাদ—বিষ্ণুসংহিতা, সপ্তত্রিংশ অধ্যায়)।

যাজ্ঞবল্ক্যও ঐ একই কথা বলিতেছেন:—"গোহত্যা * * * সামান্যতঃ চৌর্য্য, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কুশীদোপজীবন, লবণ উৎপন্ন করা, আত্রেয়ী (ঋতুমতী স্ত্রী) ব্যতীত স্ত্রীহত্যা, শূদ্রহত্যা, অদীক্ষিত বৈশ্য-ক্ষত্রিয়হত্যা, নাস্তিকতা, ব্রতলোপ, * * * অপত্য-বিক্রয়, ধান্যহরণ, গবাদি পশু-হরণ, * * * পিতৃব্য-মাতুলাদি বান্ধবাদিকে অকারণ পরিত্যাগ করা * * * তিল ইক্ষু প্রভৃতি দ্রব্যমর্দ্দক যন্ত্র পরিচালিত করা, মৃগয়া প্রভৃতি ব্যসনাসক্তি, শূদ্রসেবা, অপকৃষ্ট ব্যক্তির সহিত মিত্রতা, অনাশ্রমী হইয়া থাকা, পরান্নপুষ্টতা, চার্ব্বাকাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন * * * এই সকলের প্রত্যেকটীই উপপাতক মধ্যে গণ্য। ২৩৪—২৪২। (অনুবাদ—যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা)।

পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা, শূদ্রহত্যা, বৈশ্যহত্যা, অদীক্ষিত ক্ষত্রিয়হত্যা, পরস্ত্রীগমন প্রভৃতি পাপ কার্য্যের অপরাধ অযাজ্য যাজন (শূদ্রযাজন), সুদ খাওয়া, স্বর্ণখনিতে ও বড় পুলে চাকুরি করা,

ক্রমগুল্মলতা ওষধির বিনাশন, জাল দিবার জন্য তাজা গাছ কাটা, দেবতাদির জন্য নহে, পরন্তু নিজের জন্য পাকানুষ্ঠান করা, লবণাদি বিক্রয় করা, শূদ্রসেবা, পেঁয়াজ রসুন খাওয়ার অপরাধ সমান। শাস্ত্রকার না খেপিলে এমন অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিতে পারিতেন না।

পূর্ব্বে মনুসংহিতাদি হইতে মহাপাতকিগণের প্রায়শ্চিত্তের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে উপপাতকিগণের প্রায়শ্চিত্তের কথা উল্লেখিত হইতেছে। উপপাতকিগণের বিস্তৃত তালিকা পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় লিখিয়াছি। গোহত্যা উপপাতকের অন্যতম। শাস্ত্রকার মনু অন্যান্য উপপাতকগণের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা গোহত্যার সমতুল্য বলিয়া লিখিয়াছেন। নিম্নে মনুসংহিতার অনুবাদ প্রদত্ত হইল। "উপপাতকীরা উপপাতক ক্ষয়ের জন্য নিম্নলিখিত এই সকল নানাবিধ ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।১০৮। উপপাতক সংযুক্ত গোহত্যাকারী প্রথম মাসে যবমণ্ড ভক্ষণ করিবে,—মুণ্ডিত শিরা, ছিন্ন শ্মশ্রু এবং গোচর্ম্মে আচ্ছাদিত দেহ হইয়া গরুর গোষ্ঠে বাস করিবে। ১০৯। দ্বিতীয়, তৃতীয়—এই দুই মাস একদিন উপবাসানন্তর দ্বিতীয় দিনের সায়ংকালে কৃত্রিম লবণ-বর্জ্জিত পরিমিত হবিষ্যভোজী হইবে, সংযতেন্দ্রিয় থাকিবে এবং গোমূত্র দ্বারা স্নান করিবে।১১০। মাসত্রয় পর্য্যন্ত দিবাভাগে গাভী সকলের অনুগমন করিবে এবং দণ্ডায়মান থাকিয়া ঐ সকল গাভি-সমুত্থিত ধূলি সেবন করিবে। কণ্ডূয়নাদি দ্বারা গো পরিচর্য্যা করিয়া গাভি-দিগকে প্রণাম করিয়া রাত্রিকালে তথায় বীরাসনে উপবিষ্ট থাকিবে।১১১। গো সকল উত্থিত হইলে উত্থিত হইবে,—গমন করিলে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে,—উপবিষ্ট হইলে স্বয়ং উপবিষ্ট হইবে,—বীতমৎসর ভাবে নিয়ত তাহাদিগের এইরূপ সেবন করিবে।১১২। ব্যাধিত বা চৌর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, পতিত বা পঙ্কমগ্ন হইলে যথাশক্তি সর্ব্বোপায়ে তাহাদিগকে মোচন করিবে।১১৩। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত বা প্রবল

বাত্যা উপস্থিত হইলে, যথাশক্তি গাভী সকলকে রক্ষা না করিয়া কথন আত্মরক্ষা করিবে না ।১১৪। আপনার বা অপরের গৃহে, ক্ষেত্রে বা খলে অর্থাৎ ধান মাড়িবার স্থানে, গাভী শস্য ভক্ষণ করিতেছে, অথবা বৎস্য দুগ্ধ পান করিতেছে দেখিয়া, গৃহপতিকে বলিয়া দিবে না ।১১৫। যে গোহত্যাকারী এই বিধিতে গো-সেবা করে, সে তিন মাসে গোহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে ।১১৫। এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত ব্রত সম্যক আচরিত হইলে একটী বৃষভ এবং দশটী স্ত্রী গবী দক্ষিণা দিবে। যদি উহা না থাকে, তবে যথাসর্ব্বস্ব বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করিবে ।১১৭। * * * অপর উপপাতকী দ্বিজগণ আত্মশুদ্ধির জন্য এইরূপে গোবধ-প্রায়শ্চিত্ত অথবা চান্দ্রায়ণ (১) ব্রত করিবে" ।১১৮।

এই ত গেল উপপাতকের কথা। অন্যান্য পাপ সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলেন :—" * * * অতিশয় দুর্গন্ধ লশুন পুরীষাদি এবং মদ্যের আঘ্রাণ, এই সকলের প্রত্যেকে জাতিভ্রংশকর পাতক।" (২) ইহার প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে মনু বলেন :—

জাতিভ্রংশকরং কর্ম্ম কৃত্বান্যতম মিচ্ছয়া।
চরেৎ সান্তপনং কৃচ্ছ্রং প্রাজাপত্যমনিচ্ছয়া ॥১২৫

মনু সংহিতা ; একাদশ অধ্যায়।

(১) "ত্রিসন্ধ্যায় স্নান করিয়া পৌর্ণমাসীতে পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন করিবে, তৎপরে কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত প্রতিদিন এক এক গ্রাস ভোজন কমাইবে। পরে অমাবস্যায় উপবাস দিয়া শুক্ল প্রতিপদ্‌ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পুনরায় প্রতিদিন এক এক গ্রাসের বৃদ্ধি করিয়া পূর্ণিমাতে পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন করিবে। ইহাকে চান্দ্রায়ণ ব্রত বলে। চান্দ্রায়ণ এক মাস সাধ্য।" অনুবাদ—২১৭ শ্লোক ; একাদশ অধ্যায় ; মনু সংহিতা।

(২) অনুবাদ—৬৮ শ্লোক ; একাদশ অধ্যায় ; মনু সংহিতা। ঐ অষ্টত্রিংশ অধ্যায় ; বিষ্ণু সংহিতা।

"ইচ্ছাপূর্ব্বক জাতিভ্রংশকর পাপ করিয়া সপ্তাহ মধ্যে কৃচ্ছ্র সান্তপন (১) নামক ব্রত করিবে। অজ্ঞানতঃ ঐ পাপ করিলে প্রাজাপত্য ব্রত করিবে।" (২) "গর্দ্দভ, অশ্ব, উষ্ট্র, মৃগ, হস্তী, ছাগ, মেষ, মৎস্য, সর্প ও মহিষের বধ—এ সকলের প্রত্যেককে 'সঙ্করীকরণ পাতক' জানিবে। অর্থাৎ ইহা দ্বারা সঙ্কর জাতিত্ব প্রাপ্তি হয় ।৬৯। নিন্দিত হইতে ধন প্রতিগ্রহ, বাণিজ্য (কুসীদ জীবন, বিষ্ণু সংহিতা) শূদ্রসেবা ও মিথ্যা কথন— এই সকল পাপে পাত্রত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। এজন্য ইহাদিগকে 'অপাত্রীকরণ পাতক' বলে ।৭০। কৃমি, কীট ও পক্ষীর হনন, ফল কাষ্ঠ ও পুষ্পের চুরি এবং অতি যৎসামান্য উপলক্ষে মনোবৈকল্য—এই সকলের প্রত্যেককে 'মলাবহ-পাতক' বলা যায়। ইহাতে চিত্তমল উপস্থিত হয় ।৭১।" (একাদশ অধ্যায়; মনুসংহিতা—অনুবাদ অংশ)

(১) "প্রত্যহ অভ্যাস গোমূত্র, গোময়, দধি, ঘৃত এবং কুশোদক প্রভৃতি দ্বারা মহা সান্তপন অর্থাৎ এক একদিন গো-মূত্রাদির এক একটী দ্রব্য আহার ও একদিন (ছয় দিন অতিবাহিত করিবার পর শেষ সপ্ত দিন) উপবাস, এই সাত দিন-সাধ্য ব্রত সান্তপন (কৃচ্ছ্র-সান্তপন)।" অনুবাদ—১৯।২০ শ্লোক; ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়; বিষ্ণু সংহিতা।

(২) "দ্বিজ প্রাজাপত্য নামক কৃচ্ছ্র আচরণ কালে প্রথম তিন দিবস দিনের বেলায় ভোজন করিবে; পর তিন দিন সায়ংকালে ভোজন করিবে; তার পর তিন দিন অযাচিত ভাবে যখন উপস্থিত হইবে, তখন ভোজন করিবে এবং শেষ তিন দিন উপবাস করিয়া থাকিবে; সুতরাং ঐ ব্রত দ্বাদশ দিন সাধ্য। প্রথম তিন দিন কুক্কুটাণ্ড প্রমাণ ষড়্‌বিংশতি গ্রাস ভোজন, দ্বিতীয় তিন দিন সায়ংকালে দ্বাবিংশতি গ্রাস এবং তৃতীয় দিন চতুর্ব্বিংশতি গ্রাস ভোজন করিবে।" অনুবাদ—মনু সংহিতা; একাদশ অধ্যায়।

ত্র্যহং প্রাতস্ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহমদ্যাদযাচিতম্।

ত্র্যহং পরঞ্চ নাশ্নীয়াৎ প্রাজাপত্যং চরন্ দ্বিজঃ ॥২১২

ইহার প্রায়শ্চিত্তবিধিও কথিত হইতেছে :—

সঙ্করাপাত্র কৃত্যাসু মাসং শোধনমৈন্দবম্।
মলিনী করণীয়েষু তপ্ত স্যাদ্ যাবকৈস্ত্র্যহম্॥১২৬

ঐ

"শঙ্করীকরণ এবং অপাত্রীকরণ পাতক করিয়া একমাস কাল চান্দ্রায়ণ করিবে। এবং মলিনীকরণ পাতক হইলে ত্রিরাত্র যবাগূর ক্বাথ ভোজন করিবে" ।১২৬

* * * * *

* * * "হংস, বক বধে ব্রাহ্মণকে একটী গোদান। * * * ছাগ এবং মেষ বধে একটী বৃষ দান করিবে" ।১৩৭। * * * আমমাংসভোজী ব্যাঘ্রাদি পশু বধে, পয়স্বিনী ধেনু ও অক্রব্যাদ হরিণাদি পশু বধে বৎসতরী দান করিবে" ।১৩৮। * * * যে সকল প্রাণী অন্নাদিতে জন্মায়, গুড়াদি রসে জন্মায় এবং ফলে কিম্বা পুষ্পে জন্মায়—সেই সকল প্রাণিবধে ঘৃতপ্রাশন প্রায়শ্চিত্ত জানিবে।১৪৪। কর্ষণ দ্বারা যে সকল ওষধি জন্মায় এবং যে নীবারাদি বনে আপনা আপনি জন্মায়—উহাদের অকারণ ছেদ করিলে, পাপক্ষয়ার্থ এক দিবস দুগ্ধব্রত হইয়া গরুর অনুগমন করিবে।"

* * * "অভোজ্যদিগের অন্ন ভোজনে; স্ত্রী ও শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে ও অভক্ষ্য মাংস ভক্ষণে সপ্ত দিবারাত্র যবের যাউ পান করিয়া থাকিবে" ।১৫৩।

* * * "শুষ্ক মাংস ও ভূমিজাত ছত্রাক এবং হরিণমাংস কি গর্দ্দভমাংস —এইরূপ সন্দিগ্ধ মাংস এবং সূনা অর্থাৎ পশুবধ স্থান হইতে আনীত মাংস ভক্ষণ করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়" ।১৫৬।

"আত্মশুদ্ধিকামী ব্যক্তির কদাচ প্রতিসিদ্ধ ভোজন করা উচিত নহে। প্রমাদ বশতঃ এরূপ অন্ন ভক্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ বমি করিয়া ফেলিবে

কিম্বা তাহা অসম্ভব হইলে ব্রাহ্মসুর্চ্চলা নামক ওষধির কথিত জল পান করিবে" ।১৬১।

* * * "পতিতের সহিত এক বৎসর পর্য্যন্ত একযানগমন, একাসনোপবেশন এবং একপঙ্‌ক্তিভোজনরূপ সংযম করিলে পতিত হইতে হয়; যাজন, অধ্যাপন এবং যোনি-সংসর্গে সদ্যই পাতিত্য হয়। পরন্ত এক বৎসরে নহে (কারণ উহাতে সদ্যঃ পাতিত্য) ১৮১। যেরূপ পাপীর সহিত সংসর্গ হয়, সংসর্গ শুদ্ধির জন্য সেই পাপীর যে প্রায়শ্চিত্ত, তাহা করিতে হইবে" ।১৮২।

* * * "ব্রাহ্মণ গর্হিত উপায়ে যদি ধন উপার্জ্জন করেন, তবে ঐ ধন দান করিয়া বক্ষ্যমাণ জপ এবং তপস্যা দ্বারা শুদ্ধ হইবেন ।১৯৪। সমাহিত মনে তিন সহস্র সাবিত্রী জপ করিয়া দুগ্ধ পান করতঃ একমাস কাল গোষ্ঠবাসী হইয়া অসৎ প্রতিগ্রহ হইতে মুক্ত হইবেন ।১৯৫। গোষ্ঠ হইতে পুনরাগত, উপবাস কৃশ প্রণত ঐ ব্রাহ্মণকে জ্ঞাতিরা জিজ্ঞাসা করিবেন—সৌম্য! তুমি কি আমাদের সহিত সমান ব্যবহার হইতে চাও' ?১৯৬। তাহাতে যদি ব্রাহ্মণ উত্তর করে যে 'সত্য সত্যই আর আমি অসৎ প্রতিগ্রহ করিব না,' তবে গরুকে ঘাস খাইতে দিবে,—গরুতে যে স্থানে ঘাস খাইবে, সেই তীর্থ স্থানে উহার সহিত 'ব্যবহার করিব' বলিয়া ব্রাহ্মণেরা স্বীকার করিবেন" ।১৯৭।

* * * "বেদোক্ত নিত্য কর্ম্মের অকরণে (যাহার প্রায়শ্চিত্ত বিশেষরূপে কথিত নাই) এবং স্নাতক ব্রতের লোপকরণে অহোরাত্র উপবাসরূপ প্রায়শ্চিত্তও জানিবে" ।২০৪। নিত্য ব্যবহৃত কতকগুলি পাপ বা তথা কথিত কতকগুলি গুরুতর পাপ সম্বন্ধে বিভিন্ন সংহিতাকারগণের মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—

"চাণ্ডালান্নভোজী চতুর্ব্বর্ণের বক্ষ্যমাণ প্রকারে শুদ্ধি; যথা, ব্রাহ্মণ—

চান্দ্রায়ণ; ক্ষত্রিয়—সান্তপন; বৈশ্য—ষড়্‌রাত্র ব্রত ও পঞ্চগব্য ভোজন; এবং শূদ্র—ত্রিরাত্র ব্রত করিয়া যৎকিঞ্চিৎ দান করিলে শুদ্ধ হইবে।” (অত্রিসংহিতা অনুবাদ ১৭২—১৭৩)।

“চণ্ডাল সমীপে বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ ঘটিত কথা বলিলে, তাহার শুদ্ধি চান্দ্রায়ণ দ্বারা হইতে পারে, তাহার আর অন্য কোনরূপে নিষ্কৃতি নাই।” (উশনঃ সংহিতা—২৬১ পৃষ্ঠা, নবম অধ্যায় ৭২ শ্লোক।)

“শূদ্রান্ন জ্ঞানপূর্ব্বক ভোজন করিয়া কৃচ্ছ্‌ত্রয় করিবে।” (আপস্তম্ব-সংহিতা ১৫—নবম অধ্যায়) “যে ব্রহ্মচারী শূদ্রহস্তে আনীত অন্ন কিম্বা পানীয় দ্রব্য ভোজন বা পান করে, সে এক অহোরাত্র উপবাসান্তে পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। পতিত ব্যক্তির নিকট হইতে দ্রব্য গ্রহণ করিলে, সেই দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া বিধিপূর্ব্বক প্রাজাপত্য করিলে শুদ্ধ হইবে।” (৬১ —নবম অধ্যায়, উশনঃ সংহিতা)।

“মূঢ়াত্মা দ্বিজাধম জ্ঞানপূর্ব্বক মহাপাতকী ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া বিনা স্নানে ভোজন করিলে তপ্ত কৃচ্ছ্র (১) ব্রত করিবে।” (৫০—নবম অধ্যায়; উশনঃ সংহিতা অনুবাদ।)

“শলল, বলাকা, হংস, কারণ্ডব, অথবা চক্রবাক ভোজন করিলে দ্বাদশাহ উপবাস করিবে। কপোত, টিট্টিভ, ভাস, শুক, সারস ভক্ষণে দ্বাদশাহ উপবাস করিবে। শিশুমার, মাষ, মৎস্য, মাংস অথবা বরাহ ভোজন করিলে দ্বাদশাহ উপবাস। * * * রোগ বশতঃ মৃত পশু প্রভৃতির মাংস যাহা মাত্র আত্মভক্ষণোদ্দেশে কৃত বৃথা মাংস বা অন্নাদি ভোজন করিলে তৎপাপক্ষয়ার্থ সপ্তাহ গোমূত্র সিদ্ধ যাবকাহার করিবে। কপোত * * কুক্কুট

(১) “তিন দিন উষ্ণ জল, তিন দিন উষ্ণ ঘৃত, তিন দিন উষ্ণ দুধ পান করিবে ও তিন দিন উপবাস করিবে; ইহা তপ্তকৃচ্ছ্র।” “ত্র্যহমুষ্ণাঃ পিবেদপস্ত্র্যহমুষ্ণং ঘৃতং ত্র্যহমুষ্ণং পয়স্ত্র্যহঞ্চ নাশ্নীয়াদেষ তপ্ত কৃচ্ছ্রঃ॥১১। ষটচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ বিষ্ণুসংহিতা।

ভোজন করিলে প্রাজাপত্য করিবে। পলাণ্ডু বা লশুন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে। বার্ত্তাকু (শ্বেত বার্ত্তাকু বা বেগুন) এবং চণ্ডলীর ভোজনে, প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবে। * * * নরভোজনে তপ্তকৃচ্ছ্র করিলে শুদ্ধ হইবে, অলাবু ভোজনে প্রাজাপত্য করিবে। বৃথা অর্থাৎ দেবোদ্দেশ ব্যতিরেক পক্ক কৃসর সংযাব (মোহন ভোগ), পায়স, পিষ্টক ভোজনে তপ্তকৃচ্ছ্র এবং তদুপরি ত্রিরাত্র উপবাস করিলে শুদ্ধিলাভ হইবে।"

* * * "যাহার প্রসব দিন হইতে দশদিন অতিবাহিত হয় নাই তাদৃশ গাভীর দুগ্ধ, মহিষ-দুগ্ধ, অজা-দুগ্ধ, বিবৎসা গাভী প্রভৃতির দুগ্ধ পান করিলে এক পক্ষ গোমূত্র সিদ্ধ যাবক ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। এই সকল দুগ্ধ-বিকার দধি ঘৃত ছানা মাখন প্রভৃতি পান করিলে অথবা অজ্ঞানতঃ ইহা পান করিলে সাত দিন গোমূত্র সিদ্ধ যাবক ভোজী হইয়া থাকিলে পরে বিশুদ্ধ হইবে"। অনুবাদ—উশনঃ সংহিতা, নবম অধ্যায়।)

বিষ্ণুসংহিতার একপঞ্চাশ অধ্যায়ে দেখিতে পাই :—

"সুরাপায়ী ব্যক্তি যজন যাজনাদি সর্ব্বকর্ম্মবর্জ্জিত হইয়া এক বর্ষ কণমাত্র ভোজন করিয়া থাকিবে। মলমদ্য ও সকলের অন্যতম ভোজনে চান্দ্রায়ণ করিবে। লশুন, পলাণ্ডু, গৃঞ্জন (সম্ভবতঃ গাঁজর) এতদ্গন্ধী (অর্থাৎ লশুনাদি গন্ধযুক্ত দ্রব্য) বিড়্ বরাহ, গ্রাম্য কুক্কুট এবং গো (এতদন্যতমের) মাংস ভোজনেও ঐ চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত। গণ (হোটেলাদির অন্ন) ভোজনে ৭ দিন দুগ্ধ পান করিয়া জীবনধারণ করিবে। তক্ষকের (ছুতারের) অন্ন, চর্ম্মকারের অন্ন, কুসীদজীবী, দাম্ভিক, চিকিৎসাজীবী, লুব্ধক, ক্রূর, * * * সুবর্ণকার, শত্রু, পতিত, পিশুন (অসাক্ষাতে পরনিন্দাকারী), মিথ্যাবাদী, ধর্ম্মভ্রষ্ট, সোমবিক্রয়ী, নট, তন্তুবায়, কৃতঘ্ন, রজক, কর্ম্মকার, নিষাদ, বেণুজীবী, লৌহবিক্রয়ী, শৌণ্ডিক, তৈলিক, মত্ত,

ক্রুদ্ধ, আতুর ইহাদের প্রত্যেকের অন্ন, অথবা বৃথা মাংস ভোজন করিলেও ৭ দিন দুগ্ধ আহারে জীবনধারণ করিবে। * * * রোহিত, রাজীব, শকুল ভিন্ন সকল প্রকার মৎস্য ভোজনেই তিন দিন উপবাস করিবে। অপর সকল জলজ প্রাণীর মাংস ভোজনেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। মাংস ও শুষ্ক মাংস ভোজন করিলেও ঐ চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে"। ব্রাহ্মণ শূদ্র আপামর প্রায় সকলেই এখন গো বিক্রয় করিয়া থাকে কিন্তু শাস্ত্রকার গো বিক্রয়ীর জন্য তপ্তকৃচ্ছ ব্রত ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শাস্ত্রকারের মতে—বক, হাঁস, চকা, কপোত, মৎস্য, মাংস ও শূকর ভোজন সমান অপরাধ—প্রায়শ্চিত্ত ১২ দিন উপবাস। কপোত ও কুক্কুট ভোজন, সাদা বেগুন ও লাউ ভোজন তুল্যাপরাধ; দণ্ড প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত। দেবোদ্দেশ্য ব্যতিরেকে প্রস্তুত মোহন ভোগ, পায়স, পিষ্টক ভোজনে তপ্তকৃচ্ছ্র এবং তদুপরি তিন রাত্রি উপবাস। পেঁয়াজ, রসুন এবং এতদ্‌গন্ধযুক্ত দ্রব্যাদি বিড়্‌ বরাহ গ্রাম্য কুক্কুট গোমাংস এবং বধ্যস্থানস্থিত কশাইএর মাংস ভক্ষণ তুল্যাপরাধ, দণ্ড চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত। হোটেলের অন্ন, ছুতার, চামার, সুদখোর মহাজন, ডাক্তার কবিরাজের অন্ন, সুবর্ণকারের অন্ন, মিথ্যাবাদী, ধর্ম্মভ্রষ্ট, তন্তুবায়, রজক, কর্ম্মকার, ব্যাধ, লৌহবিক্রয়ী, শুঁড়ি, তৈলিক প্রভৃতির অন্ন এবং বৃথা মাংস ভোজন—তুল্যাপরাধ। দণ্ড ৭ দিন দুগ্ধ আহারে জীবনধারণ করা। রুই শোল ভিন্ন অন্য সর্ব্ব প্রকার মৎস্য ভোজনে—সকল প্রকার জলজ প্রাণীর মাংস ভক্ষণে তিন দিন উপবাস।

যম বলেন:—সুরা ভিন্ন অপর মদ্য (খার্জ্জুর পানসাদি) পান বা গোমাংস ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণ তপ্তকৃচ্ছ্র করিবে, তাহা হইলেই সেই পাপ বিনষ্ট হইবে।" (১১শ শ্লোক)

বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে সদা অনুষ্ঠিত ও সর্ব্বত্র প্রচলিত প্রায় সমুদয় পাপ

কার্য্যগুলির তালিকা ও উহার প্রায়শ্চিত্ত বিধি উদ্ধৃত হইল। এই মহাপাতক, উপপাতক, সঙ্করীকরণ পাতক, অপাত্রীকরণ এবং মলিনীকরণ পাতকগুলির প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা লিখিত হইল। বাঙ্গলার হিন্দু সমাজপতিগণ এই সমস্ত পাতকীগণকে শাস্ত্রকথিত প্রায়শ্চিত্ত করাইতে পারিতেছেন কি? তাঁহাদের সে ক্ষমতা আছে কি? এ সমুদয় শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত চালাইতে গেলে হিন্দু সমাজ তাহা গ্রহণ করিবে কি? হিন্দু সমাজ গ্রহণ করে বা না করে, আপনারা নিজেরা গ্রহণ করিয়া থাকেন কি? সমাজে জোর করিয়া ব্যবস্থা চালাইতে চান, জোর জবরদস্তি করিয়া বাঙ্গলার হিন্দু সমাজে মনুসংহিতা-কথিত ধর্ম্মবিধি প্রতিষ্ঠা করিতে বাসনা এবং রঘুনন্দনের স্মৃতি চালাইয়া বাঙ্গলাদেশ ধর্ম্মের মহাবন্যায় ভাসাইতে চাহেন, জিজ্ঞাসা করি আপনারা নিজেরা কি শাস্ত্রকথিত বিধি ব্যবস্থা মানিয়া চলেন? শাস্ত্র মানিয়া চলিবার ক্ষমতা রাখেন কি? নিজে না মানিয়া মানাইতে চাহেন, নিজে বিধিমত না চলিয়া অন্যের উপর চালাইতে চাহেন? নিজেরা ধর্ম্ম না করিয়া অন্যকে জোর করিয়া ধার্ম্মিক করিতে চাহেন? ধর্ম্মে তাহা সহিবে কেন? মাথা দিতে পারেন না, মাথা নিতে চাহেন? আদেশ প্রতিপালন করিতে চাহেন না, আদেশ চালাইতে চান? হুকুম তালিম করিতে পারেন না, হুকুম দিতে চাহেন? সেবা করিতে কাতর—নেতা হইতে সাধ? বাঙ্গলা দেশ বলিয়া এত অত্যাচার নীরবে সহ্য হইয়াছে। আর না,—আর আপনাদের জারি জুরি খাটিতেছে না। ইংরাজ রাজত্বে অবাধ বিদ্যা প্রচারে আপনাদের আধিপত্যের এখন মরণ কাল উপস্থিত! এক টুকরা সূতা সম্বল করিয়া গুরুগিরি করিবার সাধ—নেতৃত্ব করিবার আকাঙ্ক্ষা? আপনাদের বাসনাকে ধন্যবাদ! মনে করিয়াছেন এইভাবেই পূর্ব্বপুরুষগণ আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছেন। ভুল, আপনাদের বড় ভুল। তাঁহারা শুধু পৈতা-সর্ব্বস্ব ছিলেন না।

শুধু পৈতাদ্বারা অমিতপরাক্রম ক্ষত্রিয় রাজগণকে করতলগত করিতে পারেন নাই। পৈতার সঙ্গে আরও কিছু ছিল, তাহা অধ্যাত্মবিদ্যা, ধর্ম্ম-বল, স্বার্থত্যাগ, বিশ্বপ্রেম। আকাশের স্থায় তাঁহাদের বুকখানা ছিল, সাগরের স্থায় হৃদয়খানা ছিল—সূর্য্যের স্থায় জগতের কল্যাণকামী আচণ্ডাল সমদৃষ্টি প্রাণখানা ছিল। বায়ুর স্থায় সর্ব্বত্রগ মনখানা ছিল। কত ছিল। সসাগরা ধরিত্রীর কল্যাণ সাধনাই জীবনের চরম সাধনা ছিল। সাধে কি ক্ষত্রিয় রাজা ধনবান্ বৈশ্য দাসের মত পদ সেবা করিত—বাধ্য থাকিত।

আর আপনাদের এখন আছে কি? অমন সব দেবপ্রতিম বিশালহৃদয় মহাপুরুষগণের আশ্রয়ে থাকিয়াই না তাঁহারা পৃথিবীর সম্রাট হইয়াছিলেন? অমন সব ত্রিকালদর্শী তত্ত্বজ্ঞ নেতার নেতৃত্বের ফলেই না ভারতের সম্রাট-গণের এত উন্নতি? অমন সব সমাজ পরিচালকগণের চালনাশক্তিতেই না ভারতের চতুর্ব্বর্ণের অত উন্নতি, ভারতের অত সৌভাগ্য, অত গৌরব? আর আপনারা? আপনাদের কথা আর কি বলিব, যখন আপনাদের স্থায় পাত্রের গলায় ভারত সমাজচতুরাশ্রমসংবদ্ধ হিন্দুসমাজরূপ মুক্তার মালা উঠিল, অমনি ভারতের চির উজ্জ্বল ভাস্কর অবনতির কাল অস্তাচলে চিরতরে ডুবিয়া গেল! মালা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে। যদি কেহ সহানুভূতি বশে ঐ বিচ্ছিন্ন মুক্তাখণ্ডগুলি একত্র করিয়া পুনরায় মালা গাঁথিতে যায় অমনি আপনারা আপনাদের উচ্চ চীৎকার-ধ্বনিতে সে কার্য্যে বাধা দিতে অগ্রসর হইতেছেন। আপনারা রাখিয়াছেন কি? গুরু পুরোহিত পবিত্র স্বর্ণ সিংহাসন ক্রিমি বিষ্ঠায় কলঙ্কিত হইয়াছে, ভারত সমাজরূপ পবিত্র দেবমণ্ডপে পিশাচের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে। সোণার হিন্দুসমাজ ছারখার হইয়া গিয়াছে। আরও কি বাসনা আছে? এত করিয়াও কি সাধ মিটে নাই?

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

এই না গুরুর লক্ষণ ছিল? অখণ্ড মণ্ডলাকার চরাচর বিশ্ব পরিব্যাপ্ত ভগবান্ হরির চরণ-দর্শন-দানের অধিকারী আপনারাই কি বঙ্গের গুরু সম্প্রদায়? চরাচর ব্যাপ্ত প্রেমময় বিশ্বপিতা শ্রীভগবানকে নিজে দেখিয়াছেন কি? নিজে না দেখিলে অন্যকে—শিষ্যকে দেখান কি করিয়া? দেখাইতে পারেন না ত গুরুপূজা গ্রহণ করেন কিরূপে? অধম হইয়া সর্ব্বোত্তম গুরুরূপী নারায়ণের পূজা গ্রহণ করিতে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে না—বুক দুর দুর করিয়া উঠে না? অপরাধ স্মরণ করিয়া বিন্দুমাত্র ভয়ে ভীত হন না? ধন্য আপনাদের হৃদয়কে, ধন্য আপনাদের ব্যবসাকে। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদিত মস্তকে কেমন করিয়া পা উঠাইয়া দেন ভাবিতে পারি না।

আর পুরোহিত! পুরের হিতসাধন ত দূরের কথা, আপনাদের দ্বারা অহিতই সাধন হইতেছে। চরিত্র দোষে নিজেরা ডুবিয়াছেন, সঙ্গ গুণে অন্যকেও ডুবাইতেছেন। আপনাদের প্রাণপণ হিত চেষ্টায় হিন্দুসমাজ চৌদ্দ আনা ডুবিয়াছে। আর কেন? যথেষ্ট হইয়াছে, এখন দয়া করিয়া অবশিষ্টটুকুর লোভ ত্যাগ করুন। এটুকু ডুবাইবার চেষ্টার ত্রুটী হয় নাই, কিন্তু ভগবানের করুণায় একটু বাঁচিয়া আছে। দেবতার প্রিয় লীলাস্থল সহস্র সহস্র ঋষির পদব্রজে পবিত্রীকৃত ভারতে হিন্দু সমাজ বিনষ্ট হইবার নহে। ইহা দ্বারা জগতের অনেক কল্যাণ সাধিত হইবে। তাহার পরিচয় রামমোহন রায়, স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র, মহাত্মা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, স্বামী রামতীর্থ, স্বামী বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, প্রেমানন্দ ভারতী, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ বসু দ্বারা ধরিত্রীর বুধ মণ্ডলী কিঞ্চিৎ অনুভব করিতেছেন! জগতের জ্ঞান ভাণ্ডারে ভারতীয় আর্য্য হিন্দু সমাজের কিছু দিবার আছে।

শুধু পৈতাদ্বারা অমিতপরাক্রম ক্ষত্রিয় রাজগণকে করতলগত করিতে পারেন নাই। পৈতার সঙ্গে আরও কিছু ছিল, তাহা অধ্যাত্মবিদ্যা, ধর্ম্মবল, স্বার্থত্যাগ, বিশ্বপ্রেম। আকাশের ন্যায় তাঁহাদের বুকখানা ছিল, সাগরের ন্যায় হৃদয়খানা ছিল—সূর্য্যের ন্যায় জগতের কল্যাণকামী আচণ্ডাল সমদৃষ্টি প্রাণখানা ছিল। বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্রগ মনখানা ছিল। কত ছিল। সসাগরা ধরিত্রীর কল্যাণ সাধনাই জীবনের চরম সাধনা ছিল। সাধে কি ক্ষত্রিয় রাজা ধনবান্ বৈশ্য দাসের মত পদ সেবা করিত—বাধ্য থাকিত।

আর আপনাদের এখন আছে কি? অমন সব দেবপ্রতিম বিশালহৃদয় মহাপুরুষগণের আশ্রয়ে থাকিয়াই না তাঁহারা পৃথিবীর সম্রাট হইয়াছিলেন? অমন সব ত্রিকালদর্শী তত্ত্বজ্ঞ নেতার নেতৃত্বের ফলেই না ভারতের সম্রাটগণের এত উন্নতি? অমন সব সমাজ পরিচালকগণের চালনাশক্তিতেই না ভারতের চতুর্ব্বর্ণের অত উন্নতি, ভারতের অত সৌভাগ্য, অত গৌরব? আর আপনারা? আপনাদের কথা আর কি বলিব, যখন আপনাদের ন্যায় পাত্রের গলায় ভারত সমাজচতুরাশ্রমসংবদ্ধ হিন্দুসমাজরূপ মুক্তার মালা উঠিল, অমনি ভারতের চির উজ্জ্বল ভাস্কর অবনতির কাল অস্তাচলে চিরতরে ডুবিয়া গেল! মালা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ধুলায় গড়াগড়ি যাইতেছে। যদি কেহ সহানুভূতি বশে ঐ বিচ্ছিন্ন মুক্তাখণ্ডগুলি একত্র করিয়া পুনরায় মালা গাঁথিতে যায় অমনি আপনারা আপনাদের উচ্চ চীৎকারধ্বনিতে সে কার্য্যে বাধা দিতে অগ্রসর হইতেছেন। আপনারা রাখিয়াছেন কি? গুরু পুরোহিত পবিত্র স্বর্ণ সিংহাসন ক্রিমি বিষ্ঠায় কলঙ্কিত হইয়াছে, ভারত সমাজরূপ পবিত্র দেবমণ্ডপে পিশাচের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে। সোণার হিন্দুসমাজ ছারখার হইয়া গিয়াছে। আরও কি বাসনা আছে? এত করিয়াও কি সাধ মিটে নাই?

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

এই না গুরুর লক্ষণ ছিল? অখণ্ড মণ্ডলাকার চরাচর বিশ্ব পরিব্যাপ্ত ভগবান্ হরির চরণ-দর্শন-দানের অধিকারী আপনারাই কি বঙ্গের গুরু সম্প্রদায়? চরাচর ব্যাপ্ত প্রেমময় বিশ্বপিতা শ্রীভগবানকে নিজে দেখিয়াছেন কি? নিজে না দেখিলে অন্যকে—শিষ্যকে দেখান কি করিয়া? দেখাইতে পারেন না ত গুরুপূজা গ্রহণ করেন কিরূপে? অধম হইয়া সর্ব্বোত্তম গুরুরূপী নারায়ণের পূজা গ্রহণ করিতে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে না—বুক দুর দুর করিয়া উঠে না? অপরাধ স্মরণ করিয়া বিন্দুমাত্র ভয়ে ভীত হন না? ধন্য আপনাদের হৃদয়কে, ধন্য আপনাদের ব্যবসাকে। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদিত মস্তকে কেমন করিয়া পা উঠাইয়া দেন ভাবিতে পারি না।

আর পুরোহিত! পুরের হিতসাধন ত দূরের কথা, আপনাদের দ্বারা অহিতই সাধন হইতেছে। চরিত্র দোষে নিজেরা ডুবিয়াছেন, সঙ্গ গুণে অন্যকেও ডুবাইতেছেন। আপনাদের প্রাণপণ হিত চেষ্টায় হিন্দুসমাজ চৌদ্দ আনা ডুবিয়াছে। আর কেন? যথেষ্ট হইয়াছে, এখন দয়া করিয়া অবশিষ্টটুকুর লোভ ত্যাগ করুন। এটুকু ডুবাইবার চেষ্টার ত্রুটী হয় নাই, কিন্তু ভগবানের করুণায় একটু বাঁচিয়া আছে। দেবতার প্রিয় লীলাস্থল সহস্র সহস্র ঋষির পদরজে পবিত্রীকৃত ভারতে হিন্দু সমাজ বিনষ্ট হইবার নহে। ইহা দ্বারা জগতের অনেক কল্যাণ সাধিত হইবে। তাহার পরিচয় রামমোহন রায়, স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র, মহাত্মা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, স্বামী রামতীর্থ, স্বামী বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, প্রেমানন্দ ভারতী, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ বসু দ্বারা ধরিত্রীর বুধ মণ্ডলী কিঞ্চিৎ অনুভব করিতেছেন! জগতের জ্ঞান ভাণ্ডারে ভারতীয় আর্য্য হিন্দু সমাজের কিছু দিবার আছে।

তাই সে এত অত্যাচার, এত বিপ্লব, এত নিপীড়ন সহ্য করিয়া আজিও জীবিত আছে। বর্ত্তমান কালের সমাজপতিরূপ কুচিকিৎসকগণের কুচিকিৎসায় অনবরত বিষ-প্রয়োগে হিন্দু সমাজ মুমূর্ষু দশায় উপনীত হইয়াছে। মরে নাই, বিষ-ক্রিয়ায় হতচেতন হইয়া আছে মাত্র। বর্ত্তমান যুগের কতকগুলি সুচিকিৎসক উহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এখন আশা জন্মিয়াছে, বর্ত্তমান যুগাচার্য্যগণের সুচিকিৎসা বাধা বিঘ্ন, অতিক্রম করিয়া বহুদিন নিয়মিতভাবে চলিলে আবার মৃতপ্রায় হিন্দু সমাজ জাগিবে, উঠিবে, রোগমুক্ত হইয়া মেঘমুক্ত দিবাকরের ন্যায় ভারতগগনে শোভমান হইবে। পুরোহিত,—কি মঙ্গলপ্রদ নাম! শুনিলে কর্ণকুহর শীতল হয়। পুরোহিত কে? "বেদ, ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ, সদ্বংশজাত, সম্পূর্ণাবয়ব-সম্পন্ন, তপোনিষ্ঠ" ব্যক্তিই পুরোহিত। যে সে কি পুরোহিত হইতে পারে? যাকে তাকে কি পুরোহিত নির্ব্বাচন করা উচিত? শাস্ত্রকার পুরোহিত নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বলিতেছেন:—

"বেদেতিহাসধর্ম্মশাস্ত্রার্থকুশলং কুলীনমব্যঙ্গং তপস্বিনং পুরোহিতঞ্চ বরয়েৎ।"

৪১। তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ, বিষ্ণুসংহিতা।

বাঙ্গলা দেশে কোটী কোটী হিন্দু সন্তান কি উপরি লিখিত গুণসম্পন্ন পুরোহিত দ্বারা দৈনন্দিন শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন? বাঙ্গলায় এমন পুরোহিত কয়টী আছে বলিয়া দিবে কি? কেবল যে শাস্ত্র শাস্ত্র করিয়া চীৎকার কর, শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পথে চলিবার তোমাদের ক্ষমতা আছে কি? বর্ত্তমান কালের যাঁহারা পুরোহিত, তাঁহারা পুরোহিত নহেন—পুরোহিত নামের কলঙ্ক। দুই চারি জন ভাল লোক থাকিতে পারেন কিন্তু তাঁহাদের নিকট বিরাট হিন্দু সমাজের কি প্রত্যাশা! এই অযোগ্য শাস্ত্রবিরোধী পুরোহিতগণ দ্বারা কিরূপে ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইতে পারে?

শাস্ত্রসম্মত ক্রিয়াকলাপ—বিবাহ, শ্রাদ্ধ, শান্তি স্বস্ত্যয়ন—অশাস্ত্রীয় পুরোহিত দ্বারা কিরূপে সম্পাদিত হইতে পারে? পবিত্র গঙ্গাজল গোমাংস সংমিশ্রণে কি অপবিত্র হয় না? তোমাদের শাস্ত্রকারই তাহা অনুমোদন করিতেছেন না। তারপর বিবাহ, অন্নপ্রাশন, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, পূজা, শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানের পর ব্রাহ্মণ ভোজনের কথা। দীন হীন দরিদ্র, অধম, ক্ষুৎক্ষাম, জ্যোতির্হীন চক্ষু শূদ্রকে ভোজন করান অপেক্ষা ব্রাহ্মণ-ভোজনই প্রশস্ত ও পুণ্যজনক বলিয়া তোমরা বিশ্বাস কর। তোমাদের ব্যবস্থাপকগণও তোমাদিগকে তাহাই বুঝাইয়াছেন। কিন্তু ক্রিয়া অন্তে তোমরা যে সব ব্রাহ্মণ ভোজন করাও, সে সব ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে ত তোমাদের শাস্ত্র অনুমোদন করিতেছেন না।

ব্যবস্থাশাস্ত্রকার-শ্রেষ্ঠ-মনু বলিতেছেন (তৃতীয় অধ্যায়):—

* * * "এই শ্রাদ্ধে যে যে ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হয়, যে যে ব্রাহ্মণকে পরিতোষ করাইতে হয়, যতগুলি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয় এবং যেরূপ অন্ন দ্বারা ভোজন করাইতে হয় দ্বিজোত্তমগণ! আমি সেই সমুদয় সম্যক্‌রূপে বলিতেছি।১১৪। দৈবকার্য্যে দুই ও পিতৃকার্য্যে তিনজন ব্রাহ্মণ অথবা দেবপক্ষে এক ও পিত্রাদি পক্ষে একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়। সমৃদ্ধিশালী হইলেও ইহা অপেক্ষা বিস্তর ব্রাহ্মণ ভোজনে প্রসক্ত হইবে না। ১২৫। ব্রাহ্মণ বাহুল্য হইলেও তাঁহাদের সেবা, দেশ, কাল শুদ্ধাশুদ্ধি এবং পাত্রাপাত্র বিচার,—এই পাঁচটী সম্বন্ধে কোন নিয়ম থাকে না। এ কারণ ব্রাহ্মণ-বাহুল্য করিতে চেষ্টা করা উচিত নয়।১২৬। * * * পূজ্যতম বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণকে দেব-পিতৃসম্বন্ধীয় হব্য কব্যাদি অন্ন সকল প্রদান করা দাতাগণের উচিত। এইরূপ ব্রাহ্মণে দান করিলে মহাফল জন্মে।১২৮। দ্বিজ, দৈব এবং পিতৃকার্য্যে এক একটী বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন। ইহাতেও তাঁহার পুষ্টতর ফললাভ হইবে; কিন্তু

বেদানভিজ্ঞ বহু ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেও কোন ফল নাই।১২৯। বেদ-পারগ ব্রাহ্মণের অতিদূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান লইবে অর্থাৎ তাঁহার পিতা পিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণেরও কিরূপ আভিজাত্যাদি গুণ তাহা নিরূপণ করিবে। এইরূপ বংশপরম্পরাশুদ্ধ, বেদ-পারগ ব্রাহ্মণ হব্যকব্য বহনে তীর্থ-স্বরূপ। এইরূপ ব্রাহ্মণকে দান করিলে অতিথিকে দানের ন্যায় মহাফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।১৩০। বেদানভিজ্ঞ দশ লক্ষ ব্রাহ্মণ যথায় ভোজন করে, সেই শ্রাদ্ধে বেদবিৎ একজন ব্রাহ্মণও যদি ভোজনাদি দ্বারা প্রীত হন, তাহা হইলে ঐ দশ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল ধর্ম্মতঃ একা ঐ ব্রাহ্মণ দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে।১৩১। জ্ঞানোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণকেই হব্য কব্য প্রদান করা উচিত। রক্তাক্ত হস্ত রক্ত দ্বারা প্রক্ষালিত হইলে কখন শুদ্ধ হয় না। অর্থ এই যে, মূর্খ পাপী লোকদিগকে ভোজন করাইলে পাপ কখন বিদূরিত হয় না।১৩২। অজ্ঞ ব্রাহ্মণ হব্য কব্য যে কয়েকটী গ্রাস ভোজন করেন, মৃত হইলে পর পরলোকে তাঁহাকে ততগুলি উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড ভোজন করিতে হয়।১৩৩। দ্বিজগণের মধ্যে বা কেহ আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, কেহ কেহ তপস্যাপরায়ণ, কেহ কেহ বা তপস্যা ও অধ্যয়ন—উভয় নিষ্ঠ এবং আর কতকগুলি কর্ম্মনিষ্ঠ। ইহার মধ্যে পিতৃলোকের উদ্দেশে যে কব্য, তাহা আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণেই যত্নপূর্ব্বক স্থাপন করিতে হয়; কিন্তু দেব সম্বন্ধীয় হব্য সকল যথান্যায় ঐ চারি প্রকার ব্রাহ্মণকেই দেওয়া যাইতে পারে।১৩৪। * * * শ্রাদ্ধ কার্য্যে মিত্রতা নিবন্ধন ভোজন করাইবে না; ধনান্তর বা কারণান্তর দ্বারা মিত্রের প্রতি মিত্রতা প্রদর্শন করা উচিত। কিন্তু যিনি শত্রুও নহেন, মিত্রও নহেন এমন ব্রাহ্মণকেই শ্রাদ্ধে ভোজন করান কর্ত্তব্য।১৩৮। যাঁহার শ্রাদ্ধ অথবা দৈবকার্য্য মিত্রপ্রধান অর্থাৎ প্রধানতঃ যাঁহার শ্রাদ্ধাদিতে মিত্রগণই ভোজন করেন, তাঁহার সেই কার্য্যে পারলৌকিক কোন ফল নাই।১৩৯। যে মনুষ্য মোহ বশতঃ শ্রাদ্ধ কার্য্য দ্বারা মিত্রতা সম্পাদন করিতে যায়,

শ্রাদ্ধমিত্র দ্বিজাধম কখন স্বর্গ-লাভের অধিকারী হয় না।১৪০। দ্বিজগণ কর্ত্তৃক মিত্রতা-সাধন যে গোষ্ঠী ভোজন, উহাকে ঋষিরা পিশাচ ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। * * * লবণাক্ত ভূমিতে বীজ বপন করিয়া বপনকারী যেমন কোন ফল লাভ করে না, তদ্রূপ অবিদ্বান ব্রাহ্মণকে হবি দান করিয়া দাতা কোন ফল পান না।১৪২। পরন্তু বিদ্বান ব্রাহ্মণকে বিধিবৎ দক্ষিণা দান করিলে দাতা ও প্রতিগৃহিতা—উভয়েই ইহ পর—উভয় লোকেই ফলভাগী হন।১৪৩। * * * শ্রাদ্ধে অতি যত্নের সহিত বেদপারগ ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণকে অথবা সমুদায় শাখাধ্যায়ী যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণকে কিংবা সমাপ্তাধ্যায় সামবেদী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে।১৪৫। এই তিন ব্রাহ্মণের একজনও যাহার শ্রাদ্ধে অর্চ্চিত হইয়া ভোজন করেন, তাঁহার পিত্রাদি সপ্ত পুরুষের চিরস্থায়িনী তৃপ্তিলাভ হয়।১৪৬। হব্য কব্য প্রদানে পূর্ব্বোক্ত শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণগণই মুখ্যকল্প জানিবে। তদভাবে সাধুজনানুষ্ঠিত বক্ষ্যমান অনুকল্প বিধি এই যে, মাতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, শ্বশুর, গুরু, দৌহিত্র, জামাতা, মাতৃস্বস্থ পিতৃস্বস্থপুত্রাদি, বন্ধু, পুরোহিত ও শিষ্য ইহাদিগকে ভোজন করাইবে।১৪৭-১৪৮। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি দৈবক্রিয়ায় ভোজনীয় ব্রাহ্মণগণের তত পরীক্ষা করিবেন না। কিন্তু পিতৃকার্য্যে তাঁহাদিগকে যত্নের সহিত পরীক্ষা করিবেন।১৪৯।

"যে সকল ব্রাহ্মণ পতিত, বেদাধ্যয়ন-শূন্য ব্রহ্মচারী, চর্ম্মরোগগ্রস্ত, দ্যূতক্রীড়াপরায়ণ এবং বহু যাজনশীল ব্রাহ্মণ, ইহাদিগকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না। ১৫১। চিকিৎসক ব্রাহ্মণ, প্রতিমা-পরিচারক দেবল ব্রাহ্মণ, যে সকল ব্রাহ্মণ নিন্দিত—বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, গ্রামের বা রাজার সরকারী ভৃত্য, কুৎসিত নখ রোগ বিশিষ্ট গুরুর প্রতিকুলাচরণকারী, শ্রৌত স্মার্ত্ত অগ্নি পরিত্যাগকারী, কুসীদজীবি, যক্ষ্মারোগী জীবিকার জন্য ছাগ গো প্রভৃতি পশুপালক, * * * পঞ্চ-

মহাযজ্ঞানুষ্ঠান-রহিত, গণার্থ অর্থাৎ সাধারণের জন্য উৎসৃষ্ট মঠ বা ধনাদিজীবী—এই সকল ব্রাহ্মণকে হব্য কব্যে ভোজন করাইবে না।১৫৪। যিনি শূদ্র-শিষ্য, যিনি শূদ্রকে অধ্যয়ন করান, যে সর্ব্বদা নিষ্ঠুর-ভাষী * * * যে ব্রাহ্মণ পিতামাতা বা গুরুগণকে অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছে, যে পতিত লোকের সহিত অধ্যয়ন ও কন্যাদানাদি সম্বন্ধ দ্বারা মিলিত হইয়াছে—যে স্তুতিবাদ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যে পিতার সহিত বিবাদ করে, যে ব্রাহ্মণ মদ্যপায়ী, যে পাপ রোগী, যে অপবাদযুক্ত এবং যে ইক্ষু প্রভৃতির রস বিক্রয় করে তাহারা হব্য কব্য গ্রহণে উপযুক্ত নয়।১৫৯। যাহার অপস্মার রোগ আছে, যাহার গণ্ডমালা আছে, যাহার শ্বেত কুষ্ঠ আছে, যে ব্যক্তি দুর্জ্জন, উন্মত্ত, অন্ধ বা বেদ নিন্দক, নক্ষত্রাদি গণনা দ্বারা যাহার উপজীবিকা, * * * যে ব্রাহ্মণ যুদ্ধের আচার্য্য (দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি) ইহাদিগকে হব্য কব্যে নিমন্ত্রণ করিবে না।১৬২। যে বাস্তবিদ্যাজীবী অর্থাৎ জীবিকার জন্য বাটী নির্ম্মাণাদি করে (ওভারসিয়ার ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি), যে দৌত্য কর্ম্ম করে, যে বেতনভোগী হইয়া বৃক্ষ রোপণ করে, যে ব্রাহ্মণ হিংসাবৃত্তি করে, যে শূদ্রসেবাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে. যে নানাজাতীয় লোকের যাজক, যে ব্রাহ্মণ আচারহীন, ধর্ম্মকার্য্যে নিরুৎসাহ, যে সর্ব্বদা যাচ্ঞা দ্বারা অপরের বিরক্তি জন্মায়, যে স্বয়ংকৃত কৃষি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, ব্যাধির দ্বারা যাহার চরণ স্থূল হইয়াছে এবং সাধুদিগের নিন্দিত, তাহাদিগকে হব্য কব্যে নিমন্ত্রণ করিবে না।১৬৫। * * * এই সকল নিন্দিতাচারী পংক্তি প্রবেশের অযোগ্য দ্বিজাধমদিগকে দ্বিজপ্রবর বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ, দৈব ও পৈত্র্য উভয় কর্ম্মেই পরিত্যাগ করিবেন। তৃণের অগ্নি যেমন শীঘ্র উপশম হইয়া যায়, বেদাধ্যয়নশূন্য ব্রাহ্মণও তদ্রূপ ; তৃণের অগ্নিতে যেমন কেহই ঘৃতাহুতি প্রদান করে না, তদ্রূপ জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণকেও হব্যাদি প্রদান করা উচিত নয়।১৬৮।

দৈব ও পিত্র্যকর্ম্মে অপাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণকে হব্য কব্য প্রদান করিলে, দাতার পরলোকে যে ফলোদয় হয়, তাহা আমি অবশেষে বলিতেছি, শ্রবণ কর।১৬৯। শাস্ত্রাচারবর্জ্জিত, পঙ্‌ক্তিদূষণ প্রভৃতি এবং অপরাপর চৌরাদি দ্বিজগণ কর্ত্তৃক যে হব্য কব্য ভুক্ত হয়, তাহা রাক্ষসেরা ভোজন করে।১৭০। * * * শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ যে যে পঙ্‌ক্তিতে উপবেশন করে, সেই সেই পঙ্‌ক্তিগত শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল হইতে দাতা বঞ্চিত থাকেন।১৭৮। ব্রাহ্মণ বেদবিৎ হইলেও যদি লোভবশতঃ শূদ্রযাজীর নিকট প্রতিগ্রহ করেন, অপক্ক শরাবাদি পাত্রে জল প্রবেশ করিলে তাহা যেমন শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ তিনিও শীঘ্র নষ্ট হইয়া থাকেন। ১৭৯। চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণকে যাহা দেওয়া যায়, তাহা পূয ও শোণিতবৎ ত্যাজ্য; দেবল ব্রাহ্মণকে যাহা দান করা যায়, তাহা নিষ্ফল এবং বৃদ্ধিজীবীকে (সুদখোর) যাহা দেওয়া যায়, তাহা দেবাদি সমীপে স্থান লাভই করিতে পারে না।১৮০। বণিক্-বৃত্তিজীবী * * * দ্বিজকে যে হব্য কব্য দান করা যায়, ইহলোকে বা পরলোকে তাহার কোন ফল হয় না। উহা ভস্মাহুতির ন্যায় নিষ্ফল হইয়া যায়।১৮১। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কথিত অসাধু ও অপরাপর অপাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণকে যে হব্য কব্য প্রদান করা যায়, পণ্ডিতেরা বলেন যে, তাহা মেদ, মাংস, রক্ত, মজ্জা ও অস্থি স্বরূপ।১৮২। আবার যে দ্বিজোত্তমগণ কর্ত্তৃক অপাঙ্‌ক্তেয় তস্করাদি দ্বারা দূষিত পংক্তিও পবিত্র হয়, সেই পংক্তিপাবন দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের কথা সমগ্রভাবে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ১৮৩।

"সমুদায় বেদে যাঁহারা অগ্রগণ্য, সমুদায় বেদাঙ্গেও যাঁহারা সমধিক ব্যুৎপন্ন এবং দশপুরুষ পর্য্যন্ত যাঁহাদের বংশে বেদাধ্যয়নের বিশ্রাম নাই, সেই ব্রাহ্মণগণকেই পঙ্‌ক্তিপাবন বলিয়া জানিবে।১৮৪। যজুর্ব্বেদের প্রখ্যাত ভাগ ত্রিণাচিকেত যিনি ব্রত সহকারে অবলম্বন করিয়াছেন, যিনি

পঞ্চাগ্নিবিশিষ্ট, প্রখ্যাত ত্রিসুপর্ণ যিনি ব্রত সহকারে গ্রহণ করিয়াছেন, ছয়টী বেদাঙ্গে যাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি, যিনি ব্রাহ্ম বিবাহে বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভজাত এবং যিনি সামবেদের আরণ্যক গান করিয়া থাকেন, এই ছয়জন সকলেই পঙ্‌ক্তিপাবন ব্রাহ্মণ।১৮৫। বেদার্থের বেত্তা, বেদার্থের প্রবক্তা, ব্রহ্মচারী, বহু দানশীল, শতবর্ষায়ুস্ক ব্রাহ্মণ—ইহারা সকলেই পঙ্‌ক্তিপাবন বলিয়া জানিবে। শ্রাদ্ধ কর্ম্ম উপস্থিত হইলে তাহার পূর্ব্ব দিনে অথবা শ্রাদ্ধ দিনে ন্যূন সংখ্যায় অন্ততঃ তিনটী পূর্ব্বকথিত ব্রাহ্মণকে যথোচিত সম্মান সহকারে নিমন্ত্রণ করিবে।১৮৭। * * * নিমন্ত্রিত সেই ব্রাহ্মণ-শরীরে পিতৃগণ অদৃশ্যরূপে অনুপ্রবেশ করেন; তাঁহারা যথায় গমন করেন, বায়ু-প্রমাণ পিতৃগণ তাঁহাদের অনুগমন করেন এবং তাঁহারা আসীন হইলে পিতৃগণ উপবিষ্ট হন"।১৮৯।

অত্রি বলেন :—"যাহারা অঙ্গহীন, রোগী, বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, মিথ্যাবাদী, হিংসক, কপটাচারী, আত্মগোপন পূর্ব্বক বেদাভ্যাসকারী সেবাজীবী, কপিলবর্ণ, কাণ, শ্বিত্ররোগী, শীর্ণকেশ (যাহার ঝাঁকড়া চুল) পাণ্ডুরোগী, বৃথাজটাধারী, ভারবাহী, ক্রুদ্ধস্বভাব, দ্বিভার্য্য এবং বৃষলী-পতিকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না। যে ব্যক্তি ভেদকারী (পরস্পরের বন্ধুত্বনাশক) অনেকের পীড়াজনক, অঙ্গহীন বা অধিকাঙ্গ হইবে, তাহাকেও অপনীত করিবে (শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না)।৩৩৮—৩৪০। বহুভোজী, মৎসরী ইহাদিগকে পাত্রীয়ান্ন বা ধনাদি দান করিবে না। ব্রাহ্মণদিগের দুইটী চক্ষু, এক হীন হইলে কাণা, এবং দুই বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইলে অন্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। যাহার শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা, সচ্চরিত্রতা নাই, সেই অন্ধাধমকে শ্রাদ্ধে অন্ন দিবে না। বেদ এবং ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব,—কেবল বেদদ্বারা নহে—ভগবান্ অত্রি ইহা বলিয়াছেন। যিনি যোগজনিত দিব্য-দর্শন প্রভাবে পাদাগ্র নিক্ষেপ

(সৎপথে বিচরণ) করেন এবং লোক ব্যবহার জ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদ ও পুরাণোক্ত বিধি নিষেধ দর্শন করেন, তিনিই উত্তম দৃষ্টিশালী এবং সর্ব্ব-শাস্ত্রজ্ঞ। সর্ব্বদা শ্রুতি স্মৃতিপরায়ণ ব্রতী (নিয়মী) এবং সদ্বংশজাত তাদৃশ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইলে পিতৃলোক চিরস্বর্গবাসী হন। এবংবিধ ব্রাহ্মণে যে সময়ে দীপ্ততেজাঃ (বসু-রুদ্রাদিরূপী) পিতা পিতামহ প্রপিতামহ উদ্দেশে প্রদত্ত অন্নের গ্রাস ভোজন করেন, (পূর্ব্বে) ঐ পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, নরকে থাকিলেও (সেই সময়ে) নরকমুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করেন। এই জন্য শ্রাদ্ধকালে যত্নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের বিচার করিবে"। (অনুবাদ—উনবিংশ সংহিতান্তর্গত অত্রিসংহিতা)

উপরে দৈব ও পৈত্র্যকার্য্যে অপাঙ্‌ক্তেয় অযোগ্য বা পতিত ব্রাহ্মণ-গণের বিস্তৃত তালিকা উদ্ধৃত হইল। শাস্ত্রকার বলিতেছেন, এইরূপ পতিত ব্রাহ্মণ ভোজন নিষ্ফল হয় ও পিতৃপিতামহগণ নরকে গমন করেন। আমরা ত শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রকৃত ব্রাহ্মণ একটীও দেখিতেছি না। প্রত্যেকেই কোন না কোন কার্য্য, আচরণ, ব্যবহার ও ব্যবসায়াদি দ্বারা পতিত—অপাঙ্‌ক্তেয়। কৈ আপনাদের শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণ, কোথায় আপনাদের গুরু পুরোহিত! ইঁহাদের কেহই ত ব্রাহ্মণ নহেন, ইহা আমার কথা নহে, আপনাদেরই শাস্ত্রের কথা। কৈ ব্রাহ্মণ, কোথায় ব্রাহ্মণ? যাহা দেখিতেছি তাহার প্রায় সকলগুলিই ত কেবল নামমাত্র পৈতাসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণ। বেশী দেখিতে চাই না, আপনাদের মনু যাজ্ঞবল্ক্য যম আপস্তম্ব কথিত, আপনাদের বিষ্ণু অত্রি পরাশর ব্যাস নির্দ্দেশিত, আপনাদের সংবর্ত্ত কাত্যায়ন, বৃহস্পতি শঙ্খ, লিখিত দক্ষ, আপনাদের শাতাতপ বশিষ্ঠ উশনঃ অঙ্গিরঃ ব্যবস্থিত একটী, দশকর্ম্মান্বিত একটী পুরোহিত, একটী ব্রাহ্মণের নাম করুন। বেশী নয় একটী, সমগ্র বঙ্গে—সমগ্র ভারতে একটী শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণের নাম করুন। ব্রাহ্মণ,

কৈ ব্রাহ্মণ, কোথায় ব্রাহ্মণ, এ বঙ্গে কোথায় ব্রাহ্মণ? ব্রাহ্মণ নাই। ৪৮ বৎসর, না হউক ২৪ বৎসর, না হউক অন্ততঃ দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচারী বেশে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম গুরুগৃহে অধ্যয়নাদি করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছেন এমন ব্রাহ্মণ এদেশে কেহ আছেন কি? তাই বলিতেছিলাম ব্রাহ্মণ নাই। শাস্ত্র আছে ব্যবস্থা আছে, গুরু আছেন পুরোহিত আছেন, আড়ম্বর আছে বাক্য আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ নাই। বেদ আছে বেদান্ত আছে, পুরাণ আছে সংহিতা আছে, সাঙ্খ্য আছে পাতঞ্জল আছে, মনু আছে স্মৃতি আছে, ব্রাহ্মণ নাই। ব্রত আছে উপবাস আছে, পূজা আছে অর্চ্চনা আছে, মন্ত্র আছে তন্ত্র আছে, ক্রিয়া আছে কর্ম্ম আছে, ব্রাহ্মণ নাই। উপনয়ন আছে যজ্ঞোপবীত আছে, যোগী আছেন যতি আছেন, ব্রহ্মচারী আছেন সন্ন্যাসী আছেন, ধার্ম্মিক আছেন দিব্যদর্শী আছেন, ব্রাহ্মণ নাই। মঠ আছে আশ্রম আছে, ধর্ম্ম আছে পুণ্য আছে, ব্রাহ্মণ নাই। আপনাদেরই হিন্দুশাস্ত্র, আপনাদেরই মনু—স্মৃতি বলিতেছেন ব্রাহ্মণ নাই। আপনাদেরই শাস্ত্র ব্রাহ্মণের যে সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আপনাদেরই ব্যবস্থাকার যাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা দিয়াছেন—তেমন ব্রাহ্মণ—হিন্দুসমাজের এই ঘোর দুর্দ্দিনে তেমন ব্রাহ্মণ একটিও নাই, একটিও থাকিতে পারে না। আপনাদেরই দিবারাত্র কথিত ম্লেচ্ছ (?) অধিকৃত ভূমিতে ব্রাহ্মণ থাকিবে কিরূপে? অর্থের লালসায়, ধনের প্রলোভনে আপনাদেরই ব্যবস্থাদাতা পণ্ডিতগণ যদি ব্রাহ্মণেতর জাতির বেতনভোগী হইয়া কার্য্য করিতে পারেন—তথা কথিত শূদ্রগণের দান গ্রহণ করিতে পারেন, মদ্যপায়ী মহাপাতকীর সংসর্গে মহাপাতক অর্জ্জন করিতে পারেন, অর্থের লোভে শূদ্র শিষ্য শূদ্র যজমান রাখিতে পারেন, পুত্রকে শাস্ত্রবিগর্হিত অসৎশাস্ত্র (?) (ইংরেজী প্রভৃতি) অধ্যয়ন করাইতে পারেন, তবে ধ্বংসোম্মুখ হিন্দু সমাজের এই ঘোর দুর্দ্দিনে—সমাজ ও জাতির মঙ্গলের

জন্য, দেশের স্বার্থ ও কল্যাণের জন্য—জাতিক্ষয় নিবারণের জন্য সর্ব্ব বর্ণের মধ্যে জলচল, আহারাদি, সমুদ্রযাত্রা এবং বালিকা বিধবা বিবাহাদি কি চলিতে পারে না? বোঝার উপর শাকের আঁটিটা কি উঠিতে পারে না, বহিতে পারেন না? মহা মহা পাপ যে ক্ষেত্রে অনায়াসে হজম করিতে পারেন সে ক্ষেত্রে কি এই সব সামান্য অপরাধ হজম করিয়া লইতে পারিবেন না? অর্থের কুহকে ভোগবাসনার মোহে পাপ ইন্দ্রিয় সেবায় যদি ধর্ম্মশাস্ত্র পদদলিত হইতে পারে তবে দেশের কল্যাণের জন্য জাতীয় উন্নতির জন্য হিন্দুজাতিকে মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য কি এক আধটুকু শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ করা যাইতে পারে না? অবশ্য পারা যাইবে—অমন শাস্ত্রাদেশ বঙ্গোপসাগরে ডুবাইয়া দিয়া আমাদিগকে উত্থিত হইতে হইবে। বাঙ্গালাদেশে ছোঁয়াছুঁয়ীর ব্যাপারের বড়ই বাড়াবাড়ি। অমুকে অমুকের হাতে খাইয়াছে ত উহার জাতি গিয়াছে। কায়স্থ সন্তান কি একটা সৎগোপ সন্তান যদি গুণে প্রকৃত ব্রাহ্মণও হয়—এবং ব্রাহ্মণ সন্তান যদি তদভাবে চণ্ডাল অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হয় এবং যদি সেই ব্রাহ্মণের ছেলে ঐ কায়স্থ বা সৎগোপের অন্ন আহার করেন তবেই ব্রাহ্মণ পুঙ্গবের জাতি নষ্ট হইল। আজকালকার সমাজের কর্ত্তারা তাহার উপর খড়্গহস্ত ও তাহাকে সমাজ-চ্যুত করিতে উদ্যত। কিন্তু গুণবিদ্যাহীন, ব্যভিচারী চণ্ডাল অপেক্ষাও হীন ব্রাহ্মণের হস্তে খাইতে কাহারও আপত্তি নাই। এই ত হিন্দুসমাজের অবস্থা। বস্তুতঃ পাপরোগগ্রস্থ চরিত্রহীন অধার্ম্মিক তামসভাবাপন্ন জাতির প্রস্তুত অন্ন সত্যব্রত ধার্ম্মিক সত্বগুণসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ জাতির গ্রাহ্য নহে, তাহাতে স্বাস্থ্য শারীরিক ও মানসিক শক্তি নষ্ট হয়। কিন্তু নামে মাত্র ব্রাহ্মণ এমন চরিত্রহীন কুৎসিত কদাচারী ব্যক্তির অন্নগ্রহণ করিতে বর্ত্তমান সময়ে শাস্ত্র কোনই বাধা প্রদান করিতেছে না। শাস্ত্র বাধা না দিলেও যুক্তি উহা সর্ব্বথা পরিহারযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করে। আহারীয় সামগ্রী প্রিয়, প্রাণতৃপ্তিকর,

হৃদ্য, পরিষ্কৃত এবং স্বাস্থ্যের অনুকূল হওয়ার প্রয়োজন, তাহা না হইলে ব্রাহ্মণতনয়া বা ব্রাহ্মণতনয়ের পাকেও শরীরের শ্রীবৃদ্ধি হইবে না, মনের পুষ্টি জন্মিবে না বরং আরও স্বাস্থ্যহানি হইবে। ঘৃণিত ব্যাধিগ্রস্ত বা পাপী ব্যক্তির স্পর্শে খাদ্যদ্রব্যে অসৎগুণবর্দ্ধক বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চার হইতে পারে। নামে ব্রাহ্মণ ও কর্ম্মে চণ্ডাল এমন এক ব্যক্তি অন্ন স্পর্শ করিলে ক্ষতি নাই, আর নামে ক্ষত্রিয় বা শূদ্র, কায়স্থ বা গোপ, গুণে ব্রাহ্মণ এমন ব্যক্তির স্পৃষ্ট অন্ন অগ্রাহ্য, ইহা শাস্ত্রের আদেশ কিছুতেই হইতে পারে না। ইহা হিন্দু সমাজের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষ-ক্রিয়া মাত্র। আর্য্য শাস্ত্রকারগণ অযৌক্তিক প্রথার প্রশ্রয় দিবেন ইহা কখনই মনে করিতে পারি না। ইহা পরবর্ত্তী যুগের ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্য স্থাপনের অন্যতর চেষ্টার ফলমাত্র। যাহা স্বাস্থ্যের অনুকূল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুপথ্য, এমন খাদ্য সচ্চরিত্র ব্যক্তির দ্বারা প্রস্তুত হইলে তাহা অবশ্য গ্রহণযোগ্য। বংশ গৌরব সেইখানেই গ্রাহ্য যেখানে বংশধর পূর্ব্ববর্ত্তী পিতৃপুরুষের বংশোচিত গুণসম্পন্ন! নতুবা যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে ইচ্ছা করিলে গুণেরই সম্মান ও আদর করিতে হইবে। বংশ গৌরবে সে যতই বড় ও গৌরবান্বিত হউক না কেন, যাহাকে দেখিলে তাহার হাতের খাদ্য গ্রহণ করিতে অপ্রবৃত্তি অনিচ্ছা বা ঘৃণার উদ্রেক হয় তাহার প্রদত্ত বা প্রস্তুত খাদ্য চিকিৎসা-শাস্ত্রমতে স্বাস্থ্যহানিই নহে তাহাতে ধর্ম্মহানিও করিবে। যুক্তিসিদ্ধ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ত্যাগ করিয়া অপর মতে খাদ্য নির্ব্বাচন করিলে তাহা যে মরণ কারণ হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? বৈদিক যুগে খাদ্যগ্রহণ বিষয়ে যে এরূপ আঁটাআঁটী নিয়ম ছিল না তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা প্রতিদিনই দেখিতেছি যে, এমন শত শত ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা মুখে একরূপ মনে অন্য রকম। গোপনে তাঁহারা

যথা ইচ্ছা ভাবে চলিয়া থাকেন—সমাজ তাহা দেখে না, দেখিলেও কিছু বলে না। আমি এমন অনেক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দেখিয়াছি, যাঁহারা প্রকাশ্যে নিম্নজাতীয়া রক্ষিতা নারী রাখিয়াছেন। কেহ বা লজ্জা ও সঙ্কোচের মাথা খাইয়া নিজ বাড়ীতেই পৃথক ঘর করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে আবার অনেকে বেশ্যাসক্ত মদ্যপায়ী। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণের দধি ক্ষীর বাতাসা সন্দেশ চিনি প্রভৃতি কোন কোন দিন বা সম্পূর্ণই প্রণয়িনীর ঘরে উঠে, কোন দিন বা উহার অর্দ্ধভাগ পরিমাণ স্বীয় গৃহে আইসে। গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলে বলেন—"তেমন কিছু ছিল না তবে জলখাবার ও খাবার জন্য যাহা কিছু প্রদত্ত হইয়াছিল ভোজনান্তে উহাই যত্ন করিয়া তুলিয়া খোকা খুকিদের জন্য আনিয়াছি।" এই সমস্ত ব্রাহ্মণের কাহারও পেষা গুরুগিরি, কাহারও যাজনিক, কাহারও বা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতি। যাজনিকগণকে পদ্মাপূজা কালীপূজা দুর্গাপূজাদি করাইতে এবং মেষাদি উৎসর্গ ও বলি দিতে হয় সুতরাং তাঁহাদের অধিকাংশ শক্তিমন্ত্রের উপাসক। মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা মৈথুন পঞ্চমকার-সাধনে তাঁহারাই অনেকেই তৎপর। গুরু ঠাকুর পরম বৈষ্ণব, শিষ্যগিরি ব্যবসা, মাঝে মাঝে ভাগবৎ পাঠ করেন—মুখে ধর্ম্ম কথার বিরাম নাই, মোটা মালা গলায়, হাতে হরিনামের মালা, সর্ব্বাঙ্গে তিলক চন্দনের হরিনামাঙ্কিত ছাপ, শিষ্য ও শিষ্যাগণকে মধুর রস ব্যাখ্যা করিয়া শুনান—পদকীর্ত্তনে ঘন ঘন মূর্চ্ছা যান। অথচ অন্তরে পাপ পরিপূর্ণ, ছাগ-প্রবৃত্তি, ভয়ঙ্কর ব্যভিচারী। নিজে নিম্নজাতীয়া রমণী বা কোথাও শিষ্যা লইয়া ব্যভিচারে প্রমত্ত—পাপ সমুদ্রে নিমজ্জিত, গোপনে অস্পর্শীয়া পাপিষ্ঠার প্রস্তুত খাদ্য ভক্ষণে অভ্যস্ত, নারকী লীলার অভিনেতা অথচ বাহিরে তিনিই—অমুকে ত্রিরাত্রি অশৌচের স্থানে দুই রাত্রি অশৌচ পালন করিয়াছে বলিয়া তাহাকে সমাজচ্যুত করিতেছেন, অমুকের মৃত শিশু পুত্রকে পুতিয়া ফেলার পরিবর্ত্তে দাহ করিয়াছে জন্য

দাহকারীগণকে দণ্ডার্হ করিয়া চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা লিখিয়া দিতেছেন। শুনিয়াছি অমুকে যবনের সংস্পর্শ করিয়াছে, শুনিয়াছি অমুকে যবনান্ন গ্রহণ করিয়াছে, শুনিয়াছি অমুকের পিতার অমুক সাম্বৎসরিক সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ বাদ গিয়াছে, সুতরাং এই সব অহিন্দু ব্যবহারে ও গুরুতর অপরাধে আমি ইহাদিগকে সমাজচ্যুত করিলাম। অমুকে দেশের কল্যাণের নিমিত্ত বিদ্যাচর্চ্চার জন্য সমুদ্রপথে বিদেশে গিয়াছে—তা যাউক, সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রনিষিদ্ধ, অমুককে সমাজচ্যুত করা গেল। গ্রামের সকলে বলিতেছে, অমুক মাঝি হিন্দুর অখাদ্য ঘেড়ে মাছ খাইয়াছে সুতরাং সে পতিত হইল—৮৷১০ টাকা ব্যয় করিয়া যদি প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে তবে উহাকে তোলা যাইতে পারে, ইত্যাদি। একজন লোক মারা গেল—স্বজাতীয়গণ শবদাহ করিয়া আসিল, ইতিমধ্যে একজন শত্রু প্রতিবাসী আসিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে সংবাদ দিল—ঐ মৃত ব্যক্তির পায়ে এক খানা খারাপ ঘা ছিল! আর যাইবে কোথায়, অমনি শববাহক, দাহকারী কাষ্ঠবহনকারী প্রত্যেকের এক একখানি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবার ব্যবস্থা হইয়া গেল। মৃত ব্যক্তির পুত্রেরা দরিদ্র, শ্রাদ্ধই হয় না—তার উপর আবার এতগুলি লোকের প্রায়শ্চিত্তের ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। কেবল কি এইখানেই শেষ, এইরূপ শত শত বিবরণ লেখা যাইতে পারে। ব্যারাম পীড়া নাই, হিন্দু গৃহস্থ সন্ধ্যাবেলা গোয়ালে গরু তুলিয়াছেন, পরদিন প্রভাতে দেখা গেল গরু মরিয়া আছে। আর কি, ব্যবস্থাপক পণ্ডিতের অর্থাগমের দ্বার উন্মুক্ত হইল, ঝন্ ঝন্ করিয়া পাঁতির টাকা পড়িয়া গেল। এমনও জানি ৪।৫ বৎসরের শিশু, নবনীত-কোমল হাত দিয়া সন্ধ্যাবেলা ক্ষুদ্র মৃত্তিকা খণ্ড লইয়া এদিক ওদিক লক্ষ্যশূন্য মনে ঢিল ছুড়িতেছে, ঘটনাক্রমে উহার একখণ্ড নিকটবর্ত্তী একটী বৎসের গাত্র স্পর্শ করিল কিন্তু উহাতে বৎসের কি হইবে? যথাকালে গৃহস্থ অন্যান্য গরুর সহিত বৎসটীকেও

ঘরে তুলিল। পরদিন দেখা গেল, বৎসটী মৃতাবস্থায় মাটিতে পড়িয়া আছে। পাড়ায় সোর গোল পড়িয়া গেল—বৈকাল বেলা ছেলেকে ঢিল ছুড়িতে কে নাকি দেখিয়াছিল, কথা ক্রমশঃই ছড়াইয়া পড়িল ও অবশেষে পণ্ডিত ঠাকুরের কাণে এই কথা গেল। আর কথা কি, অমনি একজন লোক পাঠাইয়া ছেলের পিতাকে ডাকিয়া আনিয়া বলা হইল, তোমার ছেলেই গো-হত্যাকারী। সে শিশু সুতরাং তোমাকে এজন্য প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হইতেছে। আর কত লিখিব, আপনাদের এই সব পণ্ডিত ও সমাজ-পতিগণের ব্যবহারের কথা লিখিতে বসিলে একখানা স্বতন্ত্র দীর্ঘ পুস্তক হইয়া পড়ে। হায়! বঙ্গের সমাজপতিগণ! আপনারাই আবার পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ, ব্রাহ্মণ, বিধি-ব্যবস্থা-দাতা! "নিজের বেলা লীলা খেলা, দোষ লিখেছেন শূদ্রের বেলা,"—আপনারা নিজেরা নরক সমুদ্রে হাবু ডুবু খাইতেছেন, কিন্তু শূদ্রদের মস্তকের উপর যত বিধি-ব্যবস্থা শাস্ত্র-তন্ত্রের গুরুভার চাপাইয়া উহাদিগকে দাবাইয়া রাখিতে কুণ্ঠিত নহেন, উহাদিগকে মাথা তুলিবার সুযোগ দিতেছেন না, হাঁপ ছাড়িবার অবসর দিতেছেন না। কপটতার এই সব মহা মহা পাপের জন্য আজ তাকাইয়া দেখুন—ব্রাহ্মণ জাতির কি শোচনীয় পরিণাম। ঋষির বংশধর আজ গাড়োয়ান মুটে মজুর (উত্তরপশ্চিম প্রদেশে প্রচুর দেখা যায়) দারোয়ান—আদালতের পেয়াদা। এক মুষ্টি অন্নের জন্য কাঙ্গাল বেশে দ্বারে দ্বারে ঘূর্ণ্যমান! এ দৃশ্য—এই শোচনীয় অবস্থা দেখিবার নহে, লিখিয়া বুঝাইবার নহে।

আপনারা ভিতরে ভিতরে যা তা পাপের অভিনয় করিতেছেন আর মুখ মুছিয়া বাহিরে আসিয়া সমাজের শীর্ষস্থান সমাজপতির পবিত্র আসনে উপবেশনপূর্ব্বক শূদ্রদের দণ্ডমুণ্ড বিধান করিতেছেন। বাহিরে কতকগুলি সামাজিক রীতি-নীতি যথাযথ পালন করিতেছেন, কিন্তু হায়! জানেন নাকি বাহিরের রীতিনীতিই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব অটুট রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট?

হইয়াছি। এই সত্য ও ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া আমরা রসাতলে যাইতে বসিয়াছি, অবনতির চরম সীমায় আসিয়া উপনীত হইয়াছি। যেখানে আমি আমার নিজ ইচ্ছামত সত্যের অপলাপ করিতেছি সেখানেও অন্যের কিছু বলিবার অধিকার নাই। কেননা বাহ্যিক নিয়ম রক্ষার কোনই ক্রুটী পরিলক্ষিত হইতেছে না। এখন এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে একটা অন্যায় কার্য্য করিবার পূর্ব্বে আমরা মনে করি "না হয় প্রায়শ্চিত্ত করিব"। প্রায়শ্চিত্তেই সব শেষ হইয়া যায়, এ ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। এই ধারণা দ্বারাই অনুমান করা যায় যে শাস্ত্রোক্ত বিধি নিয়মের উপর আমাদের আদৌ আস্থা নাই। তবে লোকাচার ও সমাজের ভয়ে প্রকাশ্যভাবে সে কথা বলিতে পারিতেছি না। আমি যাহা করি—তুমি তাহা জান, এবং তুমি যাহা কর আমি তাহা জানি, এবং আমাদের উভয়ের কথা সমাজেরও সকলে জানে। আমার কথাও তুমি বল না—তোমার কথাও আমি বলি না এবং আমাদের উভয়ের কথা সমাজ জানিলেও কিছু বলে না। চোরে চোরে মাস্‌তুত ভাই সাজিয়া আমরা পরস্পরের দোষ পরস্পরে ঢাকিয়া লইয়াছি। এইরূপ ভাবে দীর্ঘকালগত আমাদের ব্যষ্টির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ ও পাপ তিল তিল করিয়া পরিবর্দ্ধিত হইয়া বিশাল পর্ব্বতাকার ধারণকরতঃ হিন্দুসমাজরূপ বিরাট সমষ্টির উপর চাপিয়া পড়িয়াছে। সে চাপনে সমাজ-শরীর বিকল অচল অবশ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সোজাভাবে উঠিয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই, নড়ন চড়নের শক্তি নাই,—সে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে।

এই কথায় কথায় প্রায়শ্চিত্ত করা সম্বন্ধে মাননীয় এন্, জি, চন্দ্রভারকর মহোদয় মান্দ্রাজে সমাজ-সংস্কার সমিতির চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিরূপে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বক্তৃতা প্রসঙ্গে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"I have heard many say—'I shall violate a caste-rule and then take *Prayaschitta*". I do not think that

those of us who are sincerely anxious for the welfare and progress of Hindu society—who think that morality is a greater cementing bond of society than anything else—ought to be practised to a theory which teaches men that they have a license to sin freely, for every time they sin they can do penance and pass for sinless men. And a *Prayaschitta* has already become licentious, so to say, for many a sin and many a flagrant departure from the path of Virtue."

এই ত প্রায়শ্চিত্তের অবস্থা। আবার সেই প্রায়শ্চিত্তেরই বা কত রকমারি ভাব। দোষী ব্যক্তি যদি মস্তক মুণ্ডন করে, পূর্ব্বদিন নির্জ্জলা উপবাসী থাকে ত কথিত কয়েক কাহন দণ্ডার্হ হইবে। আর যদি সে একটু বাবুগোছের হয় ও মস্তক মুণ্ডন করিতে অস্বীকৃত হয় তবে তাহাকে নির্দ্দিষ্ট কয়েক কাহনের দ্বিগুণ ব্যয়ে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে এবং দোষী ব্যক্তি যদি আরও উচ্চতর ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়, তবে তাহাকে নির্দ্দিষ্ট কাহনের চতুর্গুণ কাহন ব্যয় করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কিন্তু চতুর্গুণ কাহন ব্যয় করার জন্য তাঁহাকে আর মাথা মুণ্ডন করিতেও হইবে না—উপবাসীও থাকিতে হইবে না। তার পরিবর্ত্তে তার একজন প্রতিনিধি কর্ম্মচারীকে উপবাসী থাকিতে হইবে এবং মস্তক মুণ্ডন করিতে হইবে অর্থাৎ টাকার উপরই প্রায়শ্চিত্তের লঘুত্ব ও গুরুত্ব নির্ভর করিয়া থাকে।

কিন্তু ইহাই কি সত্য? টাকা কি কখন পাপ হইতে মুক্তিদান করিতে সমর্থ? এরূপ হইলে ত রাজা মহারাজা ও জমিদারগণই সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্পাপ! শ্যামকুমার রায় চৌধুরী যেন জমিদার, গরুর মাথায় আঘাত করিয়া একটী গোহত্যা করিয়াছেন, তাঁহার প্রচুর টাকা। রামকুমার দে তাঁহার একজন

বেতনভোগী সামান্য কর্ম্মচারী। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয় ব্যবস্থা করিলেন—এই সজ্ঞানকৃত গোহত্যারূপ মহাপাপের জন্য চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে ও উহাতে ২৫৲ টাকা আন্দাজ ব্যয় করিতে হইবে এবং ইহাতে শ্যামকুমার বাবুকে ২৫৲ টাকা ব্যয়, মাথা মুণ্ডন করিতে এবং উপবাসী থাকিতে হইবে! শ্যামকুমার বাবু বড়লোক—জমিদার, তিনি কি মাথা মুণ্ডন করিতে পারেন? লোকে দেখিয়া বলিবে কি? আর উপবাস! তাঁর কি আর উপবাস করিবার শক্তি আছে? যে অম্লপিত্তের পীড়া, সকালে স্নান করিয়া চারিটী আহার না করিলেই অম্ল উঠে। কাজেই স্থির হইল কর্ম্মচারী রামকুমারই মাথা মুণ্ডন করিবে এবং উপবাসী থাকিবে তবে সেজন্য বাবুর কিছু বেশী টাকা (১০০৲) ব্যয় করিতে হইবে। ২৫৲ দণ্ড কিন্তু মাথা মুণ্ডন না করার জন্য দ্বিগুণ দণ্ড ৫০৲ লাগিল, এবং উপবাস না করার জন্য চতুর্গুণ দণ্ড অর্থাৎ মোট ১০০৲ লাগিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে রামকুমার উপবাসী রহিল, ক্ষৌরকার আসিয়া মাথা মুণ্ডন করিয়া দিয়া গেল—পুরোহিত ঠাকুর মহাশয় প্রায়শ্চিত্ত করাইতে আসিলেন। ওদিকে বাবু সকালে চারিটী আহার করিয়া দিব্য দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রার কোলে গা ঢালিয়া দিলেন। অপরাধ করিল একজন, মাথা মুণ্ডন ও উপবাস করিয়া মরিল আর একজন—এবং ইহাতেই বাবু গোহত্যা জনিত মহাপাতক হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন! বলিহারি হিন্দুসমাজের এবম্বিধ ব্যবস্থা দান করাকে? এ দেখিতেছি "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি সঃ পণ্ডিতঃ"—এর মত অদ্ভুত ঘটনা। একটী ছোট শিশুকে গুরু মহাশয় বলিয়াছিলেন সর্ব্ব প্রাণীকে যে আপনার মত দেখে সেই পণ্ডিত। মাঘ মাস শ্রীপঞ্চমীর দিন পিতা বলিলেন, "খোকা যাও স্নান ক'রে এস, সরস্বতীর পদে অঞ্জলি দিতে হবে"। খোকা পুকুরের ঘাটে স্নান করিতে গেল, মাঘ মাস দারুণ শীত, জল যেন বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে;

অদূরে ঐ খোকাদের বাটীর একটী বাগ্দি বালক চাকর কি করিতেছিল, ঐ বাগ্দি বালককে দেখা মাত্র খোকার গুরুমহাশয়ের শ্লোক মনে পড়িয়া গেল,—তখন তাড়াতাড়ি যাইয়া সে তাহাকে টানিয়া আনিয়া পুকুরে চুবাইয়া হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া দেবী-মণ্ডপের দ্বারের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া পুরোহিত ঠাকুর মহাশয়কে ডাকিয়া বলিল—'ইহারই হাতে ফুল বেলপাতা দিন এবং মন্ত্র পড়ান—এ অঞ্জলি দিলেই আমার অঞ্জলি দেওয়া হইবে, পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয় আমাদের সেদিন উপদেশ দিয়েছিলেন 'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি সঃ পণ্ডিতঃ'।

বাঙ্গলার প্রায়শ্চিত্ত সমস্যাও কি বঙ্কিমবাবুর এই রহস্যময় গল্পের ন্যায় কৌতুকজনক ও হাস্যোদ্দীপক নহে? তবে এই যে ব্যাপার ইহার মূলে স্বার্থসিদ্ধি ভিন্ন অন্য কিছু নাই। কোনরূপে একটী প্রায়শ্চিত্তের যোগাড় করিতে পারিলেই ব্রাহ্মণগণের বেশ দুপয়সা লাভ আছে। তাম্র মূল্যের সমান অর্থ ব্যবস্থাদাতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, পুরোহিত এবং অগ্রদানী পৃথক পৃথক ভাবে প্রাপ্ত হয়েন। অর্থাৎ কথিত পরিমাণ তাম্রের মূল্য ১৲ হইলে পণ্ডিত, পুরোহিত ও অগ্রদানী প্রত্যেকে ১৲ পাইবেন। কাজেই যত টাকা বাড়িবে এ তিনজনের ততই সুবিধা। এই জন্যই শূদ্রের উপর প্রায়শ্চিত্ত দানের এত ঝোঁক ও আগ্রহ। হায় স্বার্থপর সমাজপতিগণ! নিরক্ষর সরলপ্রাণ শূদ্রগণের পরিশ্রমলব্ধ অর্থ কি এমনি করিয়া ধর্ম্মের নামে—শাস্ত্রের নামে শোষণ করিতে হয়?

সমাজপতিগণ! আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি জাতীয় অর্ণবপোতের তলদেশে যে সব বড় বড় ছিদ্র রহিয়াছে উহা বন্ধ না করিয়া আপনারা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র লইয়া অত ব্যস্ত হইয়াছেন কেন,—না, সাহসে কুলায় না বুঝি? খুঁটি নাটি লইয়া ব্যস্ত; কিন্তু বড় বড় দোষগুলি চোখে দেখিতে পান না। রাজ রাজরা হইতে আরম্ভ করিয়া জমিদার

তালুকদার এবং উকীলের মুহুরী ও সামান্য কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত কয়জন আপনাদের রঘুনন্দন মানিয়া চলেন? জানেন না কি শতকরা কতজন লোক মদ্যপায়ী ব্যভিচারী। চিকিৎসক ত সুরাবিক্রেতা ও মাংসবিক্রেতা কসাইর ন্যায় পাপভাগী, তারপর যাহারা প্রকাশ্য ভাবে অর্থ লইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দান করেন, সুদ লইয়া টাকা ধার দেন, যাহারা রক্ষিতা রমণী রাখেন ইহাদের সম্বন্ধে কি বলিতে চাহেন। ব্রাহ্মণগণের ত ম্লেচ্ছ (?) রাজ্যে বাস করার কথা নাই, শূদ্রের দান গ্রহণ করার বিধি নাই; দাসত্ব করা ত ব্রাহ্মণের পক্ষে সম্পূর্ণ অবৈধ। দেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অস্তিত্ব যে স্বীকার করিতে চাহেন না, জিজ্ঞাসা করি ক্ষত্রিয় বৈশ্য ভিন্ন ব্রাহ্মণের চলিবার উপায় কি? এই সব গুরুতর পাতক সম্বন্ধে ত কৈ একটি কথাও শুনিতে পাই না। এই সব অপরাধের জন্য কৈ কাহাকেও ত কোনদিন প্রায়শ্চিত্ত করাইতে এবং প্রায়শ্চিত্ত করিতে দেখিলাম না। কলিকাতা মহানগরীতে এমন শত শত হিন্দু আছেন, যাহারা প্রতিদিন ইংরাজদিগের হোটেলে হিন্দুর অস্পর্শীয় অভক্ষ্য খাদ্যদ্রব্য সকল আহার করিতেছেন। অথচ সমাজে তাহাতে উচ্চবাচ্য নাই, শুধু তাহাই নহে—ইঁহারাই আবার অনেক স্থলে সমাজপতি ও দলপতি বলিয়া পরিচিত। শুধু কি ইহাই, আমরা প্রায় প্রতিদিনই সংবাদপত্রে পাঠ করিতেছি, অমুক সাহেব বাড়ীতে অমুক তারিখে বিরাট ভোজ হইয়া গেল, উহাতে সমাজের কত গণ্যমান্য ব্যক্তি আনন্দের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, বিলাতি খানায় মুখরুচি সম্পাদন করিয়াছেন; ইত্যাদি ইত্যাদি। ইঁহাদের বাটীতে নিয়মিত ভাবে ক্রিয়া কাণ্ড নির্ব্বাহ হইতেছে, নিয়মিত ভাবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আসিতেছেন, খাইতেছেন, বিদায় পাইতেছেন, একটুও উচ্চবাচ্য নাই। ইঁহাদের কি জাতি যাইতে পারে না? না, সেখানে রৌপ্যমুদ্রার চাকচিক্য অধিক। আর শাসনই বা করিবে কে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ত বিষবৃক্ষের

নগেন্দ্র দত্তের ন্যায় রাজা মহারাজা ও জমিদারগণের হস্তের ক্রীড়ণক মাত্র। তাঁহাদের প্রদত্ত বৃত্তি বিদায় প্রভৃতিই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের জীবিকার প্রধান উপায়। হায় হিন্দু সমাজ! হায় রে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত!!

সমাজ শরীরের বড় বড় ব্যাধির দিকে আপনাদের আদৌ দৃষ্টি নাই, দৃষ্টি শুধু তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে। প্রথমতঃ 'Oil your own machine' নিজের চরকায় তৈল দিন, পরে অন্যের ভাবনা ভাবিবেন। পূর্ব্বে নিজেদের ব্রাহ্মণ সমাজের সংস্কার করুন, তারপর অন্যান্য সমাজের উপর আধিপত্য করিতে অগ্রসর হইবেন। শাস্ত্রের কঠিন বিধি কি শুধু নিরীহ শূদ্রদের জন্য? নিজেদের জন্য নহে? নিজেরা শাস্ত্র মানিবেন না, ব্যবস্থা মানিবেন না কিন্তু অন্যকে মানাইবার জন্য জোর জবরদস্তি করিবেন। এ যে দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু অত্যাচারিগণ, আপনারা কি জানেন না অত্যাচারীর অত্যাচার দমনের জন্য উপরে একজন আছেন। তাঁহাকে ফাঁকি দিবার উপায় নাই। সহস্র বৎসরের মহা শিক্ষাতেও কি এ জ্ঞান হয় নাই? আপনাদের অত্যাচারী পূর্ব্বপুরুষগণের মহাপাপের ফলই যে আপনাদের বর্ত্তমান হীনাবস্থার কারণ তাহা কি আজও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই?

"সর্ব্ব শাস্ত্রে পুরাণেষু ব্যাসস্য বচনং ধ্রুবং।
পরোপকারস্তু পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্" ॥

এইটী তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করুন। পাপ বিনা সাজা মিলে কি? আপনারা কি বলিতে চাহেন হিন্দুরা চিরকালই ধার্ম্মিক—চিরকালই ন্যায়-পথবর্ত্তী, কিন্তু ভগবান্ অন্যায়রূপে তাঁহাদিগকে এই কঠোর অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া দুঃখ দিতেছেন? তাঁহার ন্যায়-তৌলদণ্ড সম্বন্ধে অন্যায় দোষারোপ করিবেন না। যতদিন হিন্দুজাতির মধ্যে ন্যায়, সত্যপরায়ণতা, ধর্ম্ম, দয়া প্রভৃতি গুণ ছিল, যতদিন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের মধ্যে পরস্পর গাঢ়

প্রীতি প্রণয় ছিল, যতদিন চারি শ্রেণীর মধ্যে অখণ্ড ভ্রাতৃভাব অক্ষুণ্ণ ছিল—যতদিন প্রাণী মাত্রকে হিন্দুগণ নিজ স্বরূপের প্রতিবিম্ব স্বরূপ অবলোকন করিতেন—ততদিন হিন্দুর সিংহাসন জগতের সর্ব্বোপরি স্থানে সমাসীন ছিল—কিন্তু তার পর—আহা তার পর যখন ন্যায় তুলাদণ্ডের অসত্যের দিক্ কিঞ্চিৎ হেলিয়া পড়িল—অমনি ন্যায়ের প্রতিমূর্ত্তি ভগবান্ ভারতবর্ষকে দুঃখ শোক ও পরাধীনতার ঘনাবর্ত্তে ফেলিয়া দিলেন।

হৃদয়হীন ব্রাহ্মণ মন্ত্রীগণের কুমন্ত্রণাবলে যখন স্বার্থপর পশুবলদৃপ্ত স্নেহমমতাহীন হিন্দুরাজগণ অত্যাচারে নিরীহ প্রজাকুলকে জর্জ্জরিত ও ক্ষত বিক্ষত করিয়া তুলিল, অমনি শ্রীভগবানের ন্যায়ের সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল, অত্যাচারের মধ্য হইতে ভগবানের বরাভয় হস্ত উত্তোলিত হইল, ভগবান্ মুসলমানের হাত ধরিয়া ভারত-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন; ব্রাহ্মণের গর্ব্ব পূর্ব্বেই খর্ব্ব হইয়াছিল এক্ষণে ক্ষত্রিয়ের গর্ব্ব যাহা কিছু ছিল, সেটুকুও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে ভারতবক্ষে মুসলমান প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। ইহাই জগতের স্বাভাবিক নিয়ম। ভগবান্ অনেক সহ্য করেন, কিন্তু প্রকৃতিপুঞ্জের অত্যাচার যখন নিতান্ত দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠে, যখন মানবপুঞ্জ কেবল কোথায় ভগবান্, কোথায় ভগবান্ বলিয়া কাতর ক্রন্দনে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলে, তখন আর তিনি স্থির থাকিতে পারেন না, অমনি মাভৈঃ বাণীতে ভূমণ্ডল কাঁপাইয়া তিনি স্বয়ং মর্ত্তভূমে অবতীর্ণ হন। অত্যাচারীগণের হৃদয়-রক্তে ধরাতল অভিসিক্ত, প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয় গগনে আবার শান্তির বিমল চন্দ্রমা উদিত এবং ধরা আবার সুশীতল হয়।

ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, সামাজিক অত্যাচার যখন নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠে এবং সেই ভীষণ অত্যাচারে নিরীহ নরনারীর প্রাণ যখন পিষিয়া যাইবার উপক্রম হয় তখন সেই দারুণ অবস্থার মধ্য হইতেই উহার প্রতিকার পথ বাহির হইয়া পড়ে। শেষে পদদলিত নিষ্পীড়িত

জনগণের প্রতিহিংসা বহ্নি দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠে এবং ঘোরতর সামাজিক বিপ্লব উপস্থাপিত হয়। এইরূপ সময়ে প্রায়শঃই দেখা যায় এক একজন অসীম প্রতিভাশালী মহাত্মার আবির্ভাব হয়। লক্ষ লক্ষ লোকে যে বিরলে নয়নজল বর্ষণ করিতেছিল, তাহা ইঁহারা দর্শন করেন, সহস্র সহস্র মানব হৃদয়ে যে ক্রোধবহ্নি ধূমায়মান হইতেছিল তাহা ইঁহাদের হৃদয়ে ভয়ানক দাবাগ্নির আকার ধারণ করে, শত শত অন্তঃকরণে যে কামনা জাগিতেছিল তাহা ইঁহাদের প্রাণে পুঞ্জীভূত হয়। ইঁহারা নিপীড়িত পাদদলিত বুভুক্ষিত নিগৃহীত প্রকৃতিপুঞ্জের নেতৃস্বরূপ হইয়া সিংহ গর্জ্জনে জগৎকে কম্পিত করিয়া আবির্ভূত হয়েন, জগতের সমুদয় শক্তিপুঞ্জকে অগ্রাহ্য করিয়া সত্য ও ন্যায়ের বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া দেন এবং বজ্রদৃঢ় করে অত্যাচারীর পাপ-সিংহাসন এক আছাড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেন। ইঁহারা মানবকুলে বীর সদৃশ। রোমীয় পোপদিগের অত্যাচার ও নির্য্যাতন হইতে প্রজাবৃন্দকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইউরোপের বীরবর মার্টিন লুথারের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ফরাসী বিদ্রোহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা এইরূপই দেখিতে পাই। ধনশালীগণের অত্যাচার যখন নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিল; এক পক্ষে ফ্রান্সের দীন দরিদ্র প্রকৃতিপুঞ্জ সামান্য এক মুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে, অপর পক্ষে ধনীগণ নিজেদের অট্টালিকায় বিলাসিনী প্রণয়িনী-গণের সহিত আমোদ আহ্লাদে মত্ত রহিয়াছেন, এক পক্ষে প্রজাকুল ক্ষুধার্ত্ত কুকুরের ন্যায় দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ও অনশন যন্ত্রণায় পথে ঘাটে ছট্‌ফট্ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে, অপর পক্ষে ঐশ্বর্য্য-মদমত্ত ধনিগণ তাঁহাদের দুঃখ দৈন্যের প্রতি বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া বরং অবজ্ঞা-সূচক ভাষায় দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেছেন। এই ভীষণ বৈষম্য ভাব, এই ঘোর দুঃখ দুর্দ্দশা, এই ভয়ানক সামাজিক

অত্যাচার যখন নিতান্ত দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিল তখন আকাশ-মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া ধরিত্রী বিকম্পিত হইয়া ভগবদ্বাণী প্রচারিত হইল "অভ্যুত্থান কর, অভ্যুত্থান কর"। ঠিক এইরূপ ভাবে পরবর্ত্তী আর্য্য সমাজে ঋষি নামধেয় ব্রাহ্মণগণের প্রবল প্রতাপে নিম্নজাতি সকল যখন নির্য্যাতিত হইতে লাগিল, রাজাদের শক্তি পর্য্যন্ত যখন নামমাত্র অবশেষ রহিল, আধ্যাত্মিকাদি সর্ব্বপ্রকার দাসত্বে যখন সাধারণ প্রজাবৃন্দের মনুষ্যত্ব গতপ্রায় হইল, অধিকাংশ প্রকৃতিপুঞ্জ যখন পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইল—তখন ঈশ্বর বজ্রনাদে আদেশ করিলেন "উত্থান কর"; অমনি রাজপুত্র প্রেমাবতার শাক্যসিংহ সত্যের বিমল উজ্জ্বল আলোক হস্তে ধারণ করিয়া ভারতের ঘনান্ধকার মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কে আসিল বলিয়া ভারতময় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সিদ্ধার্থ একদিকে রাজৈশ্বর্য্য পায়ে ঠেলিলেন, অন্য দিকে ব্রাহ্মণগণের আধ্যাত্মিক ক্ষমতার উপর খড়্গাঘাত করিলেন। তিনি সকলকে প্রেমের আহ্বানে ডাকিয়া বলিলেন, "হে পদদলিত নিপীড়িত জাতি সকল. আমার নিকট আগমন কর। আমি তোমাদিগকে আলিঙ্গন দান করিতেছি। আমার ধর্ম্ম আকাশের ন্যায় বিস্তৃত, ইহার নিম্নদেশে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, পুরুষ রমণী, ধনী দরিদ্র, বালক বৃদ্ধ সকলে সমভাবে বাস করিবে"। এই মহাবাণী সর্ব্বত্র ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। সহস্র সহস্র বৎসরের গুরুভার যেন মস্তক হইতে খসিয়া পড়িল। প্রজাবৃন্দের দগ্ধ মরুতুল্য হতাশ প্রাণে আশার অমৃতধারা সিঞ্চিত হইল। মহাপ্রাণ লুথারের অভ্যুদয়ে ইউরোপে যেমন চারিদিকে স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, বুদ্ধের আগমনে ভারতবর্ষেও সেই দশা ঘটিল। বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণগণের প্রভুত্বের প্রতিবাদ করিয়া প্রতিবাদের পন্থা খুলিয়া দিলেন। সেই হইতে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র স্বাধীন চিন্তার প্রবল বন্যা প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল এবং ঐ সঙ্গে ভারত

সমাজ বহুবিধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িল। তার পর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারের দিবস হইতে নিম্নজাতীয় লোকদিগের উন্নতির সূচনা আরম্ভ হইল। দলে দলে নিম্নশ্রেণীর লোক সকল মহামতি বুদ্ধের শরণাপন্ন হইতে লাগিল। ক্রমে শ্রমণ শব্দ ব্রাহ্মণ শব্দের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল। এই স্থানে জাতিভেদের মূলে প্রথম আঘাত পড়িল।

জাতিভেদের উপর দ্বিতীয় আঘাত করিলেন মুসলমান রাজারা। ইঁহারা জাতিভেদ ও পুতুল পূজার অত্যন্ত বিদ্বেষী ছিলেন। ইঁহারা বলিলেন— 'আমরা ব্রাহ্মণ শূদ্র বুঝি না, যে আমাদিগের কার্য্য করিবে আমরা তাহাকেই পুরস্কৃত করিব। ব্রাহ্মণগণ বংশমর্য্যাদায় গর্ব্বিত হইয়া এই সব যবন রাজাদিগের অনেক তফাতে রহিলেন, ওদিকে দলে দলে কায়স্থ ও বৈদ্যগণ এবং নিম্নজাতীয় হিন্দুসন্তানগণ অগ্রসর হইয়া রাজসরকারে প্রবিষ্ট হইতে ও কাজ কর্ম্মের সুবিধার জন্য মুসলমান বাদসাহগণের ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ইহাতে এই হইল যে মুসলমান সহবাসে আসিয়া, তাঁহাদের রাজনীতি চাল চলন দেখিয়া শুনিয়া এবং মুসলমানি সাহিত্যাদি পাঠ করিয়া, অনবরত পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের বিরুদ্ধ কথা শুনিয়া শুনিয়া এই সকল হিন্দু কর্ম্মচারীগণের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা অনেকটা কমিয়া গেল, ব্রাহ্মণেতর জাতির হৃদয় হইতে "ব্রাহ্মণে দেবতা জ্ঞান" ভাব অনেকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। কেবল ইহাই নহে, মুসলমান আগমনের পর কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর জাতিগণের হস্তে প্রচুর ধন সঞ্চয় হইতে লাগিল। ইঁহারা মুসলমান বাদসাহগণের নিকট হইতে সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া জমিদারী লাভ করিতে লাগিলেন। একদিকে এই সমস্ত শূদ্রগণের পদমর্য্যাদা, ধনসম্পত্তি ও প্রভুত্ব বর্দ্ধিত হওয়ায় তাঁহারা সমাজের সর্ব্বে সর্ব্বা হইতে লাগিলেন, অপর দিকে পারশ্য ভাষার বহুল প্রচার ও শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় এবং হিন্দুরাজগণের প্রতাপ খর্ব্ব হওয়ায় সংস্কৃত বিদ্যার চর্চ্চাভাবে

ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণগণ মূর্খ ও শাস্ত্রজ্ঞানহীন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ অর্থসম্পদে সাধারণতই দরিদ্র, সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণগণ বিদ্যাবুদ্ধি-বিহীন হইয়া ব্রাহ্মণেতর জাতীয় কায়স্থ বৈদ্য শূদ্র বৈশ্য প্রভৃতি ধনিগণের বিদায়প্রার্থী ও ভাগোপজীবী হইতে বাধ্য হইলেন। কাজেই তখন তাঁহারা সাধারণকে পরিতুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

"The Brahmins lost the patronage of enlightened Hindu kings, and became more dependent than ever for their living on the gifts of the lower castes .... they had now to please the mob more than ever."

(*Hindu Civilisation under British Rule.*)

ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই আস্তে আস্তে হিন্দুদিগের শাস্ত্রসমূহ অত্যন্ত জটিল ভাব ধারণ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ ক্রমে ক্রমে বিদ্যাচর্চ্চা এবং শাস্ত্রালোচনায় অমনোযোগী হইতে লাগিলেন। কেবল শাস্ত্র কথিত কতিপয় ক্রিয়াকর্ম্মবিধিই তাঁহাদের শিক্ষনীয় বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় হইতেই অনেক ব্রাহ্মণ উপনিষদাদি বেদের জ্ঞান কাণ্ড এবং দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় জলাঞ্জলি দিয়া রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের স্মৃতিই একমাত্র জীবিকোপযোগী করিয়া লইলেন।

এইরূপে হে বঙ্গের সমাজপতি ব্রাহ্মণগণ! আপনাদের দশা মলিন হইয়া আসিল। আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণ শূদ্রগণকে যে ঘৃণা করিয়া বেদবিদ্যার অধিকারলাভে বঞ্চিত করিয়াছিলেন—ইহা তাহারই বিষময় ফল। মানুষ হইয়া মানুষকে যদি অমন করিয়া ঘৃণা না করিতেন তবে কি এই ভারতবর্ষ মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইত? দেশের বার আনাই বৈশ্য শূদ্র, তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যাদানে বঞ্চিত রাখাই ত এ অনর্থ সৃষ্টির একমাত্র মূল! যদি আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ইহাদিগকে নানা বিষয়ে

শিক্ষাদান করিতেন—ভাই বলিয়া সম্বোধন করিতেন ও কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় তাহাদিগকে ভালবাসিতেন, স্নেহ করিতেন, যদি তাহাদের সুখে দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে বৈদেশিক আক্রমণের সময় তাহারা (বৈশ্য শূদ্রেরা) কি কখন দূরে নিশ্চেষ্টমনে দাঁড়াইয়া থাকিত? তাহারা কি ক্ষত্রিয় ভাইদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে বুকের রক্ত দিতে পরাঙ্মুখ হইত? তাহারা কি নিশ্চল নিথর নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বিদেশীর দাসত্বপাশ গলে তুলিয়া লইত? তাই বলিতেছিলাম, আপনাদের দোষেই ভারতের যা কিছু সর্ব্বনাশ সব সাধিত হইয়াছে।

ভগবান্ বুদ্ধ আসিয়া পথভ্রান্ত তোমরা, তোমাদিগকে পথ দেখাইয়া দিয়া গেলেন, অমানিশার অন্ধকার অপসারিত করিয়া দিব্য চাঁদের জ্যোৎস্না উদ্ভাসিত করিয়া দিলেন। "কিন্তু উল্‌টা সমঝিলি রাম"; তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পরেই তোমরা কোথায় তাঁর পথানুসরণ করিয়া চলিবে, তাহা না করিয়া কি না আরও প্রচার করিতে লাগিলে - ও পাষণ্ড নাস্তিক ধর্ম্মধ্বংসী, বেদ লুপ্ত করিতে উহার উৎপত্তি—উহার কথা হিন্দুগণের শোনা উচিত নয়।" তখন ভ্রান্ত হিন্দুরাজগণের হৃদয়ে অল্পে অল্পে এই বিষ প্রবেশ করিতে লাগিল। বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সময় ব্রাহ্মণগণ মূর্খ হিন্দুরাজার সহায়তায় দেশের সর্ব্বত্র পুনরায় বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত যাগ যজ্ঞাদি চালাইতে আরম্ভ করিলেন। কাজেই দেখিতে দেখিতে কতিপয় বৎসরের মধ্যেই বিদ্যাহীন বৈশ্য শূদ্রগণ আবার বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের বেড়াজালের মধ্যে আসিয়া আবদ্ধ হইয়া পড়িল। আবার দেশে নানা প্রকার পীড়ন ও অত্যাচার আরম্ভ হইল। মুসলমানের আগমনে এই অত্যাচারের অনেকটা দমন হইলেও সম্পূর্ণ নিবারিত হইয়াছিল না। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের ভীষণ বৈষম্যানলে ভারত যখন আবার দগ্ধ হইতে লাগিল, যখন নীচজাতি সকল কুক্কুর শৃগালের

ন্যায় আবার ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে বিতাড়িত হইতে লাগিল, যখন ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতি সকল নীচজাতিগণকে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করিতে লাগিল; আবার যখন সমাজের কঠিন শাসনে সমাজবন্ধন কেবল যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠিল; যখন শুষ্ক তার্কিকতায় স্নেহ প্রেম ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলি বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল, তখনই অমনি ঘৃণা বিদ্বেষের তিমিরাবরণ অপসারিত করিয়া—পরম প্রেমাবতার চৈতন্যচন্দ্র শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি মানবকুলের সুখ শান্তি পরিবর্দ্ধনার্থ স্বীয় পারিবারিক সুখ বিসর্জ্জন করিলেন। লক্ষ লক্ষ অনাথ অনাথিনীর নয়ন জল মুছাইবার জন্য প্রিয়তমা পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে শোক-সিন্ধুতে ভাসাইলেন, বিশ্বপ্রেমে জগৎ মাতাইবার জন্য মাতৃসুধা ধারা পরিত্যাগ করিলেন। গৌরাঙ্গের প্রেম সংকীর্ত্তনে বঙ্গভূমি উথলিয়া উঠিল, ভারতবর্ষ প্লাবিত হইল, জগৎ মুগ্ধ হইল। নিদাঘের সূর্য্যরশ্মি-সন্তপ্ত মৃত্তিকায় যেন বারি-বর্ষণ হইল। সেই আহ্বানে সেই সংকীর্ত্তনে হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্মণ শূদ্র, উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র একই সাম্যক্ষেত্রে আসিয়া একই পতাকা তলে দণ্ডায়মান হইল। খোল করতালের মধুর ঝঙ্কারে ভারতবর্ষ আলোড়িত হইয়া উঠিল। গৃহে গৃহে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, দেশে দেশে সঙ্কীর্ত্তন হইতে লাগিল—"আমরা সব এক পিতার সন্তান—এক ভগবানের দাস, আমরা সব ভাই ভাই, আমরা সব ভাই বোন।" মহা সাম্যভাবের মহা বন্যায় ভারতবর্ষ ভাসিয়া গেল। ইহাই ভেদ বৈষম্যে তৃতীয় আঘাত।

যাহাদিগের এক একজনের উৎপত্তিতে সসাগরা ধরিত্রী কৃতার্থ এবং ধন্যা হইয়াছে সেই বুদ্ধ সেই শঙ্কর সেই রামানুজ সেই চৈতন্য একে একে আসিয়া তোমাদের ভ্রান্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক উন্নতির দিব্য পথ দেখাইয়া দিয়া গেলেন, কিন্তু তাহাতেও তোমাদের চক্ষুর অন্ধতা দূর হইল না,

নয়ন উন্মীলিত হইল না। হইবেই বা কেন, বিধাতা তোমাদের অদৃষ্টে যে অনেক দুঃখ লিখিয়াছেন, কার সাধ্য বিধাতার লিপি খণ্ডন করে?

কিন্তু আর অধিক বিলম্ব নাই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তোমাদের শেষ প্রভুত্বটুকু নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায় সমধিক দীপ্তিমান বোধ হইলেও উহার মরণ কাল উপস্থিত! শত চেষ্টা করিলেও আর উহাকে তোমরা সজীব রাখিতে পারিতেছ না। বুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তোমাদের প্রভুত্বের উপর ক্রমাগত যেরূপ আঘাতের উপর আঘাত পড়িতেছে তাহাতে মনে হয় ইহার মরণের আর অধিক বিলম্ব নাই। সামান্য আঘাত নহে,—পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কারকগণের পরেও, মহাত্মা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি আধুনিক সংস্কারকগণ ব্রাহ্মণ-প্রভুত্বের উপর যেরূপ গভীর ও গুরুতর আঘাত দিয়াছেন, (চতুর্থ আঘাত) তাহাতে আমরা উহার মৃত্যু সম্বন্ধে কিছুতেই সন্দিগ্ধচিত্ত হইতে পারিতেছি না। ইহা ভিন্ন স্বামী দয়ানন্দ প্রবর্ত্তিত পঞ্জাবের আর্য্যসমাজ, খ্রীষ্টিয় মিশনারী-সমাজ, থিয়সফি সম্প্রদায়, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতির প্রচারকগণ ইহার উপর দিবারাত্র আঘাত করিতেছেন। বাপ, আর কত সহ্য হইবে। একেই ত ব্রাহ্মণ্যশক্তি হিন্দুরাজার সহায়তা বিনা আজ সহস্র বৎসর অনাহারে অনাদরে জীর্ণা শীর্ণা, তাহাতে আবার হিন্দু ক্ষত্রিয়-শক্তি ও বৈশ্য-শক্তি কর্ত্তৃক পরিপুষ্টিতা-বিরহিত। কাজেই এই সমস্ত সুতীব্র আঘাত মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'র ন্যায় অত্যন্ত সাংঘাতিক হইয়া পড়িয়াছে।

৫ম আঘাত। ইহার উপর ইংরাজ গবর্ণমেন্ট জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। বিদ্যাদানে ব্রাহ্মণ শূদ্রের বিচার নাই। চির পদ নিষ্পেষিত জাতি সকল নানা ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদিতে বিশেষতঃ ইংরাজী ভাষায় লিখিত ইতিহাস গ্রন্থে মানুষের মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বের বিবরণ পাঠ করিতেছে। পুস্তকে নানাদেশের নানা জাতির

স্বাধীনতার সংগ্রাম, মানবজাতির সর্ব্বদেশস্থ সামাজিক ইতিবৃত্ত, পৃথিবীর শৈশব ও পরবর্ত্তী অবস্থা, নানা জাতির সভ্যতার বিবরণাদি পাঠ করিয়া তাহাদের অন্তঃকরণে এক নব ভাব নব আশা জন্মিয়াছে। তাহারা কত রাজ্যের উত্থান পতনের ইতিহাস পাঠ করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের ভ্রমপ্রমাদ বুঝিতে শিখিতেছে। তাহারা শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হইয়া সামাজিক জীবনের এক নূতন রাজ্য স্থাপনের আশা মনে মনে পোষণ করিতেছে। ছুতার, গোয়ালা, সুবর্ণবণিক, মাঝি, সাহা, কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র. বারুই, তিলি, মালি, কামার, কুমারগণ, বিদ্যালয়ে নিজ নিজ সন্তানগণকে বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণ করিতেছেন। ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলের সন্তান একসঙ্গে খেলা করিতেছে ও পরস্পর বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইতেছে। উচ্চশ্রেণীর কথা ছাড়িয়া দিই। তারপর শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া এই সব লাঞ্ছিত নিম্নশ্রেণীর সন্তানগণ কেহ জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী, সবজজ, মুন্সেফ, হাইকোর্টের উকীল, ব্যারিষ্টার, বড় বড় ডাক্তার, মোক্তার, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক, সংবাদ পত্রের সম্পাদক, লেখক, বাগ্মী প্রভৃতি হইতেছেন এবং আপন আপন সমাজের মধ্যে আপনাদের বিদ্যা ও জ্ঞান বিতরণ করিয়া দিতেছেন। ইঁহাদের বাটীতে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি উচ্চবর্ণীয়গণ বিদ্যা অভাবে অদৃষ্টক্রমে বেতনভোগী পরিচারকরূপে পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইতেছে।

ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণীয়গণকে এইরূপ নিম্নতর কার্য্যে ব্যাপৃত ও হীনাবস্থায় দেখিয়া দেখিয়া শূদ্রসন্তানগণের মন হইতে ব্রাহ্মণের প্রতি দেবভাব বহুল পরিমাণে দিন দিন অপসৃত হইতেছে। এখন ব্রাহ্মণকে দেখিবামাত্র তাহারা আর পূর্ব্বের ন্যায় ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে না। ইহাতেও ব্রাহ্মণপ্রাধান্য দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে।

৬ষ্ঠ আঘাত। তারপর পাশ্চাত্য সাহিত্য বিজ্ঞানের চর্চ্চা দেশে যতই প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে, ততই লোকের হৃদয় হইতে সঙ্কীর্ণতা দূরে পলায়ন

করিতেছে। দেশে যতই জ্ঞান বিদ্যার আলোচনা, শিল্প বিজ্ঞানের চর্চ্চা, ইতিহাস পাঠের আগ্রহ, প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের প্রবৃত্তি, বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা বাড়িতেছে—ততই প্রাচীন কুসংস্কারগুলি আস্তে আস্তে মন হইতে অপসারিত হইতেছে। ভগবান্ একজনকে ব্রাহ্মণ, একজনকে শূদ্র করিয়াছেন, এখন একথা একজন বার বৎসরের বালকও বিশ্বাস করে না।

৭ম আঘাত। আর এক কারণে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য নষ্ট হইতেছে। সেটী মুদ্রাযন্ত্রের প্রচার। মুদ্রাযন্ত্র হওয়ায় সমুদয় প্রাচীন শাস্ত্র মুদ্রিত হইয়া স্বল্পমূল্যে দেশের সর্ব্বসাধারণের হস্তে পড়িবার সুযোগ হইয়াছে। শূদ্রগণ এখন অবলীলাক্রমে বেদ বেদান্তের মর্ম্মার্থ পুরাণ সংহিতার দৌড় ভালরূপই বিদিত হইতে পারিতেছে। যে শাস্ত্ররূপ তীক্ষ্ণ শাণিতাস্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণগণ এতকাল শূদ্রগণকে ভয় দেখাইয়া শাসনে রাখিয়াছেন, এবং তাহাদের উপর প্রভুত্ব খাটাইয়াছেন, এক্ষণে উহা ঐ হীনজাতীয় শূদ্রগণের হাতে আসিয়াছে এবং তাহারা সে অস্ত্র কিদৃশ ধারাল বিলক্ষণই বুঝিতে পারিতেছে। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছিলেন—শূদ্রের বেদাধিকার নাই। এখন দেখিতেছি শূদ্র ত দূরের কথা, ম্লেচ্ছগণ (!) বেদের উদ্ধারকর্ত্তা, বেদ সংগ্রহকার—বেদ প্রকাশক।

এই সমুদয় কারণে ব্রাহ্মণপ্রাধান্য দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। সাধারণ শিক্ষা বিস্তৃতিই ইহার তলে ঘুণ হইয়া লাগিয়াছে। সুতরাং ইহার আর বিনষ্ট হইবার অধিক বিলম্ব নাই। শূদ্রগণ মাথা তুলিবার অবসর পাইয়াছে। এই কালস্রোতকে ফিরাইবার শক্তি কাহারও নাই, বৃথা উদ্যম ত্যাগ করুন। পূর্ব্বে নিম্নজাতীয় কেহ ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার চেষ্টা করিলে, ঘৃত অগ্নিবর্ণ করিয়া মুখে ঢালিয়া দিয়া সেই শূদ্রকে বিনষ্ট করা হইত। আর এখন শূদ্র অধ্যাপকগণ ব্রাহ্মণ সন্তানগণকে

ধর্ম্মোপদেশ দান করিতেছেন—ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণসন্তানগণ আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছেন।

বঙ্গীয় সমাজপতিগণ! বড়ই দুঃখ ও ক্ষোভের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আপনারা সময়ের অপ্রতিহত স্রোত আদৌ বুঝিতে পারিতেছেন না। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণাশ্রম বিভাগ, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মনুষ্যকুলের প্রকৃতি,—তাহাদের শক্তি সামর্থ্য, শারীরিক গঠন প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। আপনাদের নিজেদের মধ্যেই না কত পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইতেছে! পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ যাজন, অধ্যয়ন অধ্যাপনা, যোগ তপস্যা, ধ্যান ধারণা, বেদ বেদান্ত চর্চ্চা প্রভৃতি সাত্ত্বিক ক্রিয়াকলাপে সময় অতিবাহিত করিতেন। এখন তাঁহাদের বংশধর আপনারা কি করিতেছেন ভাবিয়া দেখুন দেখি? ব্রাহ্মণনির্দ্দিষ্ট কার্য্যকলাপের কোন একটাও ঠিকভাবে পালন করিবার শক্তি এখন আপনাদের নাই। বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণের সংখ্যা প্রায় সার্দ্ধ এক কোটী, ইহাদের মধ্যে কয়জন শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিয়মে জীবন অতিবাহিত করেন? উত্তরপশ্চিম প্রদেশে শতকরা ২০.২৫ জন ব্রাহ্মণ সন্তান ধর্ম্মচর্চ্চা ও পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন, অবশিষ্টগণ পৌরোহিত্য বা অধ্যয়ন অধ্যাপনা কিছুই করেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ বা যোদ্ধা, কেহ বা দুগ্ধবিক্রেতা, পাচক রাখাল, গাড়োয়ান মুটে জলবাহক গায়ক বাদক নর্ত্তক এবং কেহ বা কুস্তিগীর। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অধিকাংশ ব্রাহ্মণগণ এইরূপ সহস্র কার্য্য সম্পাদন দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। বাঙ্গলা দেশেও এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তাহার কিঞ্চিৎ অভাস পূর্ব্বে দিয়াছি।

শ্রীযুক্ত লালা বৈজনাথও এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিতেছেন:—

"In fact there is no trade in which a Brahman will

not now engage and the statistics of crime of the sea-ports show that there is no crime which he will not commit. What a fall for those, who profess to act as mediators between man and god."

(*Fusion of Sub-castes in India*)

শুধু কি ব্রাহ্মণদিগের অবস্থাই এইরূপ হীন হইয়াছে? তাহা নহে, কালপ্রবাহে ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরও এইরূপ হীনদশা উপস্থিত। ক্ষত্রিয়গণের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাই—পূর্ব্বে যাঁহারা আপন আপন ভুজবলে বীর্য্য ও পরাক্রমে দেশ রক্ষা করিতেন, অগণ্য প্রকৃতিপুঞ্জ শাসন করিতেন, যাঁহারা মণিমাণিক্যমণ্ডিত মুকুট ধারণ করিয়া রাজছত্রশোভিত চারুচামরসেবিত স্বর্ণ সিংহাসনে বসিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, এখন তাঁহাদের কি হীনাবস্থা। সে যুদ্ধ নাই, সে যুদ্ধক্ষেত্র নাই, সে সাহস সে শক্তি সে আত্মবিসর্জ্জন কিছুই নাই। এখন তাহাদের অধিকাংশ কৃষিজীবী। পূর্ব্বকার সে উন্নত চরিত্র বিলুপ্ত হইয়াছে—এখন অনেকেই ইন্দ্রিয়পরায়ণ, হীনমতি এবং অলস। সেই ক্ষত্রিয় জাতির কঙ্কালবশিষ্ট স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ যে এক কোটি রাজপুত এখন ভারতে অধিবসতি করিতেছে তাহাদিগের নৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঝল্লমল্লগণই বাঙ্গলার ঝালমাল ক্ষত্রিয়; কি ছিল আর কি হইয়াছে। লালা বৈজনাথ ক্ষত্রিয়দের সম্বন্ধেও এইরূপ লিখিতেছেন :—

"Now a days they chiefly concern themselves with agriculture or engage in petty quarrels, or pass their time in indolence on debauchery or take to menial occupations".

(*Fusion of Sub-castes in India*)

তুমি আমি রাম শ্যাম এই ২।৪ জন লইয়া সমাজ নহে, দশজনের সমষ্টিই সমাজ। কালের পরিবর্ত্তনে যেমন বহির্জগতের পরিবর্ত্তন হয়—তেমনি সমাজেরও পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। কাল সমাজের অধীন নহে বরং সমাজকেই কালের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়। এইজন্য এক সময়ের রীতিনীতি আচার ব্যবহার আইন কানুন বিধি ব্যবস্থা অন্য সময়ের উপযোগী হয় না,—হইতেও পারে না। সেই স্মরণাতীত সত্যযুগের বৃক্ষ ত্বক্ পরিহিত অরণ্যাচারী পর্ব্বত গুহাবাসী মৃগমাংসভোজী প্রাচীন আর্য্যগণের কথা একবার কল্পনা করুন আর আপনাদের নিজেদের দিকে চাহিয়া দেখুন। কি পরিবর্ত্তন! আকাশ পাতাল প্রভেদ! এখন ভাবিয়া দেখুন যদি কেহ আপনাকে সেই বেশে সেইরূপ খাদ্য ও পানীয় দিয়া সেইরূপ ভূষায় সজ্জিত করিয়া বর্ত্তমানকালের কোন সভ্য জাতির মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করে, তাহা হইলে কি আপনি লজ্জায় সঙ্কোচে মরিয়া যাইবার উপক্রম হন না?

সময়ের পরিবর্ত্তনে সমাজের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—আর সমাজের পরিবর্ত্তনে আপনার আমার এবং আমাদের সকলেই অবস্থা, মতিগতি আকাঙ্ক্ষা কামনা চালচলন প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে।

সত্য যুগের সেই পুণ্য দিনে, সেই সরল শান্ত অকপট সত্যবাদী শুদ্ধচিত্ত হিংসা দ্বেষ অজ্ঞাত ধীর ধর্ম্মপরায়ণ বেদ অধ্যয়নশীল মনীষীবৃন্দের সময়ে যে নিয়মে যে ভাবে সমাজ চলিত, রাজ্য চলিত, জনপদ শাসিত হইত, এখন আর সে নিয়মে চলিতে পারে না। এখন নীবার ধান্যের ষষ্ঠাংশ লইয়াই রাজা অব্যাহতি দেন না, অনায়াসপ্রাপ্য ফলমূলে গিরিনিস্যন্দিনী স্রোতস্বিনীর শীতল স্নিগ্ধ সুস্বাদু সলিলে বৃক্ষ বল্কলে এখন আমাদের আর চলে না। অভাব বোধ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। প্রাচ্য পাশ্চত্য

নানাবিধ বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে সহবাসে আমাদের এই পরিবর্ত্তন। জনসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত জীবন সংগ্রাম দিন দিন কঠোর হইতে কঠোরতর হইতেছে। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে শাস্ত্রসম্মত বিধি ব্যবস্থার মধ্যে থাকিয়া তদনুমোদিত জীবিকোপযোগী ব্যবসায় বিচার সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া চলা প্রত্যেকের পক্ষেই অসম্ভব! মনুসংহিতা মানিয়া চলিয়া পেটের দুই মুষ্টি অন্নের সংস্থান করা একালে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শাস্ত্র মানিয়া চলিলে এখন চলে কই? তাই ব্যবস্থাদাতা সমাজ শিরোমণি মহা মহা পণ্ডিতগণও পেটের দায়ে মনু ও রঘুনন্দনের ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিয়া স্কুল কলেজে বেতনভোগী অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি– ব্রাহ্মণের পক্ষে চাকরি করার বিধি কোন্ সংহিতার কোন্ পৃষ্ঠায় লেখা আছে? আর কোন্ ঋষিই বা শূদ্র প্রতিগ্রাহী ছিলেন? নিজেদের দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করিয়া বিধিব্যবস্থার কঠোর প্রাণঘাতী বন্ধন শিথিল করিয়া দিন। আধ্যাত্মিক ও সামাজিক দাসত্ব হইতে সর্ব্বসাধারণকে অব্যাহিত দান করুন। "* * * * চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতাই জীবন, উন্নতি এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের একমাত্র সহায়। যেখানে তাহা নাই সেই জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী। * * * যে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণী বা বর্ণ বা জাতি বা সম্প্রদায় অপর কোন ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা ও কার্য্যে বাধা দেয় তাহাই পৈশাচিক ভাবাপন্ন এবং পতন অবশ্যম্ভাবী" (১) "স্বাধীনতা না দিলে কোনরূপ উন্নতিই সম্ভবপর নহে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ধর্ম্মচিন্তায় স্বাধীনতা দিয়াছিলেন; তাহাতেই আমাদের এই অপূর্ব্ব ধর্ম্ম দাঁড়াইয়াছে কিন্তু তাঁহারা সমাজের পায়ে অতি গুরু শৃঙ্খল পরাইলেন। আমাদের সমাজ, দু'চার কথায় বলিতে গেলে, ভয়াবহ পৈশাচিকতাপূর্ণ। পাশ্চাত্য দেশে সমাজ চিরকাল স্বাধীনতা সম্ভোগ

(১) উদ্বোধন, ৪র্থ সংখ্যা, ৬ষ্ঠ বৎসর, ১৩১০।

করিয়াছে—তাহাদের সমাজের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখ। আবার অপরদিকে তাহাদের ধর্ম্ম কিরূপ, তাহার দিকেও দৃষ্টিপাত করিও।" * * * "ভারতের আধ্যাত্মিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিলেও ভারতে এক লক্ষ নরনারীর অধিক যথার্থ ধার্ম্মিক লোক নাই, ইহা মানিতেই হইবে। এই মুষ্টিমেয় উন্নতির জন্য ভারতের ত্রিশ কোটি লোককে অসভ্য অবস্থায় থাকিতে হইবে এবং না খাইয়া মরিতে হইবে?" * * * "পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার এক বিন্দুও যাহাতে না থাকে তাহা করিতে হইবে। * * * আমাদের নির্ব্বোধ যুবকগণ ইংরাজগণের নিকট হইতে ক্ষমতা লাভের জন্য সভা সমিতি করিয়া থাকে—তাহারা হাস্য করে। যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কোন মতেই স্বাধীনতার উপযুক্ত নয়। * * * দাসেরা শক্তি চায়, অপরকে দাস করিয়া রাখিবার জন্য। তাই বলি, এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্ম্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে, এই ধর্ম্মই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম! * * * ভারতের ধর্ম্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মত করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্য্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।" (১) বঙ্গের ও ভারতবর্ষের সমাজপতি পণ্ডিতমণ্ডলী সমবেত হইয়া হিন্দুশাস্ত্ররূপ কামধেনু হইতে যথাসাধ্য প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থারূপ দুগ্ধ দোহন করিয়া নূতন ব্যবস্থা শাস্ত্র প্রণয়ন করুন এবং উহা দেশীয় ধনাঢ্য ও রাজন্যবৃন্দের অর্থ সাহায্যে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় পুস্তক এবং পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে স্বল্প মূল্যে ও বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া দিন। সামাজিক অত্যাচারের বিষময় ফলে প্রতিদিন শত শত হিন্দুসন্তান, খৃষ্টধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম

(১) স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত "পত্রাবলী" প্রথম ভাগ।

আলিঙ্গন করিয়াছে। এইরূপে কোটী কোটী হিন্দুভ্রাতাকে আমরা বিসর্জ্জন দিয়াছি। কয়েক শত বৎসরে হিন্দুর জনসংখ্যা কল্পনাতীত শোচনীয় ভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে মুসলমান আগমনের পূর্ব্বে হিন্দু জনসংখ্যা ৬০ কোটি ছিল। এই কয়েক শত বৎসরে ৩৮ কোটি হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে! আরও কি আপনাদের হিংসা বিদ্বেষের বহ্নিশিখা প্রজ্জলিত রাখা সঙ্গত? ভ্রাতৃত্বের প্রেমামৃত ধারায় ইহা নির্ব্বাপিত করিয়া ফেলুন, অনাদৃত ভ্রাতৃগণকে বাহুপাশে টানিয়া লউন—মরণোন্মুখ হিন্দুসমাজ রক্ষাপ্রাপ্ত হউক।

সমাজে দুই প্রকারের লোক দেখা যাইতেছে। এক নিরাশাবাদীর দল, আর আশান্বিতের দল। প্রাচীনগণ প্রায়ই প্রথম দলভুক্ত, তরুণগণ দ্বিতীয় দলের অন্তর্গত। নিরাশাবাদী দলের প্রাচীনগণ বলেন—সমাজ ত দিন দিন রসাতলে যাইতে বসিয়াছে। ১০ টাকা মণ চাউল, ৫।৫।০ টাকা জোড়া কাপড়, চিনি, গুড়, মশলা, ডাল তরকারী জুতা ছাতি বাসন পত্র সবই অগ্নি-মূল্য। নিত্য দুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, কালাজ্বর, ক্ষয়—বসন্ত প্লেগে লক্ষ লক্ষ লোক যমালয়ে যাইতেছে। পূজা অর্চ্চনা, দোল দুর্গোৎসব, শ্রাদ্ধ শান্তি, বিধি ব্যবস্থা লোপ প্রায়; দেব দ্বিজে ও গুরু পুরোহিতে ভক্তি নাই, কাশী বৃন্দাবন গয়া প্রয়াগ—তীর্থ মাহাত্ম্য, গঙ্গাস্নানে বিশ্বাস নাই। জাতির বিচার, খাদ্যাখাদ্য বোধ, লজ্জা সরম, ভয় ভক্তি নাই। স্ত্রী স্বাধীনতা;—মেয়েছেলের লেখাপড়া, বিধবা বিবাহ, সমুদ্রযাত্রা প্রচলিত হইতে চলিয়াছে। আর কি সমাজের কল্যাণ আছে; ঘোর কলির সূত্রপাত; একাকারের আর বিলম্ব নাই; ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্য দলের তরুণগণ বলিতেছে—কলি গত হইয়া সত্য যুগের আবির্ভাব! দীর্ঘ সপ্তশত বৎসরের দাসত্ব ভোগের পর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পরাজিত নিপীড়িত দাসত্বে অভ্যস্থ নরনারী মৃতকাটির সঞ্জীবন স্পর্শে জাগিয়া উঠিয়াছে! ভারতের এক প্রান্ত হইতে

অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আব্রহ্ম পেশোয়া আসিন্ধু হিমাচল বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে নিনাদিত ও মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। যে রাজভয়, কারাভয় ও মৃত্যুভয়ে পরাধীন জাতি সতত ভীত, সন্ত্রস্ত ও ম্রিয়মান থাকে—সেই ত্রিবিধ ভয় অগ্রাহ্য করিয়া সহস্র সহস্র দেশভক্ত অম্লান বদনে হাসিমুখে সর্ব্ব প্রকার নিগ্রহ বরণ করিয়া লইতেছে। শিশু, বালক ও পুরন্ধ্রীগণ পর্য্যন্ত প্রফুল্ল বদনে কারাগার বরণ করিয়া লইতেছে। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত দেশভক্ত বীরের শরীরের ওজন বৃদ্ধি হইতেছে। প্রাচীন ভারত কেন, পৃথিবীর কোন ইতিহাসে এরূপ কথা কেহ কখন পড়িয়াছে কি? এমন অপূর্ণ কাহিনী কেহ কখন শুনিয়াছে কি? নরকুল মুকুটমণি—ধরিত্রীর শ্রেষ্ঠ রত্ন মহাত্মা গান্ধির বিশ্বপ্রেম বিশ্বে এক অভিনব তরঙ্গ—বিপুল কলরব তুলিয়াছে। সত্বরই বিশ্ববাসী নরনারী, রাজা প্রজা, জেতা জিত—উচ্চনীচ ভাব ভুলিয়া প্রেমের স্বর্ণশৃঙ্খলে পরস্পর আবদ্ধ ও মিলিত হইবে। ভারত—জগদ্বাসী নরনারীর তীর্থক্ষেত্র,—ভারতের পবিত্র তপোবন বিশ্ববাসীর শান্তি নিকেতন হইবে। ভারত হইতে জাতি-বিদ্বেষ সম্প্রদায়-ভেদ—দিন দিন তিরোহিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে প্রেম ভালবাসা, প্রীতি মমতার সঞ্চার হইতেছে। প্রাচীনগণের সর্ব্ব প্রকার অভিযোগের কারণ—রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা এবং তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ নানাপ্রকার কুসংস্কার, আভিজাত্য, নারী নির্য্যাতন প্রভৃতি।

যদি শ্রীভগবানের কৃপায় ও দেশভক্তগণের নিগ্রহভোগে, আত্মত্যাগে পুণ্য ও সাধনাবলে পরাধীনতা রূপ ব্যাধি দূরীভূত হয়, তবে সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার সর্ব্বপ্রকার উপসর্গও ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবে। মূল ব্যাধি আরোগ্য হইলে তাহার উপসর্গ কতক্ষণ থাকিতে পারিবে? চারি মহাভাবে ভারত ডুবিয়াছে—নারী ও নিম্নশ্রেণীর প্রতি অবজ্ঞা, অনাদর ও নির্য্যাতন; একই ভগবানের বিভিন্ন উপাসকগণের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি, হিংসা দ্বেষ এবং বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে প্রাদেশিক অনৈক্য। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটীই প্রধান,

ভয়াবহ ও মারাত্মক। শ্রীভগবানের কৃপায় বাতাস অনুকূলে বহিতেছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া বঙ্গদেশের কথাই বলি—এখানে ৫০ বৎসরের শিক্ষায়, খবরের কাগজ, সভা, সমিতি, আলোচনা, আন্দোলন, ব্রাহ্ম সমাজের উদ্ভব ও প্রচার ফলে—স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলীতে সমাজে নব জাগরণ আসিয়াছে। বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক সমাজ—জাতীয় সমিতি স্থাপন ও অনেকে সংবাদপত্র বাহির করিয়া আপন আপন সমাজ-সংস্কারে এবং সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছে—ইহা অতিশয় শুভ লক্ষণ। ব্রাহ্মণগণ—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা, বৈদ্যগণ বৈদ্য সম্মিলনী, কায়স্থগণ কায়স্থ সমিতি স্থাপন করিয়াছেন এবং এইরূপ ভাবে, তন্তুবায়গণ কুম্ভকারগণ, তিলিগণ, বারুজীবি, গন্ধবণিক, সুবর্ণ বণিক, কংস বণিক, স্বর্ণকার, মাহিষ্য (চাষী কৈবর্ত্ত ও আদি কৈবর্ত্ত) তাম্বুলি, মোদক, সূত্রধর, পাটনী মাহিষ্য, শঙ্খবণিক, চাষা ধোপা বা সচ্চাষী, কপালী, তেলী (কাম্পিল্য দেশাগত বৈশ্য), সাহা প্রভৃতি জাতিগণ বৈশ্যত্বের দাবী করিয়া এবং পরিচয় দিয়া সভা সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। কায়স্থ, কর্ম্মকার, গোপ, রাজবংশী, ঝালমাল, পোদ (পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়) পুঁরো, হদি (হৈহয় ক্ষত্রিয়) কোচ বা শঙ্কর দাস (খশ্ ক্ষত্রিয়) বাগদী (ব্যগ্র ক্ষত্রিয়) গণ ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিয়া এবং পরিচয় দিয়া সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বৈদ্য, যোগী, নাপিত প্রভৃতি জাতিগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া নিজদিগকে পরিচিত করিতেছেন। অবশিষ্ট অনেক জাতি স্পষ্টতঃ উচ্চ জাতিত্বের দাবী না করিলেও সর্ব্ব প্রকার সামাজিক সম্মানজনক অধিকার লাভের জন্য আন্দোলন করিতেছেন। যুগযুগান্তের পর নিপীড়িত নর-নারায়ণগণের যোগ-নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে এবং ভাঙ্গিতেছে। সমাজপতি মুষ্টিমেয় ১৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৪৩০ জন ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণেতর প্রায় ২ কোটি বঙ্গীয় হিন্দু সন্তানকে মানুষ ও উন্নয়ন করিবার জন্য আর বেগ পাইতে হইতেছে না। তাহারা নিজেরাই নিজেদের পথ পরিষ্কার করিয়া

লইতে উদ্যত ও যত্নবান্ হইয়াছে। ব্রহ্মই যখন অজ্ঞানতার আচরণে আবৃত হইয়া জীবনাম ধারণ করেন, তখন এই সমস্ত জীবন্ত সচল ব্রহ্ম একেবারে নিজেদিগকে ব্রহ্ম না বলিয়া এমন কি ব্রাহ্মণও না বলিয়া ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলেতেছেন—ইহাতে ভাগ্য মনে করিতে হইবে। চটিয়া জ্ঞানহারা হইবার কি আছে। আমরা ত মানুষ করিবই না, তাহারা নিজেরাই যদি মানুষ হইতে চেষ্টা করে—সে ত ভাল কথা, সুখের কথা।

সমাজপতি পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট আমার করযোড়ে শেষ নিবেদন, তাঁহারা কিছুদিন দর্শন শাস্ত্র আলোচনা ত্যাগ করিয়া আমাদের অতি প্রয়োজনীয় সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। ঘটত্ব পটত্বের বাদানুবাদ, রজ্জুতে সর্পভ্রমের গভীর গবেষণা, প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধ নিরূপণ, দ্বৈতবাদ বিচার, অদ্বৈতবাদ খণ্ডন, টিক্‌টিকি পতন হইতে আরম্ভ করিয়া দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক খুঁটীনাটীর নূতন বৈজ্ঞানিক যুক্তি পরিত্যাগ করিয়া কাজের কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হউন। যে দেশের কোটি কোটি লোক অনশনে ও অর্দ্ধাশনে দিবারাত্র ছট্‌ফট্ করিতেছে, যে দেশের দুর্ভিক্ষে ম্যালেরিয়ায় বসন্তে প্লেগে অজীর্ণ রক্তামাশয়ে লক্ষ লক্ষ অধিবাসী প্রতি বৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, যে দেশের কোটি কোটি লোক মূর্খতা ও অজ্ঞতার অতলস্পর্শ জলে ডুবিয়া হাবু ডুবু খাইতেছে, যে দেশে কোটি কোটি ঋষির বংশধর ভ্রাতৃসম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়া পরস্পরের রক্ত পান করিতেছে, সে দেশের পক্ষে ষড়দর্শনের আলোচনায় সময়াতিবাহিত করা নিতান্তই অশোভনীয়। হে বঙ্গের বড় বড় মাথাওয়ালা সমাজপতিগণ! আপনারা আর ও সব অপ্রয়োজনীয় বিষয় লইয়া কালক্ষেপ করিবেন না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "ধর্ম্মকর্ম্ম কি জানিস্, আগে কূর্ম্ম অবতারের পূজা চাই—কূর্ম্ম হচ্ছেন এই পেট, এর পূজা না হ'লে কোন কিছু হয় না।" যাহাতে আপনাদের ভাইরা দুইটী খাইতে পায়, অগ্রে তাহারই পন্থা

বাহির করুন। আপনাদের ষড়দর্শনের আলোচনা—আপনাদের শাস্থ্য পাতঞ্জলের চর্চ্চা, আপনাদের টীকা টিপ্পনির অপূর্ব্বত্বের কথা ত যুগ যুগান্তর হইতে শুনিয়া আসিতেছি। উহাতে আর নূতনত্ব কি আছে? উহা কিছু দিন বন্ধ থাকুক। হিন্দু শাস্ত্র একেই ত সমুদ্রের ন্যায় অসীম অনন্ত, তাহাতে আবার ভাষ্যকারগণের সুবিস্তৃত ভাষ্য ও ব্যাখ্যার সম্মিলনে উহার অসীমত্ব আরও ভীষণতর হইয়া উঠিয়াছে। ভাষ্যের ভাষ্যে তস্য ভাষ্যে টীকা টিপ্পনীতে হিন্দুশাস্ত্রসমূহ "বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়"র ন্যায় জটিলতর ও হাস্যোদ্দীপক হইয়া উঠিয়াছে। অথচ ঐ ভাষ্যসমূহ সর্ব্বসাধারণকে পাঠ ও স্পর্শ করিবার অধিকার দিতে আপনারা নারাজ। ঐ ভাষ্য পড়িতেছেই বা কে, আর বুঝিতেছেই বা কে—তদনুসারে জীবন গঠন করা ত দূরের কথা। দেশের প্রায় পনর আনা লোকই নিরক্ষর, যে এক আনা অবশিষ্ট আছে, উহার মধ্যে কয়জন সংস্কৃত জানে—এবং কয়জনেরই বা সংস্কৃত ভাষ্য বুঝিবার ক্ষমতা আছে? সুতরাং যাহা পোনে ষোল আনা লোক বুঝিতে অক্ষম এবং বুঝিলেও তদনুযায়ী জীবন গঠন করিতে প্রায় অসমর্থ, সেরূপ সামাজিক অপ্রয়োজনীয় বিষয় লইয়া আর মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি? যাহাতে সমাজের কল্যাণ হয়, যাহাতে দেশের উপকার হয়, যাহাতে হিন্দুজাতি পুনরায় বিগতশ্রী লুপ্তগৌরব লাভ করিতে পারে তৎসম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করুন, শাস্ত্রীয়যুক্তি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ঐ গ্রন্থ পরিশোভিত করুন, সর্ব্বসাধারণকে ডাকিয়া ঐ গ্রন্থ তাহাদের হস্তে এবং গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় মুখে মুখে যতটা পারেন বুঝাইয়া দিন। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে প্রচার কেন্দ্র—শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করুন। আধ্যাত্মিক বন্যায় দেশকে ভাসাইয়া ফেলুন। "প্রথমতঃ বেদে উপনিষদে পুরাণে তন্ত্রে সংহিতায় যে সব সত্য নিহিত আছে তাহা ঐ সকল গ্রন্থ হইতে বাহির করিয়া, ভারতবর্ষের বিভিন্ন মঠ হইতে ঋষির আশ্রম হইতে সম্প্রদায় বিশেষের অধিকার হইতে বাহির

করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া দিন।” ঐ সকল সত্যের মহা স্রোত হিমালয় হইতে কুমারিকা, পেশোয়া হইতে আসাম পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া যাউক। সমগ্র হিন্দুজাতি আচণ্ডাল ঐ সকল শাস্ত্রনিহিত উপদেশ শ্রবণ করুক। আপনাদেরই ভগবান্ মনু লিখিয়াছেন :—

তপঃ পরং কৃত যুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুঃ দানমেকং কলৌ যুগে॥

মনু সংহিতা ১ম অধ্যায়, ৮৬ শ্লোক।

তপস্যাই সত্যযুগের, জ্ঞানচর্চ্চা ত্রেতাযুগের, যাগ যজ্ঞ দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম ছিল কিন্তু এই কলি যুগে দানই একমাত্র ধর্ম্ম কর্ম্ম।” আবার দানের মধ্যে ধর্ম্ম দান আধ্যাত্মিক জ্ঞানদানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, দ্বিতীয় বিদ্যাদান, তৃতীয় প্রাণদান, চতুর্থ অন্নদান। প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-জ্যোতি দান করিয়া জড়প্রায় হিন্দুজাতির চক্ষুর ধাঁধা ঘুচাইয়া দিন। তারপর ধর্ম্ম-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই লৌকিক এবং যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিদ্যাদানে উঠিয়া পড়িয়া লাগুন। ব্রাহ্মণেতর জাতিগণকে ধর্ম্ম ও বিদ্যাদানে বঞ্চিত করার দরুণই ভারতে বৈদেশিক আক্রমণের কারণ। শত শত শতাব্দীর সঞ্চিত কুসংস্কারের স্তূপে জ্ঞানের অগ্নিকণা ধরাইয়া দিন দেখিতে দেখিতে উহা পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। আমাদের কৃতযুগের ঋষিগণ যে অপূর্ব্ব অধ্যাত্ম-বিদ্যারূপ ধনরাশি সঞ্চিত করিয়াছিলেন—সেইগুলি বাহির করিয়া আচণ্ডালের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিন। যে সর্প দংশন করিয়াছে সেই আবার তাহার বিষ উঠাইয়া লউক। যাঁহারা সর্ব্বসাধারণকে বিদ্যায় বঞ্চিত করিয়া দেশকে বিষ-জর্জ্জরিত করিয়াছিলেন—তাঁহারাই, সেই ব্রাহ্মণগণই আবার আচণ্ডালের গৃহে গৃহে যাইয়া বিদ্যা বিতরণ করুন—পূর্ব্ব বিষ উঠাইয়া লউন। বেদ বেদান্তরূপ ধন ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া দিন, যাহার যত ইচ্ছা লইয়া যাউক। স্মৃতির টোল উঠাইয়া দিয়া বেদান্ত পাঠের টোল

স্থাপন করুন। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ শ্রবণে আচণ্ডালের হৃদয় আত্ম মহিমায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠুক—সুপ্ত-ব্রহ্মশক্তি জাগরিত হউক। জাতিবর্ণ সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে—ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলের গৃহে সমভাবে প্রচার করুন :— 'হে অমৃতের অধিকারীগণ! তোমরা পাপতাপ জর্জ্জরিত হীন অপদার্থ মানুষ নও—তোমরা দেবশিশু—ভগবানের সন্তান—লীলাচ্ছলে মর্ত্তে নরদেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছ মাত্র। তোমরা যে সচ্চিদানন্দ মহাসাগরের এক একটী তরঙ্গস্বরূপ।'

ব্রাহ্মণ অপেক্ষা চণ্ডাল পুত্রকে বেশী করিয়া শুনাইতে হইবে, কেননা সে জীবনে ইহা শুনিবার কখন সুযোগ পায় নাই! ব্রাহ্মণ সন্তানের শুনিবার অনেক সুযোগ ও সম্ভাবনা আছে। সত্যে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি ছিলেন, আবার সকলকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে। নিজেরা ঋষি হউন এবং প্রত্যেককে ঋষি হইবার জন্য উপদেশ ও সাহায্য করুন। নবযুগের স্বর্ণ করোজ্জ্বল শিক্ষালোক সারা বিশ্ব আলোকিত করিয়া ঐ যে প্রকাশমান হইয়া পড়িয়াছে। শান্তি ও জয় উচ্চারণপূর্ব্বক উহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া লউন।

সমাপ্ত